প্রেমঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব

ডাঃ শ্রীরাধাবিনোদ সরকার
প্রণীত

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী কল্পনা সরকার
১/২ কিউ, রামকৃষ্ণ নস্কর লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা
১৩৬৪ সাল

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রধান প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎ রায়চৌধুরী
ইস্ট ক্যালকাটা প্রিন্টার্স
৪৭/৯এক বেলেঘাটা মেন রোড
কলিকাতা

শ্রীগৌর নিত্যানন্দৌ বিজয়েতাম

উৎসর্গ

শ্রীনিত্যানন্দ বংশাত্মজ প্রভুপাদ শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী, পঞ্চতীর্থ, সম্পাদক, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকা, শিক্ষাগুরুর উদ্দেশে গুরুদেব।

আপনি যখন চালিতা বাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীর আচার্য্য ছিলেন, তখন সপ্তাহে দুইবার গমনা-গমন করিয়া আপনারই শ্রীপাদপদ্ম সন্নিধানে বসিয়া নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তির প্রধান সোপান ভক্তবৃন্দ সমূহ সাধন প্রণালী সম্বন্ধে অব্যর্থ ও অমিয় উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইয়া নিজের জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি, সেই গুরুদক্ষিণা স্বরূপ "প্রেমঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব"—রসগ্রন্থটি আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম। কৃপা করিয়া শুভাশীষ বর্ষণ করুন যেন কৃষ্ণপ্রেম গঙ্গাম্বু সঙ্গমে নিত্য অবগাহন করিতে পারি। ইতি—

পদরজঃ প্রার্থী

সেবকাধম—শ্রীরাধাবিনোদ সরকার

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ বিজয়েতাম্

ভূমিকা

গত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ডা: শ্রীরাধাবিনোদ সরকার প্রণীত প্রণীত্মত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে আদর্শ বৈষ্ণব গ্রন্থটির ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। এখন আমি তৎকৃত প্রেমঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব রসগ্রন্থটির ভূমিকা লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া উহার ভূমিকা লিখিতেছি।

শ্রীভগবান্ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ হইয়া নিজ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন থাকিয়াও কেন ব্রজের উজ্জ্বল পরকীয়া প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করেন। তিনি পূর্ণতত্ত্ব আত্মকাম, তাঁহার প্রেয়সীগণও আত্মকামাও হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ হইয়াও কেন এই পরমোজ্জ্বল শৃঙ্গার রসলীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

প্রাকৃত জগতে নায়ক নায়িকার যৌন মিলনকে প্রাকৃত দেহধারী লোকগণ রস বলিয়া থাকে। ইহা রস নহে 'হৃদ্‌রোগ' বলিয়া একপ্রকার ব্যাধি। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর। প্রাকৃত জগতে এই প্রেমের যোগ হইলে আর বিয়োগ হয় না, বিয়োগ হইলে কেহই বাঁচিতে পারে না। শ্রীমাধবও তাঁহার প্রেয়সীগণ কেহই রক্তমাংসে গঠিত প্রাকৃত দেহ নহে। শ্রীমাধব মনুষ্যলিঙ্গ গুঢ় পরমব্রহ্ম। তিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। আর শ্রীরাধারাণী আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতা এবং মাদনাখ্য মহাভাব বিগ্রহ। সুতরাং এই পরমোজ্জ্বল শৃঙ্গার রস প্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকার যৌন-বিকার নহে। কারণ—

সহজে গোপীর প্রেম নহেত প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তারে কহি প্রেমনাম॥ (চৈ: চৈ:)

বিশ্বপ্রেরণার আদিম উৎস সন্ধান করিয়া বৈদিক ঋষিগণ, দার্শনিকগণ বলিয়াছেন —সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি রহস্যের মূলে রহিয়াছে কোন উদ্দেশ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন— 'বহুস্যাম', তস্মাদেকাকী রে ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। সৃষ্টিলীলা ব্যতীত শ্রীভগবানের আর একটা লীলা আছে, তাহাকে নিত্য লীলা কহে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তাঁহার অংশ শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং ভগবানরূপে প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন ও পরম অপূর্ব্ব স্বীয় প্রেম মহাসুখ সমৃদ্ধির বিতরণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, ধরার ভার হরণ ও অসুর বধাদি লীলা তাঁহার কার্য্য নহে, উহা তাহার অংশ শক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে—যথা

যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমি বিনা কেহ নারে ব্রজ প্রেম দিতে॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীব্রজলীলাটি প্রায় অপ্রকটের পর নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার আস্বাদনের সংকল্প সময়ে—শ্রীরাধার পরকীয়া ভাবের আস্বাদন মাধুর্য হেতু সেইভাব গ্রহণের জন্য লালসা জন্মিয়াছিল। শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ ঃ— (১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? (২) শ্রীমতী প্রেম সহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্য্যাধিক্যই বা কিদৃশো? (৩) মদীয় অনুভব বশতঃ শ্রীমতীর যে কোটি গুণ সুখানুভূতি হয়, সেই আনন্দই বা কি প্রকার? গৌন অন্তরঙ্গ কারণ হিসাবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তুলসী, তিল, গঙ্গাজল ও সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণু চরণে নয়নজলে কাতর প্রার্থনা ও হুংকার এবং শ্রীবাসের উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন। মুখ্য বহিরঙ্গ কারণ হিসাবে ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রচার ও ব্রজ প্রেমদান। "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥" গৌণ বহিরঙ্গ কারণ—যুগধর্ম নাম সংকীর্তন প্রচার ও করুণার অবতার রূপে দীনহীন, পতিত পাষণ্ডী ও পতিতজনে প্রভুর অহৈতুকী কৃপা।—এই সমস্ত বিষয়গুলি লেখক অতি সুললিত ভাষায় ও রসচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ শ্রীরাধার দুইটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—একটি হইল—'রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি', অপরটি হইল—'হ্লাদিনী শক্তি।' শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পাদ পরিচয় দিয়াছেন—"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার।" এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্তরূপে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বৃষ ভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধা। এই শক্তি ভক্তকোটী হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া আবার ক্রমশঃ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত পরিসীমা প্রাপ্ত হয়—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
সেই মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিণী, বিশ্বমানবীয় প্রাণস্বরূপিনীও চির আরাধনাময়ীর আবার নিত্যনবায়মান রস তরঙ্গে রমণীয়া, প্রাণ। ভরা প্রেম, অন্তরে কৃষ্ণানুরাগের তরঙ্গিত সরোবর। সকল চিন্তায় কৃষ্ণ, সকল কল্পনায় কৃষ্ণ, প্রতি নিঃশ্বাসে কৃষ্ণ প্রণয়োচ্ছ্বাস, প্রতি অনুতে কৃষ্ণ। শ্রীরাধার মহাভাববাসিত প্রীতিরসই শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু। লীলা বিলাস, কৃষ্ণের শ্রান্ত কলেবরে বসন্তের মলয় পবনের ন্যায় তিনি স্নিগ্ধা এবং তনু মনোপ্রাণে উল্লাস দায়িনী। অদ্বৈত মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় স্বরূপা। শ্রীরাধার সহিত লীলা বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ মাদন শব্দের অর্থ করিযাছেন :—

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনী সারো রাধায়েমেব সদা॥

ইহাতে প্রাণকোটী প্রিয়তমের দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বনাদ কোটী কোটী সুখসমুদ্র এককালে (যুগপৎ) উদ্বেলিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জাতীয় প্রেমের বিষয়। বিষয় জাতীয় প্রেমসুখ তাহার আস্বাদ্য হইলেও তিনি বিষয়রূপে আশ্রয় জাতীয় সুখ ও কথঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার যূথের সখিবৃন্দ অথবা তদীয় অন্য কোন প্রেয়সী এই সুখসিন্ধুর যুগপৎ বেগধাবনে সমর্থা নহেন। শ্রীরাধার সহিত বিলাসানন্দে নিমগ্ন থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের আর কোন ভক্তপ্রেমে রমণাভিলাসের উদ্‌গম হয় না, তাই তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছে :—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমার করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
সে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই দুই স্বরূপ বস্তু লইয়াই শ্রীঅমিয়া ব্রজলীলা, অন্যান্য গোপীগণ যুগললীলার রসাপুষ্টির উপকরণ। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখি রূপে গুণে সমতুল্যা ও শ্রীরাধার কার্যব্যূহ স্বরূপা ও প্রাণ স্বরূপ। যুগলের মিলন সাধনই সখিগণের নিত্যকর্ম। নিজেদের সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই, যুগলের সুখই তাহাদের সুখ—

"নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥" চৈঃ চঃ

কামক্রীড়া সাম্যের পরারাধিত্ব না হইলে মধুরোজ্জ্বল চিন্ময় রসে চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিভাবিত না হইলে এই নিঃস্বার্থ, নিবৃত্তিমার্গীয়, নিরূপাধি প্রেম উপলব্ধ হইতে

পারে না। যাঁহার ভগবত্তা শক্তি অন্যনিরপেক্ষ, তিনিও সমর্থারতির সখিগণের হস্তে ক্রীড়নক। এই মহাবল প্রেমের নিকট শ্রীভগবান নতি স্বীকার করেন। দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় ও নিরুপম এই গোপীপ্রেম। এ প্রেমের নিকট শ্রীভগবান ঋণী থাকিয়া যান। শ্রীরাসরজনীতে শ্রীগোপীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে অবলাগণ তোমরা কুলবধূ হইয়াও গৃহশৃংখল ছিন্ন করিয়া স্বজন বান্ধব, ইহকাল, পরকাল, আর্য্যপথ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া দেহ-মনপ্রাণ, জীবন-যৌবন, আমার সুখের জন্য (মদর্থ) ডালি দিয়েছ। শ্রীকৃষ্ণ "ন পারয়ে হাহং" শ্লোকে বলিলেন—"হে সুন্দরীগণ! তোমাদের সহিত আমার প্রেম সংযোগ নির্মল, তোমাদের ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এক্ষণ তোমাদের প্রেমই সাধু আচরণের প্রতিদান করিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করুক।" আবার, যীত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু—শ্লোকে গোপীগণ বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের প্রাণ। গোপীগণ নিজেদের বিরহব্যাথায় যতটা ব্যাকুলিত, তদাপেক্ষ অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন প্রিয়তমের শ্রীচরণে কাঁকড় ও ব্রজের কঠিন মাটি দ্বারা ব্যথিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের স্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞানহারা না হইয়া সুখবিরোধী ভীতযুক্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করিলেন। ইহা আত্মসুখ বৰ্জ্জিত কৃষ্ণসুখে পর্য্যাবিমান। তাহাদের কায়িক বাচিক, মানসিক উদ্যম শুধুকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত। ইহা রাসলীলার পরিণতি। লীলার মুকুটমণি শ্রীরাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের কামনা-বাসনা ধ্বংসকারীর অপূর্ব্ব বাসনা। শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যান। রাধা-প্রেমে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাদকতা ও উন্মাদিনী—শক্তিমত্ততা আছে যে উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। শ্রীরাসরজনীতে শ্রীরাধা মান করিয়া শ্রীরাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ "রাধামাধায় হৃদয়ে" (গীতগোবিন্দ জয়দেব) অর্থাৎ রাধার ভাবটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-বিরহে রাধাভাবময় হইয়া পড়িয়াছেন। অত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার মাদনোত্থ মহাভাব অঙ্গীকার করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবত-গীতায়—"যে যথা মাং প্রপদন্তে"—শ্লোকে যে যেভাকে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাহাকে তদ্রুপ ভজন বা প্রীতি করিয়া থাকি। অর্থাৎ "যে যৈছে ভজন তারে ভজে তৈছে।" (চৈঃ চঃ)। প্রীতির অনুরূপ প্রীতি করিতে সমর্থ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল বলিয়া তিনি গোপীগণের নিকট ঋণী রহিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ মদন, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন—"যাঁহার রূপের এক কনা ডুবায় এই ত্রিভুবন ও সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।" দর্পণে, মনিস্তম্ভে নিজের

সুন্দর রূপ দর্শনে নিজেই বিমোহিত হইয়া নিজেই আপনাকে আলিঙ্গন করিতে চাহেন। শ্রীরাধা শুধু 'একলি' আমার এই রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করেন তাই মহাভাবময়ীর হৃদয়ে যে মহাসুখের তরঙ্গ তাহা এমনই একটি নিরূপম বস্তু, যাহার আস্বাদন লালসায় রসিক শেখরের মন উৎকণ্ঠিত। যথা চৈতন্য চরিতামৃতের—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥

প্রবল বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ উদঘূর্ণা অবস্থা। বিরহের বেদনা যত তীব্র হয়, অন্তরের প্রাপ্তিও তখন নিকটবর্তী হয়। এক দিকে রাধার বিরহ ব্যথা তীব্রতর, অন্যদিকে পরম কৌতুকী কৃষ্ণের ধকধকি লোভ হেতু রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার চিত্তজতুনীকে সুদীর্ঘ বিরহের তীব্র তাপে দ্রবীভূত করিয়া বিরহ-সন্তপ্তা রাধার হৃদয় নিকুঞ্জে রহোস্থানে প্রবেশ করিয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইলেন। অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, বাহিরে হাঁ কৃষ্ণ! হাঁ প্রাণনাথ! বলিয়া অশ্রু বর্ষণ কারিনী, রোরুদ্যমানা শুধু রাধার মূর্তিখানি—ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মূর্তি এই গৌরশশী যুগপৎ মিলন বিরহের প্রতিমূর্তি নিত্যানরায়নভাবে মিলন বিরহের জোয়ার ভাটা খেলিতেছে।'

শ্রীরায় রামানন্দ গোদাবরী তটে হঠাৎ দেখিলেন শ্রীমান মহাপ্রভুর সন্ন্যাস মূর্তি নাই, ইহা দেখিয়া তিনি চমকিত হইয়া গিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে তথায় সন্ন্যাসীর পরিবর্তে মুরলী বদন, নবকন্দর্প স্বরূপ এক শ্যামল গোপ কিশোরকে দেখিলেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে ঐ নীল ইন্দ্রমনি সদৃশ কান্তিকে সন্মুখস্থ এক স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় তাহার অঙ্গচ্ছটায় শ্যাম গোপ কিশোরকে উজ্জল গৌর কান্তিতে আবৃত করিয়া হেমাভদিব্যচ্ছবি এক মূর্তি প্রকট করিয়া দিলেন।

পহেলি দেখিনু তোমায় সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তবে গৌরকান্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা॥ চৈঃ চঃ

গ্রন্থকার উপরোক্ত বিষয়গুলি বৈষ্ণবীয় শুভ্র শুচি আদর্শে, নিপুনভাবে, রসচ্ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিতসুধা সংক্ষিপ্ত ভাবে ও প্রেমরসাবেশে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি চব্বিশ বৎসর কাল আদিলীলায় পঞ্চ তত্ত্বসহ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত নামসংকীর্ত্তন ও কাজী

উদ্ধার প্রভৃতি লীলা করিলেন। আর অবশিষ্ট চব্বিশ বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ে, দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, কাশী ও বৃন্দাবনে গমনাগমন করেন—উহা মধ্য লীলা। আর শেষ লীলায় মধ্য, অন্ত্য দ্বিবিধ নাম হয়। এবং শেষ লীলার অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করেন। তথায় নীলাম্বুতীরে শ্রীমান্ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশা, দশ দশা, কূর্মাকৃতি, দীর্ঘাকৃতি দশা প্রাপ্ত হইয়া যে বৃন্দাবনলীলা আস্বাদন করেন, তাহা বিশদভাবে বিশেষ অনুরাগছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৯২ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমান মহাপ্রভুর জন্মের পাঁচশত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বাষট্টি দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ নদীয়া মায়াপুরে সমাগত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সংস্থা "ইসকন" বিশেষ উৎসাহ ভরে এই গুরু ও পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই মনে পড়ে—শ্রীমান্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বানী ও ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের অব্যর্থ লেখনী :—

পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মম নাম॥"

নিত্যানন্দবংশাত্মজ—
স্বাঃ— অনাদি মোহন গোস্বামী।
পঞ্চতীর্থ, সম্পাদক, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকা।

নিবেদন

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীনাং নাদ রেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গাৎ ভুবনত্রয়ম্‌ ॥

যাঁহাদের হরিকথা গীতালাপনে এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন, আমি সেই নন্দব্রজের স্ত্রী মাত্রেরই অসংখ্য চরণরেণুর মধ্যে একটা রেণুকেই প্রতিক্ষণই বন্দনা করি।

মূর্তিমতী করুণারূপিণী শ্রীরাধারাণীর অপার করুণায় এবং তদ্ভাবাচ্য শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ কৃপায় ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তমহতের চরণরেণুর প্রসাদে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত "প্রেম ঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব" রসগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। প্রায় পনের বর্ষ পূর্ব্বে "মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে আদর্শ বৈষ্ণব" নামে আরও একখানি তথ্যপূর্ণ রসগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণ দীর্ঘকাল পরে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ও উদ্দাম গতিতে এবং প্রেমরস পিপাসার আকুল আবেগে এই রসগ্রন্থ রচিত হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপ আস্বাদনের নিমিত্ত সতত ব্যাকুল। তাঁহার স্বরূপে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, রূপমাধুর্যে সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত, মনোরম বংশী নিনাদে মর্মস্পর্শী মাদকতায় ভরপুর, হৃদয় প্রেম-রসের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত। শ্রীকৃষ্ণে রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের ভক্তপদ হইতে শ্রেষ্ঠ শুভ পদ আর জগতে নাই। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখাসখি, প্রেয়সী প্রভৃতি সম্বোধন দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। শ্রীনন্দ নন্দনের বৃন্দাবন-লীলা রস আস্বাদনকারী ভক্ত বিনা এই প্রেমের মাধুরিমা কেহই অবগত নহেন। অন্যের কি কথা! রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গোরা রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। নায়ক শিরোমণি রসমৌলি শ্রীকৃষ্ণের সকলই রসে ভরপুর, একদিকে ব্রজদেবী নায়িকাগণ পরবধূ তাহাতে "কভু মিলে কভু কভু না মিলে—দৈবের ঘটনা।" অপরদিকে পৌর্ণমাসী যোগমায়া দেবী দ্বারা নায়কনায়িকাগণের স্বরূপ আবরিত ও বস্ত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রাকৃত জগতের নায়কনায়িকার ন্যায় এই ভৌমবৃন্দাবনে সর্ব্বোত্তম নরলীলায় উচ্ছ্বসিত প্রেমরসমাধুর্য্যের হিল্লোল বা হুড়াহুড়ি এখনও নিত্যলীলায় চলিতেছে—উহা শ্রুতিগণও অন্বেষণ করেন, কিন্তু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এই মধুর

লীলার রসাস্বাদনের নিমিত্ত গোলক ত্যাগ করিয়া গোকুলে প্রকটাপ্রকট উভয় অবস্থাতেই বেণুকর শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে গোচারণাদি লীলা ও বিদগ্ধরাজ রূপে ব্রজাঙ্গনীদের সহিত ঝুলন, জলকেলি, মান, দান প্রভৃতি লীলা করিতেছেন। ইহাতে ভাবোৎকর্ষ, প্রেমোৎকর্ষ ও বৎসাৎকর্ষ প্রকটিত হইরাছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন—"এই ভূতলে আমার বৈধী ও অনুরাগী আমার বহু সংখ্যক ভক্ত আছে, কিন্তু গোপীগণ আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা।" অহো! যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত দেহ, গেহ, স্বজন, দুস্ত্যজ্য, আর্যাপথ, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গাঢ় প্রীতিময় তৃষ্ণার আবেগে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইতেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের বুকের উপর মুখখানা রাখিয়াও অনুরাগের চরমাকাঙ্ক্ষা প্রেমবৈচিত্র্যভাবে বিরহমত্তা হইয়া কত দৈন্য, কত বিলাপ, কত প্রলাপ করিয়া থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী জগতীতলে কেহ নাই। ইহাতে শৃঙ্গার রসের পরমোৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রজবিলাসে এই পরকীয়া পরমা রতির পরমোৎকর্ষতাই শ্রীরাধার মহাভাব এবং ইহা ব্রজ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মে নাই। পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মোহনাখ্য মহাভাবে দিব্যোন্মাদ দশা পর্য্যন্ত এই ব্রজলীলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীব্রজলীলা প্রায় অপ্রকট, তখন রসময় শ্রীকৃষ্ণের তিনটা অভিলাষ, তন্মধ্যে শ্রীরাধার মহাভাব বাসিত মাধুর্যাস্বাদনই মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ, যাহা গ্রন্থের ভূমিকায় নিত্যানন্দ বংশাত্মক পূজ্য পদ শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবের আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা উত্তমা, প্রেমে সর্বাধিকা। শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিণী, কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণি, সর্বসৌন্দর্যের আধার স্বরূপা। যে কৃষ্ণ নিজ রূপ মাধুর্য্যে সর্ব্বজগতকে মুগ্ধ করেন, এতাদৃশ গোবিন্দকেও যিনি মুগ্ধ করিতেছেন তিনিই শ্রীরাধা। যথা—

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমার করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥"
যার সৎ গুণ গণের কৃষ্ণ না পায় পার,
তাঁর গুণ গণিবে কেমতে জীব ছার॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে কান্তাগণের ক্ষোভকারিতার দৃষ্টান্তে—শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার প্রেমাধিক্য ও পট্টমহিষীগণ হইতে শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্য এবং কৃষ্ণানুরাগের পরাবধিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আনন্দ মুখরিত শ্রীদ্বারকাধামে দেবাদিদেব মহাদেব ও ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ, দিগ্‌পালগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া

গেলে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দধারায় সিক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী রাত্রি জাগরণের পর প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গৃহে গমন করিলে পতিব্রতা রুক্মিনী দেবী আনন্দে অধীর হইয়া স্বর্ণভৃঙ্গারের সুবাসিত জলে প্রিয়তমের চরণপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া ভব-বিরীঞ্চি বন্দিত চরণকমল বিরহব্যাকুল বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আনন্দাশ্রু ক্রমে বিবাহাশ্রুতে পরিণত হইল। স্বীয় কুসুমকোমল কুচযুগে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াও কেন দেবী অবিরত অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন? রসমৌলি শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী দেবীকে কহিলেন—"প্রিয়ে কিজন্য তুমি নয়নজলে বুক ভাসাইতেছ?" উত্তরে দেবী বলিলেন—"প্রিয়তম, তুমি সর্বজ্ঞ হইয়াও জান না যে তোমা হইতেও তোমার চরণকমল যুগলকে আমি বেশী ভালবাসি। তোমার মধুর যুগল পাদ-পদ্মের মধুপান হইতে আমি বঞ্চিতা হইব—এই আশা করে আমি কাঁদিতেছি। কেননা, দ্বারকার মন্দিরে এক নিশিযোগে আমার বক্ষে আলিঙ্গিত হইলে তোমার অঙ্গে পুলক উদ্‌গম হইতেছিল, এমন সময় কালিন্দীকূলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধাসহ নিভৃত নিকুঞ্জ-লীলার কথা স্মরণ হওয়ায়—তুমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে। (কান্তালিঙ্গিত শ্রী কৃষ্ণের মূর্চ্ছা সম্বন্ধে পদাবলী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তুমি শ্রীমতীর নাম শ্রবণ করিলেই তোমার পদ্মপলাশলোচন ছল্‌ছল্ করিয়া ওঠে। আমার হৃদয়ে থাকিয়াও তুমি রাধাশ্যাম জপ করিয়া থাক—মহাভাবময়ীর অনুরাগের আকর্ষণে আমার প্রেম সংকুচিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাবে, তোমাকে শীঘ্রই হারাইতে হইবে, এই আশংকায় আমি দিবানিশি কাঁদিতেছি।" রুক্মিনী দেবীর মুখে শ্রীমতী রাধার প্রেমাতিশয্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমাধবের অন্তর প্রফুল্লিত হইয়া রক্তিম আভা ধারণ করিল। শ্রিকৃষ্ণ শ্রীমতী রুক্মিনীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বলিলেন—"দেবি! তোমার মুখে আজ এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম। আমি শীঘ্রই রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য জগতীতলে অবতীর্ণ হইব। তাই আমার ভাবী বিরহে তুমি কাঁদিতেছ।" দেবীর মুখে রাধা-প্রেমের কথা শ্রবণ করিয়া রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিলোল হৃদয়ের লালসা তীব্রতম হইয়া উঠিল। সমস্ত অন্তর খালি রাধাময় হইয়া উঠিল এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমানুরাগের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার রাঙা আঁখি দুইটা ছল্‌ছল্ করিয়া অশ্রুসিক্ত হইল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ বীণার ঝংকারে হরি গুণগান করিতে করিতে দ্বারিকা-ধামে প্রবেশ করিলেন। নারদকে দর্শন করিয়া উত্তম আসনে বসাইয়া রুক্মিনী দেবী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেবর্ষিকে পাদ্যার্ঘ প্রদান করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা

করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া ভক্ত মুনিপুঙ্গবকে নিবিড় আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিলেন—"দেবর্ষি! তোমার হরিগুণগান মুখরিত প্রফুল্ল বদন আজ মলিন ও অশ্রুসিক্ত কেন? দেবর্ষি বলিলেন—"এই ঘোর কলিতে জগতের লোকগণ বিষয় মদে মত্ত, একবাররও কৃষ্ণ গুণগান করে না। প্রভো! জীবের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" দেবর্ষির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"নারদ! তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে একদিন তুমি আমার ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কৈলাসে গিয়াছিলে, তথায় তোমার আঙ্গুল সংলগ্ন এক রঞ্চ কৃষ্ণপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শঙ্করের আনন্দ নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল! সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ মহেশ ঘরনীকে প্রদান না করিয়া ভগবান শংকর একাকী ভোজন করিয়াছিলেন। পরমা বৈষ্ণবী বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী, লীলাশক্তি দুর্গা তখন এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি কলিযুগে পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীধাম নদীয়ায় অবতীর্ণ করাইবেন এবং মনুষ্য, পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গাদি ইতর প্রাণীগণকেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত প্রসাদভোজনের অধিকারী করাইবেন। সুতরাং পরমা বৈষ্ণবী লীলাশক্তি কাত্যায়নীর ভীষণ প্রতিজ্ঞা বাক্যে আমি কলিযুগে শচীগৃহে জন্মগ্রহণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষিকে আরও বলিলেন—"আমি শ্রীমতী রুক্মিনীদেবীর মুখে রাধাপ্রেমের কথা শ্রবণ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

"ভুঞ্জিব প্রেবার মুখ মুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥"

আমি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গ কান্তি লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাধাপ্রেম আস্বাদন করিব ও কলিহত জীবগণকেও সেই প্রেম আস্বাদন করাইব। বাহিরে ভক্তগণ লইয়া নাম সংকীর্তন ও অন্তরে রসাস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিতে কহিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরাঙ্গ রূপ দর্শন করিয়া নারদ-মুনি আনন্দে আত্মহরা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ লাবণ্য ও অঙ্গজ্যোতি অধিকক্ষণ দর্শন করিতে পারিলেন না।

"ঝলমল্ অঙ্গতেজ দেখিতে না পারি,
আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরথরি॥"

মুনির প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া প্রভু অঙ্গ তেজ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—"ওগো দেবর্ষি! তুমি ব্রহ্মলোক, শিবলোক প্রভৃতি লোকে গিয়া ঘোষণা কর—আমি শীঘ্রই গৌরাঙ্গ মাধব রূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইতেছি।" গৌর ভক্ত

হৃদয়ে ধারণ করিয়া বীনার ঝংকারে হরিগুণগান করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

অপর মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলির মানবের সীমাহীন তমঃ, পাপ বাসনা, ভগবৎ বিমুখতা, দুরন্ত অবিদ্যা দর্শন করিয়া শ্রী অদ্বৈত প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।
তবে তো অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিংকর॥'

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সুরধুনি সন্নিধানে সুগন্ধি পুষ্প, তুলসী, গঙ্গাজল দ্বারা সাশ্রু নয়নে কাতর হুংকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপ ধামে অন্তঃকৃষ্ণ বর্হিগোরা রূপে অবির্ভূত হইলেন—রাধা গোবিন্দ দোঁহে যুগল মাধুরী—সেই দুই এক তনু শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥

জয় জয় অদ্ভুত সপহু আদ্ধত সুরধুনি সন্নিধানে।
আঁকি মুদি রহে প্রেমে নদী বহে বসন তিতিল ঘামে॥
সপহু মনে ঘন গর্জনে উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বহু তুলি কাঁদে ফুলি ফুলি দেহে অপরূপ কম্প॥
অদ্বৈত হুংকারে সুরধুনি তীরে আইলা নগররাজ।
তাঁহার পীরিতে আইলা ত্বরিতে উদয় নদীয়া মাঝ॥

কৃষ্ণ ভক্তগণ সিদ্ধ দশায় মঞ্জুরীর চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক রাধাভজন করিয়া থাকেন যে প্রেমালাভ বিনা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, সেই প্রেমই হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী রাধার সদয় প্রসাদ ভিন্ন সুদুর্ল্লভ। প্রত্যেক রসিকভক্তের মনে রাখিতে হইবে যে যে পরিমাণে ভক্তের চিত্ত গৌররসাভিষিক্ত হইবে, সেই পরিমাণে তাহার চিত্ত শ্রীরাধার চরণ কমলে লগ্ন হইবে। গৌরলীলা রসিক শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে বলিয়াছেন—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেতে ভক্তের কৃতপুণ্যরাশিব।
তথাতথোৎ সর্পিত হৃদৎকস্মাদ্রারী—পদাম্ভোবা সুধাম্বুরশিঃ॥

অর্থাৎ যে পরিমাণে ভক্ত কৃপায় এবং বহু ভাগ্য ফলে সাধক শ্রীগৌর চরণ কমলে ভক্তি লাভ করিবেন সেই পরিমাণে তাহার হৃদয় রাধা পাদপদ্ম সুধা সাগরে লীন হইবে। অতএব ভক্তরসিক রাধাভজন কালে শ্রীরাধার রহোদাস্য প্রাপ্ত হেতু শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে শরনাগত হইয়া শ্রীরাধা চরণ কমলের পরাগকে আরাধনা করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া শৃঙ্গার রসার্ণবে নিমগ্ন হন! এই প্রসাদে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

গৌর প্রেম রসার্ণবে যে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ ॥

গোপীগণের মধ্যে যিনি সর্বোত্তমা, যাঁহার সুখের মধ্যে বিন্দু মাত্র সুখবাঞ্ছা নাই, যাঁহার মাদনাখ্য মহাভাবে দিব্য বা অলৌকিক সাধু বিশেষের ন্যায় মাদকতা সম্পন্ন, সেই রাধার ভাবে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে নীলাম্বর মধ্যে দীর্ঘাকৃতি রূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য ও বৃন্দাবনলীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রের পথে যাইতে চটক পর্বতকে গিরি গোবর্দ্ধন ভাবিয়া পর্বতের দিকে বায়ু বেগে ধাবিত হইলেন। প্রথমে তিনি বায়ু গতিতে চলিলেন, পরে স্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিলেন। চলিবার আর শক্তি নাই, প্রত্যেক রোমকূপের মাংসে ব্রণের আকার ধারণ করিল, ঐ ব্রণের উপরে আবার কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গম হইয়া প্রতি রোমে প্রস্বেদ ও রুধির ধারা ঝরিতে লাগিল, কণ্ঠ ঘর্ঘর করাতে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না ; নেত্রদ্বয় হইতে যেন গঙ্গা ও যমুনায় ধারা আসিয়া সমুদ্রে মিলিয়া যাইতেছে, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া শঙ্খের বর্ণ ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় দেহে কম্পন হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন। গোবিন্দ শীঘ্র মহাপ্রভুর নিকটে আবাসন করিয়া করেঙ্গের জলে সর্ব্বদেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি পণ্ডিত গদাধর, শ্রীজগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শীতল জলে মহাপ্রভুর অঙ্গ সংমার্জন করিয়া তাহার কানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিলে হরিবোল বলিয়া তিনি সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন। আসুন, ভক্ত পাঠকগণ আমরাও শ্রীস্বরূপ গোসাঞি, পণ্ডিত গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের অঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ক্রন্দন করি। কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনের পরানন্দে মহাপ্রভুর মাদনাখ্য মহাভাবের যে প্রলাপ বিকার তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের ধারণার অতীত। গৌরভক্তগণের অঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া কাঁদা ব্যতীত আমাদের অন্য আর উপায় নাই। ভক্ত পাঠকগণ ও লেখক একত্রে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া যদি কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করি তবেই সমূহ মঙ্গল হইয়া অমৃত লাভ হইবে। যদি আমাদের রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা আস্বাদনের ইচ্ছা থাকে, যদি আমাদের মধুময় গোবিন্দের কুসুমিত নিকুঞ্জ কাননে প্রেম সেবারূপ পরানন্দ সম্ভোগের আকুল আগ্রহ থাকে, তবে শ্রীরাধাভাবাঢ্য গৌরসুন্দরের চারু পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবার আনন্দে অভিসিক্ত

দীনপালিকা শ্রীরাধারাণীর অপার করুণায় ও সুরসিক ও নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মহোদয় গণের অহেতুকী কৃপাই প্রেম-ভক্তি-রস সিক্ত সুরভি পদ্মের ন্যায় এই রসগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ভক্ত ভ্রমরগণ এই সুরভি পদ্মের মধুপান করিয়া পরমানন্দে অভিসিক্ত হইলে এই অযোগ্য বৈষ্ণব দাসানুদাসের লেখা সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিব। গ্রন্থখানিকে ভ্রম প্রসাদ পরিশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়াও এই অধমের অজ্ঞতা ও মুদ্রাকরের অসাবধানতা বশতঃ যে সমস্ত ভুল ও দোষ রহিয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধিপত্র দ্বারা যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে, তবে ভ্রম প্রসাদ ক্রটী বিচ্যুতি আমার মত অজ্ঞ ও ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। অদোষ-দরশী কৃপা পরায়ণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন ইহাই প্রার্থনীয়। কাগজের মূল্য মুদ্রণ খরচ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে সঙ্কোচ ভাব আসিলেও ২০৲ টাকা মূল্য ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগৌরবিধু জয়তি

প্রেমঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথ গুর্ব্বাদি বন্দনঃ—

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম
স্বাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাণংশ্চ॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যোঃ এবচ
পতিতানাং পাবনেভ্যোঃ বৈষ্ণবেভ্যোঃ নমোনমঃ।

সংসার সিন্ধু তরনে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তিনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুবৌ বিহরণে যদি চিত্ত বৃত্তি—
শ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতু॥ (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত)

বিগলিত নয়ন কমল জলধরং
ভূষণ নবরস ভাব বিকারং
গতি অতি মন্থর নিত্যবিলাসং
তং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম্॥

(শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য)

প্রেম ঋণে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যাং নমামি ভক্তিশক্তিকম্॥

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীনাং পাদরেনুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গাতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্।

প্রেমাঞ্জুনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদেয়েহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপং
গৌবিন্দামাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

অথ মঙ্গলাচরণঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরিট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়ে কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যিনি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া সকলকে অন্যাবতার কর্ত্তৃক অনর্পিত, মুখ্য উজ্জ্বল রসগর্ভ, স্বীয় উপাসনা সম্পত্তিরূপ ভক্তি প্রদানার্থ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণাপেক্ষাও অধিকতর কান্তিমান, সেই শচী-নন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়রূপ পর্ব্বত কন্দরে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন এই শ্লোকাবলীতে ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা পূর্ব্বক জগতের জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদরূপে মঙ্গলাচরণ করা হইল।)

বধ্নন প্রেমাভর প্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কেটিডোর কৈঃ—
সংখাতুং নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেবহি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতাযাতৈ
গৌর তন্নুর্ধিলোচনমুদং তন্বন হরিঃ পাতু বঃ॥ ১৬॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

যিনি লোকমঙ্গল 'হরেকৃষ্ণ নাম নিরন্তর জপ করিতেছেন, প্রেমভরে শ্রীহস্তদ্বয় কম্পিত হইতেছে, আবার সেই প্রকম্পিত করে—লোকশিক্ষার নিমিত্ত কটিডোরে গ্রন্থী প্রদান করিয়া নামের সংখ্যা রাখিতেছেন; প্রেমাশ্রুধারায় যাহার বদন কমল ভাসিয়া যাইতেছে, যিনি নিজরূপ শ্রীজগন্নাথ দর্শনেচ্ছায় গমনাগমন—চ্ছলে সকলের পাপ হরণ করিয়া

লোক লোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন—সেই শ্রীগৌরহরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

পর্স্তপ যুবতি গৌষ্ঠী চুম্বিত শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর তরলিত-দৃষ্টি নির্ম্মিতানন্দ বৃষ্টিঃ
নবজলধর ধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা
ভুবনমধুর বেশা মালিনী মূর্তিরেষা।

(শ্রীশ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলী)

ব্রজবালাগণ যাহার সুললিত ওষ্ঠ চুম্বন করিলে যিনি কন্দর্পোদ্দীপ্ত চঞ্চল নয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ সম্ভোগাদির দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্ষন করেন, যাহার দেহকান্তি নবীন নীরোদের ন্যায় সুমনোহর এবং যিনি জগন্মোহন বেশে সুসজ্জিত, সেই বনমালা বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

বৃন্দাবন দাস-কবিরাজ গোস্বামির চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি॥

প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবের আভাসালোক প্রদত্ত হইল। দ্বাপরের শেষে শ্রীশ্রীব্রজলীলাটি যেন তখন শেষ হইয়াও হয় নাই। শ্রীশ্রীব্রজরাজনন্দনের কতিপয় মনোভিলাষ (বাঞ্ছাত্রয়) অপূর্ণ রহিয়া গেল। এদিকে কালের গণনায় যুগাবতারের সময় আবির্ভাব। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুদয় সর্ব্বত্র ঘোরতর। লীলাবতারে যুগাবতার মিশাইয়া শ্রীব্রজের কুঞ্জনিবাস ত্যাগ করিয়া সপরিকরে বিশ্বচিত্ত চমৎকৃত করিয়া অতি করুণাবশতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। নবাব হুসেন শাহের রাজত্বকালে, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে সমাসীন মন্ত্রীদ্বয় ও পঞ্চতত্বকে লইয়া অতি পরিচিত বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্রস্থলে গৌড়মণ্ডলে অভিনব নরলীলা করিবার জন্য লীলাময় দেবতার এক অপূর্ব খেয়াল হইল। শ্রীব্রজের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া সপরিবারে কেহ শ্রীহট্টে, কেহ রাঢ়ে, কেহ যাজপুরে, কেহ পূর্ব্ববঙ্গে

নবদ্বীপে আগমন করিলেন। শ্রীনন্দ নন্দনের নরলীলা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় পর্যাবসান হইল। কোন আড়ম্বর নাই, কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই। "রামাদি অবতারে ধনুক ধরিয়া কবে অসুরেরে করিল সংহার, এবে অস্ত্র না ধরিল, কারো প্রাণে না মারিল। হরিনামে তারিল সংসাব।"

মানবের অন্তর রাজ্যে, ভাব-রাজ্যে, অধ্যাত্মসাধন রাজ্যে কল্পনাতীত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইতে লাগিল। সমগ্র গৌড়মণ্ডলে তথা সমগ্র ভারতব্যাপী জনগণ সর্বত্র যেন শুভ প্রাণস্পন্দনকারী এক বিদ্যুতের আলোক দেখিতে পাইলেন। কোটী কোটী ভাগ্যবান্ নরনারী অন্তরে অন্তরে সুবিমল সুধাস্রোত অনুভব করিতে লাগিলেন, সকল দুঃখ সন্তাপ যেন যাদুদণ্ডস্পর্শে দূরীভূত হইল; বাহিরে দেখিলেন অপার আনন্দ ও পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত ভারত। আসমূদ্র হিমাচল পর্যন্ত যেন কোন হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, স্বার্থ নাই, লোভ নাই, প্রতারণা নাই, শুধু আছে প্রীতির বন্ধন "প্রীতির প্লাবনে শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়" প্রেমের বন্যায় বা গোলোক রসের বন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য তথা সমগ্র ভারত প্লাবিত। ভক্তির মন্দাকিনী সহস্রধারে প্রবাহিত হইল কত ছন্দে, কত সঙ্গীতে, কত নৃত্যে। মানব-জীবনের অন্তর জগতে যেন এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমামৃতের বিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল। শত শত যুগ যে অধ্যাত্মসাধনা সম্পাদিত হয় তাহাই যেন শ্রীগৌরাঙ্গ যুগে ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র অপার্থিব প্রেম-সিন্ধুর আলোড়ন ও অনন্ত তরঙ্গোচ্ছাস। মানবের সীমাহীনতম :, দুরন্ত অবিদ্যা পাপ-বাসনা, কাম-কল্মষ জর্জ্জরিত নিখিল চিত্ত যাহা কোটীজন্মের নৈতিক, চেষ্টায় সংশোধিত হইবার নহে, তাহা দেখিতে দেখিতে আমূল পরিশোধিত হইতে লাগিল। সূর্যোদয়ের প্রাককালে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবেব আবির্ভাবের আভাসালোকে যেন হিংসা, দ্বেষ, মলিনতা, বিবিধ দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইতে লাগিল। কৌতকী দেবতা সর্ব্বত্র স্পর্শমণির স্পর্শে যেন সব সোনা করিয়া দিয়া—অপামর জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে উন্নত, উজ্জ্বল ব্রজপ্রেম রস বিতরণ করিতে লাগিলেন। রসব্রহ্মের অনুভূতি আজ প্রকটিত

হইয়াছে নদীয়ার রাজপথে। আদি আশ্রয় তত্ত্ব ও বিষয়তত্ত্বের নিবিড় মিলনের চরম পরিণতিই আমার নদীয়া বিনোদিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। আজ নদীয়ার মাটীতে চাঁদের উদয় হইয়াছে। রসরাজ জগৎ মোহন কৃষ্ণই সর্ব্বভাব-রসমাধুর্য্য নির্ঝরিনী শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি অঙ্গে মাখিয়া সোনার গৌরাঙ্গ হইয়া আবির্ভূত হইলেন নদীয়ায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই অমিয়ভাবের আভাসালোক শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে কদাচিৎ চমকে ঝলকে বিকীর্ণ হইতেছিল। নিরুপমরূপ লীলা-লাবন্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি রসরাজ রাজেন্দ্র ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার নিরুপাধি প্রেমরসের সমুজ্জ্বল তরঙ্গ-প্রবাহই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অন্তরঙ্গ লীলা।

নদীয়ার চাঁপাহাটীতে গীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীজয়দেব শ্রীমন্‌মহা-প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যখন চম্পকবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমসেবা করিতেছিলেন। তখন তিনি হঠাৎ প্রেম নয়নে দেখিলেন—"কৃষ্ণাঙ্গ রাধিকার অঙ্গে মিলিত হইয়া একটা মনোহর, বিস্ময়কর মূর্ত্তি, প্রকটিত .হইল, ইহাই কলির জীবোদ্ধারী মূর্ত্তি। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লইয়া।
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পূজে মহা হর্ষ হইয়া॥
শ্যামল সুন্দর রূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে॥
গৌরকান্তি চাঁপা পুষ্প-পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হইল অন্তর্দ্ধান॥

শ্রীজয়দেব অবাক হইয়া ভাবিলেন, শ্রীহরির এ কি রঙ্গ, এ রূপে কেন তিনি দর্শন দিলেন! এযে দেখি—"রাইরূপে তনু মাখামাখি"। শ্রীজয়দেব শাস্ত্রের ইঙ্গিত বাক্য পাঠ করিতে লাগিলেন—

"যত্রযোহন্তরাদিত্য হিরন্ময় পুরুষে দৃশ্যতে"

—ছান্দেগ্য উপনিষদ—

"তস্যহেতবে পুরুষস্বরূপং যথা মহারজনং বাস"

—আদি বৃহদারণ্যকে—

"ওঁ যদা যদা পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং"

—শ্যাম বেদ—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামনীয়াং শমনোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধিগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥"

—মনু—

"স্বর্ণদীতীর মাশ্রিত্য নবদ্বীপে দ্বিজালয়ে।
সম্প্রদায় ভক্তিযোগং লোকস্যানুগ্রহায় চ" ॥

—অগ্নিসংহিতা—

"ভবিষ্যতি কলিকালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কূলে জন্ম গ্রাহকঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোমুযুগং তনু ঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ-

"অন্যাবতারাবহবঃ সর্ব্বোসাধারণোত্তটাঃ"

—জৈমিনি ভারত—

"অবতারমিদং কৃত্বা জীব-নিস্তার-হেতুনা।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

—উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র—

"উভয়োভাবমাশ্রিত্য কলৌ চৈতন্য বিগ্রহ"।

—স্বরতন্ত্রতন্ত্র—

স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"অন্তঃকৃষ্ণ বহিগৌর সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-রূপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করিব।" গড়ুরপুরাণের উক্তি—"কলির প্রথমসন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্ত আবির্ভূত হইবেন। দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সমীপে তিনি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীরূপে অবস্থান করিবেন"। নারদীয় পুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন —"হে দেবগণ শীঘ্র ভক্তরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রকট হও। কলিকালে সংকীর্ত্তন যজ্ঞের আরম্ভে আমি শচীসুতরূপে আবির্ভূত হইব"।

এইরূপ আরও বহুশাস্ত্রের প্রমাণও ইঙ্গিত দর্শন করিয়া শ্রীজয়দেবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন —"এই বিচিত্র লীলার রঙ্গ আমি দেখিতে পারিব না। ভাবী লীলা-চিত্র প্রকাশিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

শ্রীভগবান্ তাহার সিদ্ধভক্তগণকে স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য দর্শন করাইয়া থাকেন।

চণ্ডীদাস শুধু কবি নয়, সাধক ওতত্ত্বদ্রষ্টা প্রেমরস রসিক। তাঁহার কবিতাগুলি যেন উজ্জ্বল রস তরঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভাবখানি কবির কাব্যাকাশে উদিত হইয়াছিল। যথা—

আজ কে গো মুরলী বাজায়!
এতো কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কে দিল?
তাঁহার ইন্দ্রনীল কাঁন্ত তনু
এত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বানাল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী।
হবে বুঝি ইঁহার সুন্দরী।
সখিগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় ছিল কিছু নাহি জানি॥
আজু কেন দেখি বীপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

এইরূপে রসিক কবি মানসধ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর মূর্ত্তিটি শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের শতবর্ষে পূর্ব্বে দর্শন করিলেন। কবির অন্তর শ্রবণেন্দ্রিয়ে মধুর মুরলীশ্রবণ করিয়া ছুটিয়া গেলেন নিকুঞ্জকাননে, কিন্তু শ্যামসুন্দরকে তিনি দেখিলেন না; দেখিলেন কনক কিরণে উদ্ভাসিত চাচর চিকুরে চূড়াবাধা শ্রীগৌরহরি মূর্ত্তি। ইহাত আমাদের চির পরিচিত শ্রীনন্দ-নন্দন নয়। এযে অভিনব আকৃতি, অভিনব রূপ! ইহার বামে সুন্দর, সুনীল, সুচিক্কণ কান্তি যুক্ত এক রমণীর নীলমণিময়ী রমণীয়া মূর্ত্তিখানি ঝলমল করিতেছে। শ্যামসুন্দরের ন্যায় ভাবভঙ্গি; কিন্তু রমণী, মনে হয় ঐ গৌরকিশোরের কিশোরী প্রেয়সী। কবি প্রেমনয়নে লীলাদর্শন করিতেছেন। সখিগণ বলিতেছেন—"এই কিছুকাল পূর্ব্বে ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ শ্রীশ্যামসুন্দরকে দেখিলাম, কমলিনী রাইকে দেখিলাম; তাঁহারা কোথায় গেল? এ যে সব বীপরীত দেখিতেছি, আজ দোঁহে মিলিয়া একটা কিছু করিয়াছে।" চণ্ডীদাস মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—"এই রাধা ভাব-দ্যুতিতে মোড়ানো শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ কোনো দেশে প্রকটিত হইবেন। কবি গাহিতেছেন—

"কামনা করিয়া সাগরে পশিব—
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা"॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাবের সমুজ্জ্বল তথ্যের কিরণাভাস আমরা পাইতেছি। ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে প্রেমের অমোঘ ও দুর্লঙ্ঘনীয় নীতির পরিণতিতে বিষয় তত্ত্বকে আশ্রয় তত্ত্ব হইতে হয়, কদাচিত পরম পুরুষও পরা প্রকৃতি হইয়া থাকেন; শ্যামসুন্দরকে রাধারাণী হইতে হয়, আবার রাধাণীও শ্যামসুন্দর হন। অতএব, শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বদেহে, মনে প্রাণে, প্রতি শিরায় ধমনীতে, প্রতি রক্ত বিন্দুতে, দেহের প্রতি অণুতে মাদনাখ্য মহাভাবময়ী, প্রেমজ্বালাময়ী শ্রীরাধা।

এখন রসিক কবি বিদ্যাপতির কাব্যকুঞ্জে দেখিতেছি—

"সখি হে কি কহব নাহিক ওর
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর।
তড়িতলতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতয়ে সুরধনি ধার"॥

অন্যত্র—

"অণুক্ষণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
এ নিজভাব স্বভাবই কিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোঁহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥"

* * * *

রাধা সঙ্গে যব পুনঃতহি মাধব
মাধব সঙ্গে রব রাধা
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা—ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি রস্মাদেকাত্মানাং ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তো। চৈতন্যখ্যাং প্রকামুধুনা তদবয়ঞ্চ ঐক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর করচা। রাধা স্বরূপেতঃ কৃষ্ণ প্রেমেই তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা ও কৃষ্ণের সত্বা ভিন্ন নহে। কিন্তু তাহার লীলার জন্যই

ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। এখন আবার তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রকট হইয়া এক হইয়াছেন। শ্রীরাধার গৌর কান্তি ও কৃষ্ণ প্রেম লইয়া যে কৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই চৈতন্য দেবকে নমস্কার করি।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ বিশ্ব প্রেরণার আদিম উৎস অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক ঋষিগণ, দার্শনিকগণ ও শ্রুতি সমূহ বলিয়াছেন যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি রহস্যের মূলে রহিয়াছে কোন উদ্দেশ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—'বহুস্যাম' অর্থাৎ তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করেন, তাই এই সৃষ্টি। বৃহদারন্যক শ্রুতির উক্তি—"স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।" এই সৃষ্টি লীলা ব্যতীত শ্রীভগবানের আরও একটা লীলা আছে, তাহাকে নিত্যলীলা কহে। এই নিত্যলীলা লীলা পুরুষোত্তমের স্বকীয়। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় তাঁহার অংশ শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে। রজোগুণান্বিত ব্রহ্মার সৃজন, সত্ত্বগুণান্বিত শ্রীবিষ্ণুর পালন, তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে রুদ্রের সংহার কার্য্য সম্পাদন। নিত্য লীলাময় শ্রীভগবান্ যে অনিত্য জগতের মধ্যে আবির্ভূত হন, ইহা তাঁহার করুণা। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য মহাশক্তিমান, নিখিল অবতার সমূহের উৎপত্তিস্থল। তিনি স্বয়ং ভগবানরূপে প্রেমরস সির্য্যাস আস্বাদন ও পরম অপূর্ব স্বীয় প্রেমমহাসুখ সমৃদ্ধির যথেচ্ছ বিতরণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ধরার ভার হরণ ও অসুর বধাদি লীলা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম নহে। উহা তাহার অংশাবতার দ্বারাই সম্পাদিত হয় যথা—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমি বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেমদিতে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীব্রজলীলা অপ্রকটের পর নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার আস্বাদনের সঙ্কল্প সময়ে শ্রীরাধার পরকীয়া ভাবের আস্বাদনের মাধুর্য্যের আধিক্যহেতু সেই ভাব গ্রহণের জন্য লালসা জন্মিয়াছিল। পরকীয়া ভাবেই সকল চেষ্টা ও দশা প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহা ভাবটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয়জাতীয় ভাবটা আবরিত করিয়া বাহিরে শ্রীরাধার

স্বর্ণকান্তি দ্বারা নিজের ইন্দ্রণীলমণি সদৃশ কান্তিকে আবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ নামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কান্তিতে অন্তঃকৃষ্ণ বহিগৌর ভাবে শ্রীরাধা।

শ্রীমন মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোবিন্দ দাস নীলাচল হইতে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে আগমনের কালে ফুলিয়া গ্রামে শ্রীমন মহাপ্রভু তাহার গৃহে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যথা—

নিধুবনে দুই জনে চৌদিকে সাখিগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে
নিশি শেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহে বধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণেশ্বর কি দেখিনু অকস্মাৎ
এক যুবা সুগৌর বরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম জিনি কতকোটীকাম
রসময় রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবভূষণ নিরবধি
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি পুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাহারে বেড়িয়া॥
নব জলধর রূপ রসময় রসের কূপ
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বীপরিত হেন ভেল আচম্বিত
বল নাথ ইহার কারণ॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি ইহ বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপপিত মন না হইল কদাচন
হেন গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনি মুর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি

বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করি বেড়ি মুখচুম্ব করু বেড়ি
হেরিয়া নয়নানন্দ ভোর ॥
এতগুলি বিধুমুখী মনে হৈয়া, অতি খুসী
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিতে সকল তত্ত্ব বুঝিনু স্বপন সত্য
সেইরূপ দেখিলাম হে আমি ॥
আমাকে সে সঙ্গে লইয়া তুহ দেঁহা এক হৈয়া
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়া ধরা কোথা যোবে বাঁশী কোথা লুকইবে
কালরূপ গৌর হবে কেমনে ॥
এতশুনি কৃষ্ণচন্দ্র কৌস্তভের প্রতিবিম্ব
দেখাইলা রাধিকার অঙ্গ।
আপনে তাহে প্রবেশিলা তুহু দেহ এক হৈয়া
ভাব প্রেমময় সর্ব্ব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এক কিয়া তুই তনু এক হঞা
নদীয়াতে হইল উদয়।
সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণে হরিনাম সংকীর্ত
প্রেম বন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন
ব্রজবাসী সখাসখি সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন হেরি গৌরাঙ্গ শ্রীচরণ
না ভাসিল সে সুখ তরঙ্গে ॥

শ্রীমান মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের কারণ প্রধানতঃ তুইটি—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ও মুখ্য ও গৌণ ভেদে তুই ভাগে বিভক্ত :—

(১) মুখ্য অন্তরঙ্গ—প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন ও শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব বাসিত মাধুর্য্যাস্বাদন ও ত্রিবিধ বাঞ্ছা।

(২) গৌণ অন্তরঙ্গ—শ্রী অদ্বৈত প্রভুর তিল, তুলসী গঙ্গাজল ও গন্ধপুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণুচরণে কাতর প্রার্থনা ও হুঙ্কার এবং শ্রীবাসের নামসংকীর্ত্তন।

(১) মুখ্য বহিরঙ্গ—শ্রীব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রচার ও ব্রজ প্রেমদান।

(২) গৌণ বহিরঙ্গ—যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচার ও করুণাবতার রূপে দীন, হীন, পতিত, পাষণ্ডগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা—এতৎসহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের সংক্ষিপ্ত চরিতসুধা বর্ণন।

নিগূঢ় অন্তরঙ্গ কারন :—

অপারং কস্যাপি প্রনয়িজন বৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমনি যঃ।
রুচিরং স্বামাবত্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকায়ম।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতবাং জঃ কৃপয়তু॥

যে কৌতুকীকৃষ্ণ কোন প্রনয়জনবৃন্দের অপার ও অপ্রাকৃতিক মধুর রস আহরন পূর্ব্বক উপভোগ বাসনায় শ্রীরাধার কান্তি স্বীকার করতঃ আপনরূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকার দেবতা আমাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শুভ আবির্ভাবের মুখ্য অন্তরঙ্গ কারন—শ্রীরাধার মহাভাব বাসিত মাধুর্য্য আস্বাদন ও ত্রিবিধী ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী চরণের কড়চায় বর্ণিত হইয়াছে যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মাধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ বীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীমতী রাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রমতী প্রেম সহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্য্যাধিক্যই বা কীদৃশো এবং মদীয় অনুভব বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দই

বা কি প্রকার—এই তিনটি বিষয়ে লোভবশবর্ত্তী হইয়া শচী গর্ভসমুদ্রে রাধাভাব সমন্বিত কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শেষলীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদর গোসাঞি নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাহার যে ভাব যখন হৃদয়ে উদিত হইত, শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর শ্রীমন মহাপ্রভুর হৃদয় অবগত হইয়া তদনুরূপ গীত গাহিয়া ও শ্লোক উচ্চারণ দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিতেন।

"এই গুঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রচার।
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার।
রাত্রে বিলাপন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি॥"
"স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ বাঞ্ছাত্রয়ের পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোসাঞির কণ্ঠে ইতি লোভাৎ' শব্দটি ধ্বনিত হইয়াছে। যিনি পূর্ণতত্ত্ব ও আপ্তকাম, নিজ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন থাকিয়াও সেই গোলকবিহারী শ্রীহরি স্বয়ং লোভাতুর। ইহা যেমন দুর্বোধ্য, দুজ্ঞেয় ও নিগুঢ়—ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। ভাবিতে ভাবিতে স্মরনে আসিল নৃসিংহ অবতারের কথা। লোভটি এই প্রথম নয়। ইহা পূর্ব্বে নরসিংহ অবতারে সংঘটিত হইয়াছিল। বাৎসল্য ও মধুরভাব—এইমাত্র ভেদ।

শ্রীমান প্রহ্লাদের পিতা হিরন্যকশিপু মণিস্তম্ভে পদাঘাত করিলে তাহা হইতে ক্ষুদ্র নরসিংহরূপে বহির্ভূত হইয়া ক্রমশ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও নভোব্যাপী প্রচণ্ড মহাবিকরাল মূর্ত্তি ধারন করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সুমেরু শিখর পর্য্যন্ত পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল। অকালে প্রলয় দর্শন করিয়া ভয়ে দেবগণ লক্ষীদেবীকে প্রেরণ করিলেন। লক্ষীদেবী দেখিলেন—নৃসিংহমূর্ত্তি হীরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করিয়া গলদেশে সেই নাড়ীগুলি মাল্য করিয়া পরিধান করিয়াছেন। বিকট, বিকরাল মূর্ত্তি দর্শনে কম্পিত হৃদয়ে তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন।

করিলেন। তখন সিংহ শাবক যেমন পিতা-মাতার নিকট গমন করে. তদ্রুপ প্রহ্লাদ অকুতোভয়ে শ্রীনরসিংহ সমীপে গমন করতঃ ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া আর্দ্রীভূ'ত অন্তরে, সাশ্রুনয়নে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভুও প্রহ্লাদকে বক্ষে লইয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ভক্তের সুন্দর বদন পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ভক্তের বদন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও সাধ মিটিতেছেনা। একবার দক্ষিণে, পুনরায় বামদিকে শ্মশ্রুযুক্ত গ্রীবা হেলাইয়া ভক্তের শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় হস্তদ্বারা ভক্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শিরোদেশ মৃদু বিলেপন করতঃ ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। নরসিংহের ভীষণ উগ্রমূর্তি বাৎসল্য অনুরাগে স্নিগ্ধ ও রক্তিম হইয়া উঠিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু একই কালে উগ্র ও অনুগ্র নৃসিংহ দেবকে দর্শন করিয়া ভাবাবেশ নৃত্য করিয়া স্তব করিতেন। ক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রহ্লাদের আনন্দোজ্জ্বল বদন দর্শন করিয়া শ্রীনরসিংহ দেবের লোভের উদয় হইল। ক্রোড়ে করা অপেক্ষা ক্রোড়ে আরোহণই অধিক আনন্দ। এই লোভহেতু পরে যতবারই শ্রীভগবান আবির্ভূ'ত হইয়াছেন ততবারই সন্ধিনী শক্তির মূর্ত্তি পিতা মাতার ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূ'ত হইয়াছেন।

(১) প্রথম বাঞ্ছাটি—"শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশো প্রত্যেকটি বাঞ্ছার সঙ্গে ইতি লোভাৎ'—এই পদের সম্বন্ধ। তিনটি বাঞ্ছাই শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়া; সুতরাং রাধা তত্ত্বটি ও শ্রীরাধার স্বরূপ আমাদের পূর্ব্বাহ্নে হৃদয়াঙ্গম করিতে হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ শ্রীরাধার দুইটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন একটি হইল—'রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিঃ, অপরটি 'হ্লাদিনী শক্তি' শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার॥

শ্রীভগবনে, যে শক্তিতে স্বরূপানন্দে নিমগ্ন থাকেন এবং ভক্তগণকে স্বরূপানন্দ আস্বাদ করান সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী। তন্ত্রে উক্ত আছে

শক্তির অবস্থিতি। অমূর্ত্তরূপে এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ হইতে অভিন্না এবং আপনি আপনাতে পুর্ণকাম ও স্বরূপানন্দ বিশিষ্ট। চরম একাকী অবস্থায় অর্থাৎ নামরূপ অভিব্যক্ত না করিয়া যখন ব্রহ্ম কেবল চিন্ময়রূপে অবস্থান করেন তখন প্রাকৃত জাগতিক লীলায় বিগুমান থাকেন না। সেইজন্য বৃহদারন্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—
"স বৈ-নৈব রেখে।

তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ"। সুতরাং

"রাধাকৃষ্ণ একাত্মা তুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥"

এই হ্লদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধা। তত্ত্বে যিনি অভিন্না, লীলায় তিনি ভিন্না হ্লদিনী শক্তি অমূর্ত্তরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যে আনন্দ আস্বাদন করান, তাহা বৈচিত্র্য রহিত ও খণ্ডিত আর মূর্ত্তরূপে অর্থাৎ শ্রীরাধারূপে লীলাদ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে যে আনন্দ আস্বাদন করান, তাহা বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অখণ্ডিত। "কৃষ্ণকে করায় শ্যামস মধুপানে।" এই হ্লদিনী শক্তি ভক্তকোটি হৃদয়েপ্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ রতি, প্রেম, স্নেহমান, প্রময়, রাগ, অনুরাগ-ভাব ও মহাভাব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণের নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিনী, বিশ্বমানবীয় প্রাণস্বরূপিনী। তাই তিনি নানাভাবে, নানারূপে লীলরসে প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। কখনও দেবী, কখনও মানবী, কখনও জ্যোতির্ময়ী কখনও তেজময়ী কখনও অশ্রুময়ী, কখনও প্রেম প্রার্থণাময়ী। বিশ্বে যত ভগবদারাধনা সমস্তই শ্রীরাধার বিভুত্ব বিভূতির অন্তর্গত। শ্রীরাধা চির আরাধনাময়ী

নিত্য নবায়মান—রসতরঙ্গে তিনি রমনীয়। কখনও গোলকে, কখনও গোকুলে। প্রাণভরা প্রেম মনভরা প্রেম, অন্তরে কৃষ্ণানুরাগের তরঙ্গিত মহাসাগর। স্বপ্নে, জাগরণে ও সুষুপ্তিতে প্রাণকোটী প্রিয়তমের ধ্যান সকল চিন্তায় কৃষ্ণ, সকল কল্পনায় কৃষ্ণ, প্রতি নিঃশ্বাসে কৃষ্ণ-প্রণয়োচ্ছাস নয়নে নয়নে কৃষ্ণ, দেহের প্রতি অনুতে শ্রীকৃষ্ণ।

পুরে মহিষীগণের রূঢ়ভাব আর ব্রজে ব্রজবাসিনীগণের অধিরূঢ় মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাব সম্ভোগে মোদনাখ্য মহাভাব এবং বিরহে মোহনাখ্য মহাভাব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অধিরূঢ় মহাভাবটি একমাত্র সমর্থারতিরগণ ব্রজগোপী ভিন্ন অন্য কোন প্রেয়সীতে নাই। কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই এই মহাভাবের নিখিল চেষ্টা। যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবসমূহের উদয় হয় তাহার নাম মোদন। শ্রীরাধারাণীর মোদনাখ্য মহাভাবে সুদীর্ঘ বিরহ অবস্থার সাত্বিক বিকার সমূহ সুদীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোহনাখ্য সংজ্ঞা লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উদ্ধব মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ব্রজের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন "হে প্রভো। তোমার প্রেমময়ী শ্রীরাধার যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা শ্রীরাধারাণী ব্যতীত কোন ভক্তে বা শাস্ত্রে পরি দৃষ্টি হয় না। দেখা ত দূরের কথা, কোন ভক্তে এইরূপ অবস্থার কথা শোনা যায়না। তাহার সমুদয় অঙ্গে কম্প-সাত্বিকের উদয় হওয়ায় দন্ত সকল বাদ্য করিতেছিল, নয়ন যুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় গোকুল মণ্ডলকে প্লাবিত করিয়াছিল, নয়নাশ্রু হইতে উত্থিত প্রেমবাষ্প ধূম আকাশে বাতাসে বিকীণ হইতেছে, লক-সাত্বিকের উদ্যমে অঙ্গ কণ্টকি হইয়া কণ্টকী ফলকেও যেন তিরস্কার করিতেছে। এতদসমুদয় বরং সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু একটা চমৎকারকারী দৃশ্য দেখিলাম, তোমার প্রতি সুগাঢ় অনুরাগ রাশিতে তিনি শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন। এই মোদনাখ্য মহাভাবের স্থায়ী অনুভাব প্রকাশিত হইয়াছে। যথা (১) কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, (২) নিজ অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখ কামনা (৩) ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ

কারিতা (৪) পশুপক্ষীকুলের রোদন (৫) মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিজ-দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণ প্রাপ্তির কামনা (৬) দিব্যোম্মাদ।

(১) কান্তালিখিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা সম্বন্ধে পদ্যাবলী গ্রন্থে—"যাহার রত্নছটায় জলনিধি কর্ষরিত হইয়াছে এমত দ্বারকার মন্দিরে নিশিযোগে রুক্মিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইলে তাহার অঙ্গে পুলক উদগম হইতেছিল, এমন সময় কালিন্দীকূলে শ্রীরাধাসহ নিভৃত নিকুঞ্জ লীলার কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হইয়াছিল। (২) অসহনীয় দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসুখ কামনা ঃ— যথা শ্রীরাধা উদ্ধব মহাশয়কে বলিলেন "যতদিন পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যেন সচিন্ত্য হৃদয়ে আমাদের কাছে না আসে। মথুরায় বাস করিয়া যদি তাহার সুখ উৎপত্তি হয়, সে মথুরাতেই বাস করুক। তাঁহার সুখেই আমার সুখ, তাহার কুশলেই আমার কুশল। তাই বৈষ্ণবকবি গাহিয়াছেন—যথা ঃ—

দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
আমার দুঃখ কিছু না গণি,
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

(৩) ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারীতার দৃষ্টান্ত ঃ—শ্রীরাধার প্রেমনিঃশ্বাস ধুম চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে লোকসমূহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, ফণিকূল ব্যাকুল হইল, দেববৃন্দ দেহে স্বেদ বহন করিতে লাগিলেন এবং বৈকুণ্ঠে অবস্থিতা লক্ষীদেবী প্রভৃতিরও অশ্রু মোচন হইল। (উজ্জ্বল নীলমণি) (৪) তির্যক জাতির রোদন ঃ—নান্দীমুখী অশ্রুমোচন করিতে করিতে শ্রীরাধার মোহনাখ্য মহাভাবের কথা পৌর্ণমাসি যোগমায়া দেবীকে নিবেদন করিয়া বলিলেন "হে দেবি! শ্রীরাধা কৃষ্ণের দ্বারকায় গমনবার্তা শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া কালিন্দী কূলস্থ কুঞ্জের মনোহর লতাবল্লরী অবলম্বন পূর্বক বাষ্পমোচন করিয়া গদগদ উচ্চৈঃস্বরে এরূপ গান করিয়াছিলেন যে, যাহার শ্রবণে জলচরী মৎস্য, মকরাদি জল জন্তু সমূহও অতিশয় ধ্বনি করিয়াছিল"। (৫)

মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিজ-দেহস্থ ভূতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা।—যথা পদ্যাবলীতে—"শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন—হে সখি, আমি কৃষ্ণ বিরহানলের এই দগ্ধদেহ পরিত্যাগ করিলে তুমি আর যত্ন করিয়া এ দেহ রক্ষা করিও না। ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আকাশাদি পঞ্চভূতে গিয়া প্রবিষ্ট হউক। আমি বিধাতাকে প্রণাম করিয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণের বিহার দীর্ঘিকাতে এই দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গনাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমনের পথে দেহের ক্ষিতি ও তদীয় তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করুক"

(৬) দিব্যোন্মাদ ঃ—এই মোহনাখ্য মহাভাবের কোন এক অদ্ভুত ভ্রমময়ী বিচিত্রা অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাতে উংঘূর্ণা, চিত্র জল্লাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ যে ভ্রমময়ী চেষ্টায় একদেখিতে অন্য পদার্থ দর্শন করেন, এক শুনিতে অন্য কথা শ্রবণ করেন। এক বলিতে অন্যকথা বলেন, এক ভাবিতে অন্য ভাবনা করেন ইত্যাতি। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধার যূথেতেই সম্ভব হয়, অন্যত্র হয় না। শ্রীমান মোদনই হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়তর শ্রেষ্ঠ বিলাস।

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে কান্তাগণের ক্ষোভকারীতার দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার প্রেমাধিক্য ও পট্টমহিষীগণ হইতে শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরাগের পবাবধিত্বের দৃষ্টান্তঃ—যথা শ্রীউজ্জ্বলে—"সেই স্থলে এক সখি কহিল—"দেখ দেখ শ্রীরাধার অনুরাগ সমুদ্র লহরী বিস্তার করিয়া তাহার অদ্বয়ভাব হেতু মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গ রূপ গিরিনন্দিনীকে, সখ্যহেতু প্রিয়তমের বক্ষাস্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে, সৌভাগ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের মনোভৃঙ্গের নলিনীতুল্যা সত্যভামাকে এবং মাধুর্য্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখি চন্দ্রাবলীকেও ক্ষেপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্ধ করিয়াছে" (শ্রীউজ্জ্বল) আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপে শ্রীরাধার প্রেমাধিক্যের কথা বলা হইয়াছে, যথা—

যাহার সৌভাগ্যসুখ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সৎগুণ গণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমতে জীব ছার॥

আবার শ্রীমাদনই হ্লাদিনীশক্তির প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ বিলাস। এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই বিরাজমান। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ মাদন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

সর্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়েমেব সদা॥

অর্থাৎ হ্লাদিনী সাৎ অর্থাৎ প্রেম যদি স্যাৎ রতি আদি মহাভাব পর্যন্তের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয় তবে তাহাকে মাদন বলা হয়। এই মাদনাখ্য পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি মহাভাবাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, সতত ইহা রাধাতেই বিরাজিত ; অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। মাদন শব্দে মদ্ ধাতুর অর্থ হর্ষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের হর্ষপদ। এই কারণে ইহা অদ্বৈত অর্থাৎ শ্রীরাধারাণী ব্যতীত এই মাদন রস কুত্রাপি সম্ভব হয় না। ইহাতে প্রাণকোটী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শন, দর্শন, আলিঙ্গন চুম্বনাদি কোটী কোটী সুখ সমুদ্র এককালে (যুগপৎ) উদ্বেলিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান সর্বজাতীয় প্রেমেরই বিষয়। বিষয়জাতীয় সুখ তাঁহার আস্বাদ্য হইলেও তিনি বিষয়রূপে ঐ আশ্রয় জাতীয় সুখও কথঞ্চিত আস্বাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু কেবল শ্রীরাধারাণীর এই মাদনাখ্য পরাৎপরের আশ্রয় হইতে পারেন না বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাবওকান্তি অঙ্গীকার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। মাদনাখ্য পরাৎপরে যে কোটী কোটী সুখসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, তাহার ধারণযোগ্য আঁধার একমাত্র শ্রীশ্রীরাধারাণী। শ্রীরাধাই কেবল এই উত্তাল তরঙ্গের বেগধারণে সমর্থা, শ্রীরাধার যুথের সখিবৃন্দ ও তদীয় অন্যকোন প্রেয়সী এই সুখসিন্ধুর যুগপৎ বেগধারণে সমর্থা নহেন বলিয়া

ইহা অদ্বৈত বা দ্বিতীয় রহিত বা সতত ইহা শ্রীরাধাতে ও শ্রীরাধা ভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গে বিরাজিত। এই মাদন রসে অচেতন পদার্থেও ঈর্ষার সঞ্চার হয় (১) যথা দানকেলি কৌমুদীতে শ্রীরাধা দানার্থ শ্রীকৃষ্ণের বনমালা নিরীক্ষণ করিয়া তৎপ্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করিয়াছিলেন। (২) আবার, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাপানকারী মধুর বেণুকে লক্ষ্য করিয়া মূরলীর ভাগ্যের উৎকর্ষ ও নিজের ভাগ্যের প্রতি অনাদর অনুভব হেতু বংশীজন্মের অভিলাষ প্রার্থনা করিয়াছেন। (৩) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গন্ধমাত্রের আঁধারের প্রতিও শ্রীরাধার স্তুতি। যথা শ্রীমদ্ভাগতে (১০।২১।১৭)।

পূর্ণাঃ পুলিন্দ উরুগায় পদাব্জরাগ
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তন মণ্ডিতেন,
তদ্দর্শন স্মররুজস্তৃম রূষিতেন
লিম্পান্ত্য আননকুচেষু জহু স্তদাধিম্ ॥

শ্রীরাধা প্রিয় সখিগণকে বলিতেছেন—"হে সখিগণ! অন্ত্যজ জাতীয় রমণী গণের জীবন সার্থক, শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রিয়তমার স্তন যুগলে যে কুঙ্কুম লিপ্ত ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে কোনভাবে লিপ্ত হইয়া বনমধ্যস্থ তৃণ রাজিতে লগ্ন হইয়া যায়। তাহারা সেই সকল তুলিয়া নিজেদের মুখমণ্ডলে ও বক্ষস্থলে লেপন করিয়া নিজেদের হৃদয়ের কামপীড়ার উপশম করিয়া ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত এই যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয়ের এককালীন প্রকাশ ভেঙ্গে অবস্থিত হয়। যখন মাদনাখ্য স্থায়ীভাব উদয় হয়, তাহার চিহ্ন এই আলিঙ্গন চুম্বনাদি সম্ভোগ-অনুভবের মধ্যেই বিবিধ প্রকার বিপ্রলম্ভ দশার অনুভব হয়, একের প্রকাশ প্রকাশদ্বয়ের ধর্ম অনুভব করায়। এই কারণেই মাদনরসের দ্বিলক্ষণতা। যদি ইহাই হইল, তবে সম্ভোগকালেও কি প্রকারে অতিশয় তৃষ্ণাময়ী উক্তির সম্ভব হয়। এই নিমিত্তই ইহা বিচিত্র এবং সহস্রধারারূপে বিরাজ করে। ইহাতে সম্ভোগ-কালেও উৎকণ্ঠা; অতএব অতি অদ্ভুত। এই মাদন রসের অতি অদ্ভুত বৈচিত্র হেতুই নিজ ভাগ্যের প্রতি অনাদর ও অন্যের ভাগ্যের উৎকর্ষতা

উপলব্ধি হয়। মাদন রসের সুন্দর রূপ গতিরোধ করিতে মদনেরও সাধ্য নাই। তাই ভরতমুনি অতিশয় রূপে নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

শ্রীউদ্ভব সংবাদে "ভূজমগুরু সুগন্ধং" অর্থাৎ অগুরু হইতেও সুগন্ধি শ্রীকৃষ্ণের ভূজদণ্ডের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীরাধারাণীর সহসা শ্রীকৃষ্ণে সেই সবর্ত্তুল, আজানুলম্বিত ভূজযুগের স্পর্শস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় যে আনন্দ মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় এবং মূর্চ্ছাকালে রাধারাণীর যে অবস্থা হইয়া থাকে; তাহা শ্রীজীব গোস্বামীপাদ—গোপালচম্পু গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধারাণীর মহামহিমা, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও তুলনা বাহিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরের বৈপরীত্য, অঙ্গের অত্যন্ত কৃশতা, হস্তপদাদির সন্নিবেশের অন্যথা, অর্থাৎ যেরূপভাবে অঙ্গের দৈর্ঘ্য ও ও সরলতা থাকা দরকার, তাহার অন্যথা, বৈবর্ণ, শ্রীমুখ হইতে লালাস্রাব, শ্বাসরোধ প্রভৃতি যে সকল অবস্থা ঘটে তাহাকে সখিগণও শ্রীরাধাকে চিনিতে পারেন না। শ্রীরাধারাণী ব্যতীত একমাত্র রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌর সুন্দরের কুম্মাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি অবস্থায় এই ভাব পরিলক্ষিত হয়

শ্রীরাধা শ্রীমাধবের প্রেমে একান্ত বশীভূতা বলিয়া মাধবী সংজ্ঞার অভিহিতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণতরুণ তমালের স্বর্ণলতিকা বা মাধবীলতা স্বরূপা, শ্যামনবজলধরের অচলা চপলা সদৃশী, শ্রীরাধাই কৃষ্ণ চাতকের জীবনোপায় স্বরূপা, শ্রীরাধার মহাভাব বাসিত প্রীতিরসই জীবাতু। লীলাবিলাসে শ্রীকৃষ্ণের শ্রান্ত কলেবরে বসন্তের মলয় পবনের ন্যায় তিনি স্নিগ্ধা ও তনুমনোপ্রাণে 'উল্লাসদায়িনী, অদ্বৈত মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় স্বরূপা শ্রীরাধার সহিত লীলা বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দ লাভ করেন। যেখানে প্রেম অখণ্ড ও অদ্বৈত তথায়ই আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ। সেই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরূপ মহামীন সেই অতল অসীম ভাবসাগরে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ভক্তকোটী হৃদয়ের প্রেম-রস নির্য্যাস আস্বাদনের সে অনন্ত পিপাসা অনাদি কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত আছে ও থাকিবে, তাহা পূর্ত্তি করিতে সুধাধারার মত শ্রীরাধার প্রেমই সমর্থ। এই নিমিত্ত রসগ্রন্থে—"কৃষ্ণাস্য তৃষ্ণাসংহারী

সুধাসারৈক ঝঝ'রী" বলিয়া শ্রীরাধা বিখ্যাত্য। শ্রীমতীর সঙ্গে বিলাসানন্দে নিমগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণের আর কোনভক্তপ্রেমে রমণাভিলাষের উদয় হয় না। কারণ মহাসাগর প্রাপ্ত হইলে যেমন ক্ষুদ্র সরিৎ বা সরোবরের প্রয়োজন বোধ হয় না, তদ্রূপ রতিরসের অখণ্ড মহাসাগর শ্রীমতী শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য নিখিল ভক্তের জাতি ও পরিমাণ গত প্রেমাস্বাদ সেই অনন্ত, অসীম ও অদ্বৈত মহাভাব দ্বারা ক্রোড়ীকৃত হইয়া থাকে। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিতেছেন :—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
সে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥" চৈঃ চঃ

ললিত মাধব নাটকে (৯।৫) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিতেছেন :—

নিধুতামৃত মাধুরী পরিমল ঃ কল্যাণী বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজ সৌরভং কুহুরত-শ্লাঘা বিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্বস্ব ভাক
ত্বমাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিফকুলং রাধে! মুহুমোদিতৈ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে মঙ্গলময়ি! তোমার বিম্বাধর সুধামাধুরীর পরিমলকেও পরাজিত করিতেছে, তোমার বদন পদ্ম-গন্ধে সুবাভিত, বাক্যাবলী কোকিল কাকলীর শ্লাথাও দূর করিয়াছে, অঙ্গ চন্দনবৎ সুশীতল এবং দেহ সর্বসৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ। হে রাধে। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম মুহুর্মু'হু পরমানন্দে লিপ্ত হইতেছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রকাশ করিতেছেন :—

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন!
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।

মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥ চৈঃ চঃ

পূর্ণ যৌবনা, দক্ষিণা ও মৃদুস্বভাবা ঘৃতস্নেহময়ী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিয়া তাহারই বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত থাকিয়াও নিশীথকালে নিদ্রার ঘোরে—"হে রাধে। হে প্রেমময়ি।" বলিয়া আকুল আগ্রহে রাধানাম উচ্চারণ করতঃ কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শ্রীচন্দ্রাবলী স্তম্ভিতা হইয়া মনে মনে রাধা প্রেমের অসামান্য গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রাবলী, অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা গণের সহিত ও অন্যান্য লক্ষ্মীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারকালে রমণটা খণ্ডিত। শ্রীরাধার সহিত শ্রীরাধারমণের প্রেমাস্বাদে পরিপূর্ণ তৃপ্তির উদয় হয় বলিয়া উহা অখণ্ড রমণ। এই জন্য অন্যভক্তগত প্রেমাস্বাদ আকাঙ্খা কৃষ্ণ হৃদয়ে উদয় হয় না। অতএব শ্রীরাধা রাণীর সহিত শ্রীরাধারমণের অখণ্ড রমণ বা পরিপূর্ণ প্রেম-রস-নিযাস আস্বাদন হইয়া থাকে। তাই শ্রীরাধা অখণ্ড রমণের আশ্রয়, মহাভাব স্বরূপিনী, কৃষ্ণহৃদিবিলাসিনী, শ্যামকণ্ঠ হেমমণি, রমণীমুকুটমণি, কৃষ্ণমনমোহিনী। শ্রীবৃহৎ গৌতমীয়ে বর্ণিত হইয়াছেন ঃ—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা
সর্ব লক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

শ্রীরাধা রাণী হইতেছেন দেবী অর্থাৎ যাবতীয় সুন্দরীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ "কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। তিনি সর্ব্বপূজ্যা, সর্ব্বপালিকা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সম্মোহিনী অর্থ্যাৎ যে কৃষ্ণ নিজরূপ মাধুর্য্যে সর্বজগতকে মুগ্ধ করেন, এতাদৃশ গোবিন্দকেও যিনি মুগ্ধ করিতেছেন, সর্বকান্তি অর্থে যিনি সর্বসৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপা ও পরা অর্থাৎ সর্বপ্রকার সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা বর্ণনা করিতেছেন ঃ যথা—

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কতবল।
সে বলে আমায় করে সর্বদা বিহ্বল ॥

রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥"

এই নৃত্যগুরু সম্বন্ধে শ্রী গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

কস্মাদ বৃন্দে, প্রিয় সখি হরে পাদমূলাৎ কুতোহসৌ
কুণ্ডারন্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্য শিক্ষা গুরু কঃ।
তং তন্মূর্ত্তিং প্রতিতরুলতাং দিগবিদিক্ষু স্ফূরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"বৃন্দে! কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দা কহিলেন—"প্রিয়সখিঃ আমি শ্রীহরির পাদমূল হইতে আসিতেছি।" শ্রীরাধা—"শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায়? বৃন্দা—"তিনি এখন কুঞ্জ কাননে, রাধাকুণ্ডারন্যে। শ্রীরাধা—"তিনি এখন কি করিতেছেন? বৃন্দা—"নৃত্যশিক্ষায় নিযুক্ত আছেন"। শ্রীরাধা—"নৃত্যশিক্ষার গুরু কে?" বৃন্দা—তোমারই মূর্ত্তি কি দিক, কি বিদিক তরুলতাদিতে সর্বত্র স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া শৈলষীর (নর্ত্তকীর) ন্যায় ভ্রমণ সহকারে সেই কৃষ্ণকে আপনাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করাইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রস—সবস্ব শৃঙ্গার রসের ঘনীভূত—মূর্ত্তি, সেইজন্য তাহার হৃদয়ে সততই শৃঙ্গার শুচি বা প্রেমদ্বারা পরমোজ্জল রস পিপাসা জাগিয়া থাকে। "নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত"—সেই কাম বা প্রেমতৃষ্ণা শান্তির জন্য শ্রীরাধিকা উজ্জল শ্যাম রসই পরিবেশন করেন। শ্রীরাধারস সুধানিধি গ্রন্থে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধারাণীকে "শ্যাম মণ্ডল মৌলীমণ্ডল মণিঃ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গার রস হইতে যে উদ্দাম প্রেমময়ী তৃষ্ণা উপজাত হয়, সেই প্রেমোন্মত্ততা রূপ মধু (শ্যামরস মধু) শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরকে পরিবেশন করেন। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা ঃ—

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধানাম পুরাণে-ব্যাখ্যানে ॥"
অন্যত্র, কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপানে।
নিরন্তর পূর্ণ করেন কৃষ্ণের সর্বকামে ॥

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সূর্যপূজা, দান, মান, রাস প্রভৃতি বিবিধ প্রেয়সী প্রেম-বশ্যতাময়ী লীলার মধ্য দিয়া শ্রীরাধারাণী ধীর ললিত, নায়ক শিরোমণি প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরকে নানাভাবে নব নব নিগুঢ় প্রেমরসই আস্বাদন করাইয়াছেন।

নায়ক শিরোমণি রসমৌলি শ্রীকৃষ্ণের সকলই প্রেমরসে ভরপূর। একদিকে নায়িকাগণ পরবধূ, তাহাতে 'কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন,' অপরদিকে পৌর্ণমাসি যোগমায়া দ্বারা নায়ক-নায়িকাগণের স্বরূপ আবরিত ও বন্যবেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রকৃত নায়ক নায়িকাব ন্যায় এই ভৌমবৃন্দাবনে সর্ব্বোত্তম নরলীলার যে উচ্ছসিত প্রেম-রসের হিল্লোল, প্রেমের হুড়াহুড়ি চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে, সেই নিত্য লীলা শ্রুতিগণও অন্বেষন করেন; কিন্তু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই মধুর লীলার রসাস্বাদনের নিমিত্ত গোলক ত্যাগ করিয়া গোকুলে প্রকটাপ্রকট উভয় অবস্থাতেই বেনুকর শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বেশে গোচারণাদি লীলা ও বিদগ্ধ রাজ রূপে শ্রীব্রজললনাগণের সহিত ঝুলন, জলকেলি, মান, দান প্রভৃতি লীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"রাই। তুমি সে আমার গতি
তোমার কারণে রসতত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা গীতি আলাপনে
মূরলী লইয়া করে।
যমূনা সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে॥" চণ্ডীদাস।

অঘটন-ঘটনাপটিয়সী চিৎ শক্তির পরিণতি লীলার সহায়কারী পৌর্ণমাসী যোগমায়া দেবী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীব্রজদেবদেবীগণকে পরবধূরূপে প্রতীতি করাইয়াছেন বলিয়াই মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কূলবধূগণের পক্ষে দুত্যজা ধর্ম্ম বাধা অতিক্রম করা সহজ হইয়াছে। ব্রজবধূগণ যদি পরবধূরূপে লোকে প্রতীতি না হইতেন, তবে মুখে যাহা আসে

তাহাই অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে পারিতেন না। দানলীলা প্রসঙ্গই তাহার প্রমাণ যথা—

"কোন গুণে তোমার সনে
পীরিতি করিব হে কানাই।
তুমি রাখাল, আমি রাজার ঝি॥
এ কথা শুনিলে লোকে বলিবে কি?
রূপেতে ভ্রমর গুণে ননীচোর
ধনেতে ধবলি বসতি গাছে,
কেন ঘনায়ে ঘনায়ে আসিছ কাছে
মোরা পর পুরুষের পবন পরশে
সচেল সিনান করি ইত্যাদি।

রসগ্রন্থ দানকেলি কৌমুদী পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ব্রজঙ্গনাগণ পরিহাস রসে, কৌতুক রসে, উদ্দাম ও উচ্ছাসময়ী ভাষাতে শ্রীকৃষ্ণকে রসাস্বাদনে নিমগ্ন করিতেছেন। প্রিয়া যদি প্রিয়-তমের নিকট অসঙ্কোচে প্রাণের কথা বলিতে না পারেন, তবে হৃদয়ে কেমন যেন একটা বেদনা থাকিয়া যায়, তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ লঘুতোষনী গ্রন্থে বলিয়াছেন—"পরদারতা চাস্যাং বাগ নির্গলতা প্রকটনায়"—অর্থাৎ অনর্গল বাক্য বলিবার জন্যই ইহাদের পরদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। পরকীয়াভাবে বিভাবিতা শ্রীব্রজ মৃগনয়না গণ কারণে অকারণে শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করেনএবং মানের প্রখরতায় প্রায়শঃ প্রাকৃত নায়িকার ন্যায় প্রাকৃত নায়ককে ভৎসনা করিতে করিতে "মাধব যাহি, কেশব যাহি"—বলিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন। আবার মান প্রকরণে শ্রীরাধারাণী বিপ্রলম্ভ রসে কাতরা হইয়া বিবর্ণা হইলে শ্রীললিতা সখি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকট আনিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন—"তুহু অতিবব'র নন্দঘোষের নন্দন"। ব্রজগোপী ব্যতীত এই চৌদ্দভুবনে কি কেহ এইরূপ শ্লেষযুক্ত ভৎসনা করিতে পারিয়াছেন? প্রেমময়ী তৃষ্ণার পরাবধিত্ব না হইলে কি কেহ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন? প্রেমের সপ্তম বিলাস যেমহাভাব, সেই

মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ও তাঁহার বূথের সখিবৃন্দই শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিতে অধিকারিনী। অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ দেবতাগণের ও সর্ব্বযোগেশ্বরগণের স্তুতি অপেক্ষাও ব্রজগোপীগণের এই মনোহরা ভৎ'সনায় অধিকতর উল্লসিত হয়েন। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সনা দেবস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন" (চৈঃ চঃ) তাই তিনি প্রেয়সীমুগ্ধ বীরললিত নায়ক হইয়া প্রধানা গোপীকার চরণতলে বসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে থাকেন—

"দেহি পাদপল্লব মুদারম্"—আবার নিধুবনে রাই রাজা হইলে তাহার চরণতলে দাসখৎ লিখিয়া দেন। স্বকীয়া নায়িকার পক্ষে এইরূপ বাক্যবিন্যাস সম্পুর্ণ অসম্ভব; কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবোধে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়া থাকেন। অনুরোধময় প্রেমিক প্রেমিকার মিলন সুখদ হয় না। সুতরাং তটস্থ হইয়া বিচার করিলে স্বকীয়া হইতে পরকীয়ায় মধুর রসের আস্বাদন চরমোৎকর্ষও পরকাষ্ঠা বলিয়া রসিকশেখরের এই পরকীয়া লীলায় অশেষ বিশেষ প্রেমরস নির্য্যাস অস্বাদন করাই অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

এই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা বা প্রধানা গোপিকা সর্বোত্তম। যথা—

সেই গোপীগণের মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপেগুণে সৌন্দর্য্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা। (চৈঃ চঃ)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীচন্দাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণানুরাগিনী শত শত যূথেশ্বরীগণ থাকিলেও বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু, শ্রীরাধাও সেইরূপ, কৃষ্ণ-প্রাণের একমাত্র বন্ধু-অর্থাৎ প্রাণ রক্ষার মহৌষধি। উভয় যেন উভয়ের প্রাণের একমাত্র অবলম্বন। অতএব রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা তনুমাত্র ভেদ। যেমন কস্তুরিকা ও তাহার গন্ধ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, পদ্ম ও তাহার সৌরভ প্রভৃতি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও অভেদ তদ্রুপ আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা ও অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তথা শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে ও রসিক ভক্তগণকে কৃপাও আনন্দ

প্রদানের জন্য এক হইয়াও দুই রূপ ধারণ করেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্
দুই বস্তুর ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি ও জ্বালাতে যৈছে কিছু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

এই দুই স্বরূপ বস্তু লইয়াই শ্রী অমিয়া ব্রজলীলা। অন্য যাহা কিছু বা যে কেহ সে শুধু এই যুগল লীলার রসপুষ্টির উপকরণ মাত্র। যথা—

রাধা সহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার প্রিয় সখি হইলেন ললিতা ও বিশাখা এবং তাহারা শ্রীরাধারাণীর কায়ব্যূহরূপা। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পক-লতা, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা—এই অষ্ট সখী রূপে গুণে সমতুল্যা এবং সকলেরই লক্ষ্য এক। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সকলেরই প্রাণস্বরূপ। নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নায়িকা মুকুটমণি শ্রীরাধার মিলন সাধন করাই এই সখিগণের নিত্য কাম্য। নিজেদের সুখের প্রতি বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই। শ্রীরাধা-রাণীর সুখই সখিগণের সুখ। এই সখিগণের স্বভাব অতি দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত। নায়িকা হইয়া তাঁহাদের নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি প্রভৃতি মিলনের বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। এই প্রেমকারীকরগণের ব্রত হইল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন সম্পাদন করা। "প্রেমকারীকর মোরা যত সখিগণ ভাঙ্গিলে গড়িতে পারি পীরিতি রতন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাঙ্গা গড়াই হইল এই প্রেমকারীকরগণের নিত্যকর্ম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার মনে যে উল্লাস হয় তাহা হইতে কোটিগুণ সুখ সখিগণ অস্বাদন

করেন। "নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার। কৃষ্ণ সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার"। (চৈঃ চঃ) বস্তুতঃ সুখবাঞ্ছা নাই৷ অথচ কোটিগুণ সুখাস্বাদ হয়, ইহা অতি অদ্ভূত ও তাৎপর্য্যময় ও দুর্বোধ্য। অহো! সখিগণের এই নিঃস্বার্থ ও নিবৃ'তি মার্গীয় প্রেমসেবা, অকৈতব, নিরুপাধি গাঢ় পিপাসাপূর্ণ প্রেম সেবন না হইলে কি সূত্রসঞ্চালিত দুই পুত্তুলিকার ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহাদের অনুরাগ রজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া সখিগণের অনুগত ভাবেও ইচ্ছানুসারে লীলা করিতেছেন। যাহার ভগবত্তা শক্তি অন্য নিরপেক্ষ ও স্বয়ং সিদ্ধ। তিনিও এই সমর্থাবতির সখিগণের হস্তে ক্রীড়নক। এই মহাবল প্রেমের নিকট শ্রীভগবান পরাভব মানিয়া নতি স্বীকার করেন। দুর্বোধ্য, দুজ্ঞেয় ও নিরুপম এই গোপীপ্রেমা এ প্রেমের নিকট শ্রীভগবান ঋণী থাকিয়া যায়েন। কামক্রীড়া সাম্যের পরাধিত্ব না হইলে এই নিঃস্বার্থ নিবৃত্তি মার্গীয় নিরুপাধি প্রেম উপজয় হইতে পারে না। তাই এই গোপী প্রেমকে শাস্ত্রে 'অপ্রাকৃত কাম' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"সহজ গোপীয় প্রেম নহেত প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তাহে কহি প্রেম নাম॥ চৈঃ চাঃ

এই সখিগণের প্রধানা ও প্রাণস্বরূপা শ্রীরাধারাণীর দেহ মাদনাখ্য মহাভাবরূপ উজ্জ্বল চিন্তামণি দ্বারা অলঙ্কৃত। ললিতা বিশাখাদি সখিগণের স্নেহপূর্ণ সুসখ্য ভাবরূপ সুরভিত কুঙ্কুমাদি দ্বারা শ্রীমতীর দেহ সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছে। কারুণ্যরূপ অমৃত তরঙ্গ দ্বারা তিনি প্রভাতে স্নান করেন। মধ্যাহ্নে যৌবনামৃত ধারায় ও সায়াহ্নে দেহের উজ্জ্বল ধারায় স্নান করেন। আবার বদ্ধ কেশপাশ যেরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ শ্রীমতীর মানাখ্য বিপ্রলম্ভও নিজ মনের ভাবদ্বারা গোপন হেতু আবৃত হওয়ায় কাহারও বোধের বিষয় হয়না। কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি ও রমণী মুকুটমণি রূপে শ্রীমতীর খ্যাতি, তাহাই ললাটে উজ্জ্বল তিলক হাস্যাদি দ্বারা শ্রীমুখমণ্ডলে অন্তরের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া অনুরাগ রূপ তাম্বুল দ্বারা শ্রীরাধার অধরোষ্ঠ রঞ্জিত বলা হইয়াছে। চক্ষু গোলকদ্বারা হৃদয়ের বাম্য বা কুটিল ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া প্রেম

কৌটিল্যরূপ কজ্জল ধারন কথিত হইয়াছে। আবার প্রেম বৈচিত্ত্য এক প্রকার বিরহভেদ ইহাকে হারমধ্যগত মণির সহিত অভেদ বলায় উঁহার অনুরাগ অংশে শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। প্রিয়তমের সন্নিধানে থাকিয়াও অতিশয় অনুরাগ নিবন্ধন যে বিরহ-বোধ, তাহাই প্রেম বৈচিত্ত্য। প্রেমের আতিশয্যে "প্রিয়তমের সঙ্গলাভ আর অধিককক্ষণ হইবেনা" এইরূপ ভাবও ভাবনা হইতেই প্রেম বৈচিত্ত্য অবির্ভাব হয়। শ্যামসুন্দরের বক্ষে থাকিয়াও শ্রীরাধার

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে
না জানি রাধার প্রেম তিলে জনি ছুটে" (চণ্ডীদাস)

আবার পদকর্তা গোবিন্দদাস প্রেমবৈচিত্ত্য সম্বন্ধে এইভাবে গাহিতেছেন—

শ্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল
মদন আলসে ভুইঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেমন কাঞ্চনমণি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি-ধনি বোলত
কব মোহে মিলব কান॥
হৃদয়ক তাপ তবহু-মুঝ মিটিত
অমিয়া করব সিনান।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা এক হস্তে আর কত লিখিব! যে প্রেমে "না খুঁজিল দুতী না খুজিল আন। দুহুকো মিলন মধ্যে পঞ্চবান॥" যে প্রেমে দুঁহু কোরে দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া,। যে প্রেম বিরহের মধ্যে মিলনের আস্বাদন করায় ও মিলনের মধ্যে বিরহোৎকণ্ঠা জাগায়, যে প্রেম নিত্যানবায়মান অর্থাৎ তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়িবার আর স্থান নাই তথাপি বৃদ্ধি পাইতেছে, যে প্রেম গুণ দর্শনে গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় না অথবা দোষ দর্শনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না, যে প্রেম প্রিয়তর প্রাণাপেক্ষাও প্রাণাধিক। যথায় প্রতিদান চাহেনা নির্বিচারে আকুল আগ্রহে একে অন্যকে বিলাইয়া দেয়, সেই স্বতঃসিদ্ধ অকৈতব ও

নিরুপধি রাধা প্রেম ও প্রেম মহিমা ও প্রেমমাধুর্য্যের জয় হউক। এই প্রেম মাধুর্য্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে—

কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপানে।
নিরন্তর পূর্ণ করেন কৃষ্ণের সর্বকামে ॥

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতিরস এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁন্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥
জলবিন্দু মীন জনু কবাহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা নাহি শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেই হেন নহে
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা,
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

আবার পদকর্তা গোবিন্দ দাস শ্রীরাধকান্তের নিত্যনব প্রেমবিলাস এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

দুঁহু জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুঁহু রূপগুণ, দুহু হিয়ে জাগ॥
দুঁহু মুখ চুম্বই দুহু করু কোর॥
দুঁহু পরিরম্ভনে দুঁহু ভেল ভোর॥

তুঁহু দোঁহে যৈছন দারিদহেম।
নিতি নিতি আব নিতি নবপ্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীগোপাঙ্গনাদের সহিত প্রীতিরস নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, তাই তাহাব ইচ্ছার গতিরোধ করিবার মত সাধ্য চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগমণ্ডলে কাহারও নাই। শ্রীনন্দকিশোরের এই পরকীয়া লীলা যে কত মধুর, তাহা তাহার রসিক ভক্তগণই অবগত আছেন। অনাদিরাদি গোবিন্দের পরকীয়া অভিমানিনী ব্রজাঙ্গনাদিগের শ্রীমুখোচ্চারিত হরিকথা-গীতালাপনে ত্রিভুবনের আকাশ বাতাস পবিত্র হইয়া যাইতেছে। সেই কৃষ্ণ প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা রসিক ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য এই ভৌমবৃন্দবনে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মর্ত্ত্যবাসীর অপরিসীম সৌভাগ্যেরই সূচনা করিতেছে। শ্রীব্রজ-গোপীগণের নিখিল চেষ্টা ও উদ্যম কেবল কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের সঙ্গম ও বিহার প্রভৃতিও নিজ সুখের জন্য নহে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করিলে গোপীগণের দেহমন প্রফুল্লিত হয়, যথায় তাহাদের সুখ-বাঞ্ছা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত দর্শন, স্পর্শন ও আলিঙ্গনে কোটিগুণ সুখ আবির্ভাব হইয়া কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত হয়, যেথায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই কেবল গোপীগণের কামনা, সেই কামই প্রেমনামে অভিহিত হইয়াছে। "প্রেমৈব গোপ রামানাং কাম ইত্যগমং প্রথাং।" তথাহি গোপী-প্রেমামৃত গ্রন্থে (৩৬)

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যাং পরং ন মে পার্থ! নিগুঢ় প্রেমভাজন ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে অর্জুন, যে সকল গোপীকা নিজেদের অঙ্গকেও মদীয়-ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন, তাঁহারা ব্যতীত মদীয় নিগুঢ় প্রেম-ভাজন আর অন্য কেহ নাই। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

শ্রীলব্রজদেবীগণের দর্শন ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধক জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কৃষ্ণমাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষ একমাত্র শ্রীব্রজাঙ্গনাগণই অনুভব করিয়াছেন, অন্য কেহই এই জাতীয় অভিনিবেশ, এই পরিমাণে প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তাহাদের অধিরূঢ় মহাভাবের গতি-নীতি যে কত দুর্লভ, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত, গোপীপ্রেমামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

ত্রৈলক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবন পুরী।
তত্রাপি গোপীকা পার্থ! রাধাভিধা মম॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—"হে পার্থ! বৃন্দাবন পুরী বিদ্যমান থাকাতেই ত্রিলোকীতলে পৃথিবী ধন্যা! সেই বৃন্দাবনে গোপীগণই ধন্যা, কেননা তন্মধ্যে মৎ প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা রহিয়াছেন।

যে ব্রজদেবীগণের চরণ রেণু লালসায় ব্রহ্মা গোকুলে স্থাবর জন্ম এবং উদ্ধব মহাশয় গুল্মলতা ঔষধি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের শিরঃপীড়ায় কৃষ্ণশিরে প্রলেপ করিতে ত্রিভুবনে কোন ভক্তপদ রেণুলাভে বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে যে ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়া দেবর্ষি নারদ চমকিত হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, যে ব্রজঙ্গনাগণের স্বজন; কুলাদি, আর্যপথ ত্যাজক অনুরাগময় পরকীয়া ভাব বেদ বিধির অগোচর, যে ব্রজদেবিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় এমনই দৈন্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের চরণে সাক্ষাৎ প্রণাম করিতে সাহসী না হইয়া দূর হইতে কম্প ও গদগদভাবে বলিতে লাগিলেন—'বন্দে নন্দব্রজ স্ত্রীণাং অর্থাৎ আমি দূর হইতে এই নন্দব্রজস্ত্রী মাত্রেরই চরণের অসংখ্য রেণুর মধ্যে একটি রেণুকে প্রতিক্ষণই বন্দনা করি, যাঁহাদের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীহরি কথার উচ্চৈঃস্বরে গান—'উদগায়তীনাং' রীতি অনুসারে এই ত্রিভুবনের আকাশ-বাতাস পবিত্র করিতেছে, যাঁহাদের সম্বন্ধান্বিত হরিকথা মহাভাগবতগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ এই ত্রিভুবনকে

পবিত্র করিতেছেন, সেই ব্রজদেবিগণই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপ ও কৃষ্ণ-হৃদয় সরোবরের প্রস্ফুটিত কমল। এই কৃষ্ণকান্তা গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি পরম গোপ্যা বলিয়া ক্বাচিৎ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কাচিৎ শব্দের অর্থ পরম শ্রেষ্ঠা ও প্রেষ্ঠা, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, রমণীমুকুর্বমণি, শ্রীরাধারাণী। 'ক্বাচিৎ' শব্দের শ্লেষার্থেও "কে প্রেমসুখে আসমন্তাৎ চিৎ জ্ঞানং যস্যা" অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে যে অখণ্ড সুখ, তাহা যাঁহার পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি আছে, তিনিই কাচিৎঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া মুকুটমণি শ্রীরাধারাণীতে মাদনাখ্য মহাভাব জনিত পরিপূর্ণ প্রেমসুখ অনুভব হয় বলিয়া শ্রীরাধার একটি নাম 'কাচিৎ,' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার মধুরোচ্ছল ব্রজপ্রেম ভাষায় বর্ণনাতীত। শ্রীরাধার প্রেম মহিমার গুরুত্ব আমাদের মত ক্ষুদ্র ও নশ্বর জীবের পক্ষে বর্ণনা করা সাধ্যের অতীত। যাহার ভগবত্তা শক্তি অন্য নিরপেক্ষ, যিনি অবতারবলী বীজ, যিনি অনাদিরাদি গোবিন্দ সেই শ্রীকৃষ্ণই মহামহিমান্বিতা শ্রীরাধার মহিমাও গুণ বর্ণনে অসমর্থ অর্থাৎ মহিমা বর্ণনে কুল কিনারা পাননা। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"যার সৎগুণ গণের কৃষ্ণ না পায় পার ?
তার গুণ গণিবে কেমতে জীর ছার ॥"

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি
নিতাই গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি।

(২) অথ শ্রীশ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় বাঞ্ছা :—

"অনয়া আস্বাদ্যঃ যেন অদ্ভুত মাধুরিমা কীদৃশঃ বা মদীয় :—অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীরাধার যে প্রেম ও মহিমার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রেম মহিমা দ্বারা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার অসীম মাধুর্য্যটি কিরূপ ? আরও একটু বেশী আস্বাদন করিলে মনে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লোভ কেবলমাত্র নিজমাধুর্য্যের প্রতি নহে, শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আপন মাধুর্য্যের লোলুপতাও বটে। দ্বিতীয় বাঞ্ছটী আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের (১) নাম মাধুর্য্য (২) রূপ-গুণ মাধুর্য্য (৩) লীলা মাধুর্য্য

(৪) বেণু মাধুর্য্য ও (৫) প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইবে। এই মাধুর্য্য অনন্যসাধারণ ও অসমোর্দ্ধ। অন্যকোন ভগবৎস্বরূপে বা অবতার স্বরূপে এত মাধুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়না,

অথ নাম মাধুর্য্য ঃ—

নাম চিন্তামণি ঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহ ঃ

পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোহ ভিন্নাত্মান্নাম নামীনো

নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব নাম কৃষ্ণস্বরূপ, নাম চৈতন্যরসমূর্তি, সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ, মায়া বদ্ধ রহিত। নিত্যমুক্ত ও চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। কলিযুগে এই তারকব্রহ্ম নামই মহামন্ত্র। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা বা কর্ষন করা। এই-কৃষ্ণ নাম জীবের দেহমন প্রাণাদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন অথবা জীব-হৃদয় কর্ষন্ করিয়া শ্রীনামবীজ বপনে উপযোগী করেন। কৃষ্ণ শব্দের নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায় ঃ—

কৃ আছি গোপীগণের রত্ন পুষ্টি করে।
এতএব কৃষ্ণনাম বলি যে তাহারে॥

আবার রাম শব্দের রূপ এই ভাবে পাওয়া যায়, যথা—

"রাধিকার সঙ্গে সদা করয়ে রমণ।
এতএব রাম নাম কহি সে কারণ॥"

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও মহাপণ্ডিত শ্রীলপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমমহাপ্রভুকে বলিয়া ছিলেন—"আপনি শ্রীপাদ কেশব ভারতীর শিষ্য। সন্ন্যাসী হইয়া বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান না করিয়া শুধু ভাবাবেশে নৃত্য করেন, ইহা সন্নাসীর ধর্ম্ম নহে। উত্তরে শ্রীমন মহাপ্রভু গুরু প্রদত্ত কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এতবলি গুরু বলিলা মোরে বচন॥

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই ভজে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ (চৈঃচঃ)

নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীরাধারাণী কোন সখিকে বলিতেছেন—"হে সখি আমার শ্রুতিমূলে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করিতে আমার নয়ন প্রতিনিয়ত অশ্রুসিক্ত হইতেছে, আমার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া মনোপ্রাণ আকুল করিয়া ফেলিল, কৃষ্ণ নামের এই দুইটী অক্ষর যে কত মধুময় যে আমার রসনা ঐ নাম ছাড়িতে পারিতেছেনা। এই নাম জপিতে আমার সমস্ত দেহ অবশ হইয়া অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতিতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইল। বলো দাও সখি, কেমনে তাঁহাকে পাব।" (বিদগ্ধমাধব)

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস নাম মাধুর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করিতেছেন:

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পসিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে না পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই! তারে।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বিদগ্ধ মাধব নাটকে শ্রীকৃষ্ণের নাম মাধুর্য্য, রূপ মাধুর্য্য ও বেণু মাধুর্য্য একসঙ্গে প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—"হে সখি! একজনের 'কৃষ্ণ' এই নামের অক্ষর শুনিয়াই আমার জ্ঞান লোপ পাইতেছে, অন্য এক জনের বংশীধ্বনিতে আমাকে পাগল করিয়াছে, চিত্রপটে দৃষ্ট আর এক ঘনশ্যাম পুরুষ আমার মনো মধ্যে বিরাজিত—হায়! ধিক। কষ্ট!—একসঙ্গে তিন পুরুষের প্রতি আমার অনুরূপ ধারনাই আমার পক্ষে মঙ্গল জনক নয়। তখন উভয় সখি সহর্ষে উত্তর দিলেন সখি! কিরূপে তোমার গোকুলেন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি অনুরাগ সম্ভব হইতে পারে কি? এতএব, শ্রবণকর, এই তিন সেই এক মহানাগর শ্রীকৃষ্ণ।

(২) রূপগুণ মাধুর্য্য :—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ ও তত্ত্ববিদগণ শুধু 'মধুরং, মধুরং' বাক্যে সমাধান করিয়া আর কিছু লিখিতে সমর্থ হন নাই। তাহার বর্ণ নীলোৎপল অপেক্ষাও সুকোমল, নীলমণি অপেক্ষা উজ্জ্বল, নবজলধর অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও মেদুর। তাহার মোহন চূড়ায় মনোহর ময়ুর পুচ্ছ ঈষৎ বামে হেলিয়া দুলিতেছে। দেখিতে মনে হইতেছে যেন নবজলধর দর্শনে ময়ুর আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পদ্মপলাশের ন্যায় সুবিশাল আকর্ণ বিস্তৃত নয়নদ্বয় যেন প্রফুল্ল পুণ্ডরীক প্রভাকে পরাভূত করিতেছে, আবার তদীয় নয়ন চকোর বদন চন্দ্রমার সুধালোভে চঞ্চল মূর্তি ধারণ করিয়া বকিম নয়নে নয়ন-পত্র রূপ দুইটি চকোরের পাখা ক্ষণে ক্ষণে সকুঞ্চিত ও প্রশারিত করিয়া শ্রীরাধাসহ ব্রজঙ্গনাগণকে এবং সমস্ত জগৎকে যেন সঙ্কেতে আকর্ষণ করিতেছে। এই কটাক্ষবান প্রণয় মদে মত্ত হইয়া ব্রজযুবতীবৃন্দের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে এবং তন্নিমিত্ত অবশ হওয়ায় ব্রজবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ আনন্দ কম্পন-যাতনা উপস্থিত হইতেছে। শ্রীগোবিন্দের অঙ্গ-সন্নিবেশ এত মধুর, এত সুরম্যাঙ্গ যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে যে তাহার দেহের কি সমস্তই শোভা, কি সমস্তই লাবণ্য, কি সমস্তই মাধুর্য্য ; কি সমস্তই সৌরভ বা কমনীয়তা আবার বিদগ্ধ মাধবে—(১/১৪) পৌর্ণমাসী দেবী নান্দীমুখীকে বলিয়া ছিলেন—"অহো. শ্রীকৃষ্ণ কি মনোহারিনী শোভা ধারণ করিয়াছেন, ইহার দেহকান্তি নীলমণি অপেক্ষাও দিব্য প্রভায় সমুজ্জ্বল, নয়নের দীপ্তিতে বিকচ সরোজ প্রভা পরাভূত, তাহার পীতাম্বর শোনকুসুম কান্তিকেও লজ্জিত করিতেছে এবং কাননজাত পত্র পুষ্পাদি বিরচিত বেশভূষা দিব্য বেশের শোভাকে বিড়ম্বিত করিতেছে।" তাহার মুরলী লাঞ্ছিত নিরুপম বদন চন্দ্রমা দেখিলে মনে হয় যেন বিধাতা নিখিল সৌন্দর্য্য হরণ করিয়া ঐ শারদ সুধাকরের মুখমণ্ডলে সন্নিবেশ করাতে তাহার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার শুন্য হইয়া গিয়াছে। শ্রীগোবিন্দ দাস রূপাভিসারে বর্ণনা করিয়াছেন—

"মুখমণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু শিখ-গুক মণ্ডিত
মালতী মধুকর মাল ॥" ইত্যাদি

আবাব কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গবিন্দু
এক বিন্দু জগত ডুরায়।
ত্রিভুবনের যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি
তাহে ডুরায় আগে উঠিধায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের অধর ও ওষ্ঠ বান্ধুলী পুষ্পের ন্যায় রঙ্গিন। চন্দ্র, কুন্দ পুষ্প ও মন্দার কুসুম সদৃশ ঈষৎ হাস্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেদীপ্তমান। সাধারণ লোকে কথা বলে তবে হাসে, কিন্তু শ্যামসুন্দর কথা বলিবার পূর্বেই এমনস্মিত মধুর হাস্যে উৎফুল্লিত হন, যেন মনে হয়, অমিয় নিছনি মধুর রক্তিম বিম্বাধর হইতে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ ফাটিয়া সুধারাশি বর্ষণ করিতেছে। এই হাসিয়া বাসিয়া মধুর অধর দেখিলে কোন্ যুবতী নারী কুল রক্ষা করিতে পারেন। সে মাধুরী দেখিয়া লক্ষীর হৃদয়ও ভুলিতে থাকে। শ্রীমতী বিরহে কাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া বলিতেছেন—

"সেই সৌন্দর্য্যামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু
ললনার চিত্তাদি ডুবায়।
কৃষ্ণের যে নর্ম্ম কথা শুধু সুধাময় গাথা।
তরুণীর কর্ণানন্দ তায়,
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মাধুরী ছন্দে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে বাঁধে
বলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আকর্ষয় ॥"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমাদের যে চক্ষু তোমার কুটিল কুন্তল বিশিষ্ট শ্রীমুখ দর্শন করে, বিধাতা সেই চক্ষুতে পলকের সৃষ্টি করাতে নির্বোধ জড় বলিয়াই বিবেচনা করি।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥

অন্যত্র,

যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে করে দ্বিনয়ন,
বিধি হয়ে হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে কোটী আঁখি তারে করে
তবে জানি যোগ্য সৃজন তার (চৈঃ চঃ)

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—"সৌন্দর্যেন দৃগানন্দকারী রুচির উচ্যতে।" অর্থাৎ কান্তিদ্বারা আনন্দকারী হইলেই রুচির' বলা হয়। পূর্ব্বে সুরম্যাঙ্গের উদাহরণ প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া তিনি একটি শ্লোক পরিবেশন করিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় নাভি চরণযুগল, নেত্রদ্বয় ও শ্রীমুখমণ্ডল—এই অষ্ট অঙ্গই পদ্ম। এই অষ্টাঙ্গের কোন একটিতে গোপীদের চঞ্চল নেত্ররূপ ভ্রমর সকল কোনরূপে পতিত হয়, তবে সেই অঙ্গ কান্তিরূপ পঙ্কময় স্থান হইতে আর উঠিতে পারে না।" তাই শ্রীরাধারাণী বলিয়া ছিলেন—

"জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু। নয়ন না তিরপিত ভেল ॥" বিদগ্ধ মাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিশাখা সখি শ্রীরাধাকে বলিলেন —"হে সখি! লোকগণ তোমাকে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যশালী বলিয়া থাকে তবে কেন উদ্বিগ্ন হইতেছে? উত্তরে শ্রীরাধা বিশাখা সখিকে বলিলেন—"সখি! সেই ধূর্ত্তই আমাকে নির্গুণে পরিণত করিয়াছে। যাহার সুশোভন বক্ষস্থল কুল বধুগণের ধৈর্য্য নদী অবরোধ করিতে দক্ষ, যাহার বদন চন্দ্রমা কুলধর্ম্ম-সঙ্কোচনে দীক্ষিত, যাহার বাহুযুগল

উন্নত ব্রীড়া-বলিদান যজ্ঞের জন্য চিরকালের জন্য উদ্গত যূপকাষ্ঠ সদৃশ, হে সখি! কি কষ্ট যে! তাহার নেত্রভঙ্গীরূপ ভুজঙ্গিনী আমাদের সকলই গ্রাস করিয়া ফেলিল।"

শ্রীকৃষ্ণের অর্গলসদৃশ আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় বাহুদ্বয় সংকুচিত করিয়া মনোরম বেণুরন্ধ্রে চপল করাঙ্গুলী সমূহ সঞ্চালন করিয়া বংশীধারী রক্তিম বিম্বাধর সুধারসে সিক্ত করাতে মধুর মূরলী রাধা রাধা! বলিয়া বাদন করিয়া দিব্যবাগসকল উদ্গীরণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অধর ও ওষ্ঠ বান্ধুলীপুষ্পের ন্যায় রঙ্গিন এবং উহা রাধিকার নিকট অমৃতের খনি বলিয়া শ্রীরাধার মধুর অধর স্পর্শ করিবার নিমিত্তই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়জাত অন্তঃরঙ্গ বাগ (রঙ) হইতেই ঐ ওষ্ঠ রঞ্জিত হইয়াছিল।

যাহার মনোহর, উন্নত পদাগ্রভাগের নখরাজি দর্পণ অপেক্ষাও শোভান্বিত এবং নখাবলী দ্বারা শোভমান্ রত্নাঙ্গুলী রূপ পত্র নিকরে তাহার পরম রমণীয় যুগল চরণকমল কোটী চন্দ্রের ন্যায় আভা উদ্গীরণ করিতেছে এবং উজ্জ্বল শ্রীচরণ পদ্মদ্বয়ের উপরিভাগে মণিময় নূপুর দীপ্তি পাইতেছে, সেই জগন্মোহন নব কিশোর, নবকন্দর্প স্বরূপ নন্দ কিশোরকে নিরীক্ষণ করিলে কাহার নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত না হয়?

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণ নিরূপম ও অচিন্ত্য। যিনি অচিন্ত্য মহাশক্তিমান, যিনি নিখিল অবতারসমূহের উৎপত্তিস্থল, যাহার চমৎকারী রূপগুণ-লীলা-তরঙ্গের মহাসাগরে স্নাত হইয়া পরমহংস মুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীপাদ শৌনকাদি ও সনকাদি আত্মারাম মুনিগণ নিগ্রন্থচিত্ত হইয়া অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, যাহার বিশ্ব-বিমোহন রসরাজ ও বিদগ্ধরাজ মূর্ত্তিতে গোপবামাগণের নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে ও চরাচর জগতকে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়, যাহার মনোরম বংশী নিনাদে ত্রিভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করে, শ্রীযমুনা তরঙ্গ ভঙ্গে উজান বহিতে থাকে, ও পর্ব্বতমালা আর্দ্রীভূত হইয়া যায়, যাহাকে একটিমাত্র তুলসীপত্র সহ এক চলুক জলদ্বারা আরাধনা করিলে ভক্তগণের নিকট

নিজাত্মাকে বিক্রয় করিয়া মধুর প্রেমে ভূষিত করেন, যিনি বৃন্দাবনের লতা-বল্লরীকেও বক্ষে লইয়া চুম্বন করতঃ মধুর প্রেমে ভূষিত করিতেন. সেই অনন্ত রূপ-গুণ সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পূর্ণ, দ্বারকাদিতে পূর্ণতর রূপে এবং গোকুলে পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন. সেই নিত্যনবায়মান ধীর ললিত, বদান্য, ভক্তসুহৃদ, প্রেমবশ্য. সর্ব্বশুভঙ্কর, মধুমর শ্রীগোবিন্দের চারু চরণ-কোকনদে ব্রজাঙ্গনাগণ. ব্রজবাসিগণ ও রসিক ভক্তগণ মধুপান করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদনমোহন মূর্ত্তি। প্রাকৃত মদন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সম্ভোগসুখ কামনায় অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ দর্শনে "পুরুষ, যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম" মোহিত হইয়া যায়। শ্রীমনমহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদকে বলিয়াছিলেন—"যে রূপের এক কণ ডুবায় এই ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ"

"বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীব কামগায়ত্রী যার উপাসন ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের নিরূপম রূপমাধুরী এমনই চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী যে দর্পণে, মণিস্তম্ভে অথবা মানসগঙ্গায় নবীন নাবিকবেশে নিজের প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজেই বিমোহিত হইয়া বলেন—"আমি কি এতই সুন্দর!"

"কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ,
সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ"
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥"

নিজের অদ্ভুত, অনন্ত ও মনোহারী রূপমাধুর্য্য সম্যক আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদনের মানসে শ্রীরাধার রূপ ও কান্তি ধারণ করিয়া রসিক শেখর শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরকিশোর রূপে অবতীর্ণ হইলেন। সংসারে এমন কেহ নাই যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ মাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। ঐ সর্ব্বাতিশয়ী মাধুরিমা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে আস্বাদন

করা জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। "ত্রিজগতে কেহ ইহার নাহি পায় সীমা।" শুধু তবু একজন আছেন, যিনি ঐ বিশ্ব-বিমোহন মাধুর্য্য সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করিতে পারেন, তিনি বৃষভানু রাজ-নন্দিনী শ্রীরাধারাণী।

"এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।।" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধা 'একলি' এবং 'নিত্যই' আস্বাদন করেন। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমরা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি, উহা জড়ীয় ও মলিন। শ্রীভগবান নিজের মূর্ত্তি দেখেন ভক্তের হৃদয় দর্পণে। জড়ীয় দর্পণ গ্রহণ করে প্রতিবিম্ব আর ভক্তহৃদয় গ্রহণ করে বিম্ব বা মূল বস্তু, কারণ ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম'। এ জগতে যত ভক্তের হৃদয় দর্পণ আছে—স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম,—তন্মেধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বচ্ছতমের পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে শ্রীরাধার প্রেমদর্পণে বা সৎ দর্পণে। এই সৎ দর্পণে মলিনতার লেশমাত্র নাই বলিয়া উহা নিরুপাধি। এই সৎ প্রেমদর্পণে শ্রীরাধা 'একলি' শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম রূপমাধুর্য্য পূর্ণাঙ্গে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন। শ্রীরাধার চিত্ত দর্পণের স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধনশীল। শ্রীরাধার কৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের উৎকণ্ঠা ও এইরূপ নিরন্তর বর্দ্ধনশীল। 'বাড়িতে ঠাই নাই' তবুও বর্দ্ধনশীল। এই প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনশীল ভাব অধিরূঢ় মহাভাবের বিশেষত্ব। শ্রীরাধার এই নিরুপাধি চিত্তদর্পণের অগ্রে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য নিত্য নবায়মান। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন— "এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে"। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যনবায়মান মাধুর্য্য রহিয়াছে রাধাকৃষ্ণের নিবিড় মিলনে—অর্থাৎ শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুরিমা তথা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যেই রাধা মাধুর্য্য বর্দ্ধনশীল। কৃষ্ণ-নিষ্ঠ মাধুর্য্য ও রাধা-নিষ্ঠ উৎকণ্ঠা এই দুইই অপরিসীম যথা—

"মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি"।। (চৈঃ চঃ)

(৩) শ্রীকৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্যঃ—

অতি সংক্ষিপ্তভাবে লীলা মাধুর্য্য বর্ণিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে —"অহো। স্তনকালকূটং" ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ যাহাকে শিশু কালে বধ করিবার নিমিত্ত পুতনা স্তনে কালকূট দিয়া বধ করিতে চাহিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রীপদ যোগ্য গতিই প্রদান করিয়া ছিলেন, বল দেখি তিনি ব্যতীত আর কোন দয়ালুর শরণ গ্রহণ করিব," ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন—

"রাক্ষসী পুতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেল কালকূট লইয়া॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে॥"

শ্রীদামোদরের দামবন্ধন লীলায়—মা যশোদা শ্রীদামোদরকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য যত্ন লইতেছিলেন, তখন বাৎসল্য ভাব প্রবণা ব্রজ গোপীগণ বলিতেছেন—"হে ব্রজেশ্বরি! বিধাতা তোমার পুত্রের ললাটফলকে বন্ধন লিখেন নাই, তুমি ত সাক্ষাতেই দেখিতেছ যে, সুদীর্ঘ রজ্জু দ্বারাও তোমার পুত্রের উদর বেষ্টিত হইতেছেনা. আবার রজ্জুও কমিতেছেনা"। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যখনই রাশি রাশি রজ্জুদ্বারা বন্ধন হইাতছেনা তখনই বালগোপালের বিভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে গোপাল যখন দেখিল যে বন্ধনের নিমিত্ত পরিশ্রমে মাতা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেছেন, তখন তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। দধিমন্থন গাগরীর স্ফোটন অপরাধে যেমন করিয়া বাধিয়াছিলেন, এবারও সেইভাবে ব্রজেশ্বরী গোপালকে বাঁধিলেন। ঈশ্বর বুদ্ধিহীন আত্মজ বুদ্ধিতে তিনি ধরা দেন।

নন্দ মহারাজ বিলাপ করিয়া উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন— "অহো! বাল্যকাল হইতেই গোপাল আমাদিগকে নানাভাবে রক্ষা করিয়াছে। কালিয়া দমন লীলায় কালিয়া নাগের মাথায় যখন

আমার গোপাল নাচিতেছিল, সেই কালিয়-হ্রদের উপকূলে একটি বনের ভিতরে আমরা সকল ব্রজবাসীগণ যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন চতুর্দ্দিক হইতে দাবানল আমাদের গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই বিস্তৃত দাবানল আমার গোপাল ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। অগ্নিও তাহার দাহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুধার মত সন্তর্পণ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিল। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বাতসহ শীলা বর্ষণ করিলে আমার গোপাল ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আমাদের রক্ষা করে। বৃষাসুর, সর্প্যাকৃতি অঘাসুর, অম্বিকা-বনের অজগর সর্প্প প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। কৃষ্ণের কারুণ্যাদি প্রভাবে ও প্রেমাস্পদাদি স্বভাবে ইহা করিয়াছে।”

ব্রজে পূর্ব্বরাগ, মান, দান প্রভৃতি লীলা ব্যতীত মুখ্যা অন্তরঙ্গা নিত্য লীলা এই ভৌম বৃন্দাবনে চলিতেছে। এই অহোরাত্র কৃতলীলাকে অষ্টকালিয় লীলা কহে। নিশান্ত লীলা বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিয়োগাত্মিকা বিধায় বৈষ্ণবগণ নিশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অলস পর্য্যন্ত শ্রীরাধা মাধবের নিত্য মানসী সেবা করিয়া থাকেন। এই নিত্যলীলা সনৎকুমার তন্ত্রে ষটত্রিংশত পটলে শিব-নারদ সংবাদে দেবর্ষি নারদ শিবকে কহিলেন—ভগবন ! গুরোঃ সম্প্রতি সকল সাধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাব মার্গ শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন শিব উবাচ—“সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র সর্ব্বলোকা হিতৈষিণা—ইত্যাদি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিব কহিলেন—“হে বিপ্র ! তুমি সকল লোকের হিত কামনা কর, অতএব উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার কথিত এই ভাবমার্গের সাধন অতিশয় গুহ্য ও রহস্যাবৃত। এই ভৌম বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা প্রেয়সীগণ সকলেই নিত্য, সকলেই তাঁহার তুল্য গুণশালী। প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার ব্রজবিলাস পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, অপ্রকট লীলাতেও ভৌমবৃন্দাবনেই তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে। সেইরূপে গোচারণ জন্য প্রতিদিন বনে গমন, বয়স্যগণের

সহিত গোচারণ, আবার অপরাহ্নে গোচারনান্তে গৃহে আগমন, সেইরূপই অভিসার। কুঞ্জভঙ্গে বনগোষ্ঠে গমনা গমন নিত্যই হইয়া থাকে। নিত্য লীলায় শুধু অসুর নিধনাদি নৈমিত্তিক লীলা নাই। পরকীয়া অভিমানিনী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সেইরূপ গোপন ভাবে নির্জন নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যই বিহার করিতেছেন।" ১১ ॥

সেই প্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম মনোরমা, রূপ-যৌবন সম্পন্না, প্রমদাকৃতি নানা শিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণভোগানুরূপিনী সেই ভোগপরা কিশোরীর সঙ্গে লীলা বিলাস করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তথায় শ্রীরাধিকার কিঙ্করীগণ নিত্যসেবা পরায়ণা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার প্রেম-উৎকর্ষ নিবন্ধন, প্রতিদিন যত্ন সহকারে শ্রীরাধা গোবিন্দের মিলন করান এবং মিলনান্তে যুগলের সেবনসুখাস্বাদ মনে মনে ভাবনা করতঃ সেই ভাবে সেবা করিয়া থাকেন। এই নিত্যলীলা ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে ॥ ১২ ॥ (নিত্য লীলার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রী, বৈষ্ণদাসানুদাস কৃত—'মনুষ্যত্বের ক্রম বিকাশে আদর্শ বৈষ্ণব গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

(৪) অথ শ্রীকৃষ্ণের বংশী মাধুর্য্য :—

শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী শ্রবণে শ্রীরাধা ললিতাদি সহচরীগণ সহ কৃষ্ণানুরাগে গদগদ হইয়া রাজহংসীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া দিগ বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া কৃষ্ণ গুণগানের অবিরল অমৃতধারা বর্ষন করিতে করিতে চাঁদের মালার ন্যায় কৃষ্ণাভিসারে গমন করেন। "শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী মধুধারা বর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে পাগল করিল। জলধরের গতিরোধ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বরুর চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিয়া সনন্দাদি মুনিগণকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত করিয়া, নাগরাজ বাসুকিকে আঘুর্ণিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণের ভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুক্ষরা বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অষ্টকর্ণপুটে মধুর মুরলীর অমৃতময় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যশালী ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে মুহুর্মুহু লুণ্ঠিত হইতেছেন।"

ঘুর্নিততনুইন্দ্রের সহস্র নয়ন হইতে অশ্রু প্লাবিত হইয়া বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। গৃহকর্ম্মারম্ভ কালে গোপাঙ্গনা গণের কর স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। ব্রজরামাগণকে পতির ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের গুরুজন সমীপেই নীবিবন্ধ মোচন করিয়া দিতেছে। শ্রীরাধারাণীর কাঁচুলী সিক্ত হইয়া পিযুষধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ঘন ঘন শ্বাস বহিয়া রোমাঞ্চ পুঞ্জে অঙ্গ সকল কণ্টকিত হইতে লাগিল। শ্রীযমুনা তরঙ্গ ভঙ্গে উজান বহিতেছে। পশু পাখীগণ মূক হইয়া সেই অমৃতরস আস্বাদন করিতেছে। কুসুমিত তরুলতা-বল্লরী আনন্দে হেলিয়া ঢুলিয়া একে অন্যের গাত্রে পড়িতেছে। পাষাণ মধমাধুরী আস্বাদন করিয়া দ্রবীভূত হইতে লাগিল।

অথ নন্দ কিশোরের তৃতীয় বাঞ্ছা :

"সোখ্যং চাস্যাং মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার সেই মাধুরিমার অনুভবটি কি প্রকার তাহাই শ্যামসুন্দরের জানিবার ইচ্ছা। তিনি স্বয়ং সুখময় হইয়া অন্যের সুখানুভূতির লোভ কেন? ইহা অতি বিচিত্র। শ্রীরাধার অন্তরে বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা নাই, অথচ তাহার হৃদয়ে কোটীগুণ সুখ অনুভব হইয়া থাকে। শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ বলিয়াছেন—

"কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তেঃ—সেব তৃতীয় বাঞ্ছোৎপত্তেঃ কারণমিতি।"—অর্থাৎ কারণ বিনা কার্য্য হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় বাঞ্ছার হেতু।

শ্রীরাধা রমণীমুকুটমণি এবং শ্যামকণ্ঠ হেমমণি ও পরা। পূর্ব্ব বলা হইয়াছে যে অনুরাগ যখন প্রেমের চরম কক্ষা লাভ করে তখনই মহাভাব হয়। চিত্ত সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম না হইলে হৃদয়ের অনুরাগ মহাভাব ভূমিতে আরোহণ করিতে পারেনা। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"গোপীকার প্রেম অধিরূঢ় মহাভাব নাম।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম কভু নহে কাম॥"

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

গোপীগণের সমন্ধে কোন কাম শব্দ প্রয়োগ দেখিলে উহাকে প্রেমার্থেই বুঝিতে হইবে। ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেম যদি প্রাকৃত কাম হইত তবে অষ্টাদশ পুরাণাদির বহু শাস্ত্রপ্রণেতা অসাধারণ ধীমান মহর্ষি ব্যাসদেব, তৎপুত্র আকুমার বৈরাগ্যবান পরমহংস মুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী পাদ, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবাদিদেব মহাদেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রকারগণ, মহামুনি ও তপস্বীগণ ও শ্রেষ্ঠ মানবগণ পবিত্র হইবার বাসনায় এই পরম পাবনী লীলার গুণগান করিতেন না। শ্রীরাধিকাদি ব্রজ গোপীগণ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদের মত ব্রজগগনে উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম সুধাধারা সিঞ্চন করিতেছেন। জয় শ্রীব্রজগোপীগণ। "যাঁহার কলঙ্ক কথা ভাগবতে কবি গাঁথা, শুকদেব শিরে বই কাণে" - সেই পরকীয়া পাবনী লীলা ও সেই মধুরোজ্জ্বল ব্রজ প্রেমের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেরূপ অপ্রাকৃত, তাহার ধামও সেইরূপ অপ্রাকৃত ; তাহার সঙ্গীগণও তদ্রূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও নিত্য। রসশাস্ত্রে পরোঢ়া পরকীয়া' মুখ্য শৃঙ্গার রসে বর্জ্জন করা হইয়াছে তাহা প্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মসংহিতা বর্ণিত—'আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতা কৃষ্ণবল্লভা ব্রজ গোপীগণের সম্বন্ধে নহে। শ্রীরাধা ললিতাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কান্তা হইলেও রসিকেন্দ্র মৌলি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাশক্তি যোগমায়া কল্পিত পরকীয়া ভাবের দ্বারা অবগুণ্ঠিতা। এই পরকীয়া ভাব হেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অদম্য অনুরাগ বিশেষই ধ্বনিত হইয়াছে। কৃষ্ণসুখ হেতু গোপীগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের প্রেমসেবা করেন। এহেন গোপীকাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তমা, যাহার সুখের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা নাই, সেই নিবিড় সুখের অনুভূতির জন্য শ্রীরাধারমণের লোভ এই ব্রজদেবীগণের সকল উদ্যমের মূলে কৃষ্ণ সুখ কামনা, কৃষ্ণসুখ বিধানের জন্য অদম্য চেষ্টা, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"আত্ম-সুখ গোপীকার নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার॥"

যে লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ নারায়ণে সংযুক্তা, যে লক্ষ্মীর স্বর্ণকমলের ন্যায় অঙ্গ কান্তি, সৌগন্ধবতী ও দিব্যসুখ ভোগাস্পাদা, লোকগণ শিরোমণি এবং বৈকুণ্ঠস্থিত ভূ, লীলা প্রভৃতি শক্তিগণের মধ্যে পরম প্রেমবতী, তাহারও এই জাতীয় কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদন নাই, অন্য রমণীর আর কা কথা ?

শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপগত অভেদ হইলেও বৈদগ্ধাদিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইতে অধিক উৎকর্ষ, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। এই জন্য লক্ষীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালয়িতা। যথা

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

"তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা।
পতিব্রতাগণের উপাস্যা॥
তিঁহো যে মাধুর্য্য লোভে ছাড়ি সব কামভোগে।
ব্রতকরি করিল তপস্যা॥"

যদিও স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীনারায়ণ তাহার বিলাসমূর্ত্তি তথাপি স্বরূপের ন্যূনাধিক্য অবশ্য স্বীকার্য্য। স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপের শক্তি ও স্বয়ংরূপা তথা শ্রীশক্তি বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী শ্রীব্রজদেবী-গণের অংশস্বরূপ। লক্ষীঠাকুরাণী শ্রীনারায়ণের বক্ষস্থলে সদা বাস করিয়াও শ্রীব্রজদেবীগণের ন্যায় আকুল প্রেমময়ী তৃষ্ণার অধিকারিনী নহেন বলিয়া আস্বাদনের চমৎকারিতা ও প্রাচুর্য্য প্রকাশ পাইতেছেনা। পিপাসার ন্যূনাধিক্যেই আস্বাদনের ন্যূনাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর প্রেম ঈশ্বরবুদ্ধি থাকায় উহা অনুরোধময় ও সঙ্কোচপূর্ণ। শ্রীব্রজবাসীগণের ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকায় উহা সঙ্কোচশূন্য ও অধিকতর উল্লাসময়। শ্রীনারায়ণে লক্ষ্মীদেবীর তদীয়তা বুদ্ধি বা তদাধীনতা বুদ্ধি থাকায় হৃদয়ে দুর্বলতা আছে। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তা বুদ্ধি থাকায় হৃদয়ে সবলতা ও দার্ঢ্য আছে। লক্ষ্মীদেবী সতত নারায়ণের অপেক্ষা করেন, শ্রীব্রজ-

রামাগণ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা ত করেনই-না বরং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজাঙ্গনাগণের অপেক্ষা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "রাসোৎসবেহস্য-ভুজ্যদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ" অর্থাৎ রাসোৎসবকালে শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণের কণ্ঠাশ্রয় করিয়াছিলেন, ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারন করেন নাই। ব্রজগোপীগণ ভর্তৃকা-নায়িকা আবেশে অতি প্রেমময়ী তৃষ্ণায় নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন। অন্যত্র,

"রাসোৎসবঃ সংবৃতো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ
যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বযোর্দ্বয়োঃ
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ গোপীমণ্ডল শোভিত রাসোৎসব আরম্ভ হইলে ভক্তি যোগেশ্বর, কৃষ্ণ সেই গোপীগণের দুইজনের মধ্যে একরূপভাবে কণ্ঠ ধাবণ করিয়া ছিলেন যে প্রত্যেক গোপীই দেখিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ আমারই পার্শ্বে রহিয়াছেন, আমারই সঙ্গে বিহার করিতেছেন। এই শ্লোকের 'গৃহীতানাং কণ্ঠে'—প্রমাণ করিতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরী-গণের কণ্ঠাশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীরাসলীলায় শ্রীলশুকমুণিও বাক্যেব ভঙ্গীতে শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই উৎকর্ষতার নিমিত্তই শ্রীরাসমণ্ডলী হইতে শ্রীমতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই মহারাস রজনীতে শতকোটি গোপীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া যখন রাস-মণ্ডলীর মাঝে নৃত্যবিলাস চলিতেছিল, তখন গোপঙ্গনা দিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেগের সমতা দর্শন করিয়া এবং প্রেমের গতি সর্প-গতির ন্যায় স্বভাবতঃ কুটিল ও আধল (অন্ধ) হেতু বাম্যস্বভাবা শ্রীমতী মানবতী হইয়া শ্রীরাস মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণও সমস্ত ব্রজদেবীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অতি বিষাদিত মনে প্রেয়সী শিরোমণি শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীলরায় বামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন :—

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নহে ভায়চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
শতকোটি গোপীতে নাহি কাম নির্ব্বাপন।
ইহাতে অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীলশুকদেবের শ্রীরাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন এই কথাই সুস্পষ্ট। শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া কিম্বা শ্রীরাধার অনুসন্ধানেব কোন কথাই স্পষ্ট নহে। শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীলশুকদেবের বর্ণনার সাহায্য না লইয়া রসিক কবি শ্রীজয়দেবের 'শ্রীশ্রীগীতগোবিদের' অনুসরণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীলশুকমুনি শারদীয় রাসের বর্ণনা করিয়াছেন। আর শ্রীজয়দেব বসন্তকালীন রাসলীলার বর্ণনা কবিয়াছেন। শ্রীরাসের মধ্যে অন্তসন্ধানের আড়ালে যে মানেব ব্যাপারটা তাহা শ্রীশুকমুনি অতি সংগোপনে রাখিয়াছেন। শ্রীজয়দেব প্রধানতঃ উহাই অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব শ্রীরাধার মানের কারণটা যথোচিত ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ও শ্রীরাস মণ্ডলীতে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক কৃষ্ণ আছেন। শ্যামসুন্দরের উজ্জ্বল অঙ্গে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীরাধা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপী-সঙ্গে নৃত্যগীত করিতেছেন, সুতরাং তিনি মানবতী হইলেন। তারপর শ্রীরাধা নিজের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, ইহা পূর্ব্বে দেখেন নাই। শ্রীরাধা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর সঙ্গে নৃত্য-গীতালাপ করিয়া পরিশেষে আমার পার্শ্বে দাড়াইয়াছেন, এই ভাবিতেই দুর্জ্জয় মানবতী হইয়া শ্রীরাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই কথা বলিয়া শ্রীরায় রামানন্দ ভক্ত জয়দেবের তৃতীয় সর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় উচ্চারণ করিয়া শ্রীমনমহাপ্রভুকে বলিলেন যে এই শ্লোকদয় পাঠ করিলে—মহা অমৃতের খনি উঠিবে যথা :—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী:॥১

শ্রীমতী শ্রীরাধা কংসারি শ্রীহরিকে সংসার বাসনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণও একমাত্র রাধাগত প্রাণ হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। শ্রীরাধার একটি বিশেষণ "সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাং"। শ্রীকৃষ্ণের নাম 'কংসারি'—এই শব্দটির একটি অর্থ হয় ভোগ বাসনা, যিনি তাহার অরি অর্থাৎ যাহার স্মরণে সমস্ত কামনা বাসনা দূরীভূত হয়—সেই কৃষ্ণের যে একটা সম্যকসার বাসনা আছে উহা শ্রীশ্রীরাস-লীলা, ইহা কামনা-বাসনা ধ্বংসকারীর অপূর্ব্ব বাসনা—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"ব্রজবধূগণের সঙ্গে কৃষ্ণের রাস-বিলাস।
সেইজন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণে ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়।"

লীলার মুকুটমণি এই শ্রীরাসলীলায় শ্রীরাধা একটি শৃঙ্খলা। শ্রীরাসোৎসবে শ্রীরাধার কৃপায় সমস্ত গোপীগণই রাধাতুল্যা হইয়া স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যবিলাস করিয়া-ছিলেন। সেই শৃঙ্খলারূপিনী শ্রীরাধার অবর্ত্তমানে সমগ্র রাসলীলা বিপর্য্যস্ত। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, শ্রীরাধা সকল গোপীগণের শিরোমণি। তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল :—

ইতস্ততস্তামনুস্মৃত্য রাধিকামনঙ্গ বানব্রনখিন্ন মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কালিন্দীনন্দিনী তটান্ত কুঞ্জে বিষসান মাধবঃ॥

অর্থাৎ মদনবানে ব্যথিত হৃদয় মাধব বিলাপ করিতে করিতে ইতস্তত শ্রীরাধার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া যমুনাকুলোস্থিত কুঞ্জে উপবেশন পূর্ব্বক বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ স্বগতঃ বিষাদভাবে ব্যক্ত করিলেন।) "অমি ব্রজবধূগণ পরিবৃত হইয়া যখন নৃত্য করিতেছিলাম, তখন শ্রীরাধা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; আমি শ্রীমতীর নিকট অপরাধী, তাই ভীতিবশতঃ শ্রীরাধার গমনে বাধা দিতে পারি নাই। অহো

হরি। আমি তাহাকে আদর করি নাই মনে করিয়া বোধহয় রাধা ক্রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন"।

এস্থলে, একটু ভাবিবার বিষয় এই যে যিনি স্বয়ং ভগবান্, যাঁহার ভগবত্তা অন্যনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি ভীতবশতঃ শ্রীরাধার গমনে বাধা দিতে পারি নাই"। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত। যিনি অনুসন্ধেয় বস্তু, তিনি আজ অনুসন্ধানে রত। এই বিপরীতভাব অতীব আশ্চর্যজনক। আরও আশ্চর্য, অনুসন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। যিনি সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মদনমোহন তিনিও শ্রীরাধার আকর্ষণে আকৃষ্ট, যিনি সর্ব্বারাধ্যধন তিনিও শ্রীরাধার আরাধনায় নিযুক্ত। সাধ্যধন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহারও শিরোমণি শ্রীরাধা—সাধ্যশিরোমণি :—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ।। চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও শ্রীরাধার জন্য কি করেন আর কি না করেন। কোনসময়ে বুড়ী জটিলার ভয়ে শ্রীমতীর আঙ্গিনার এক কোণে বদরীবৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করেন ; কখনও কালিন্দীতীরে রাধা দর্শনের নিমিত্ত বাঁশরী হস্তে বসিয়া থাকেন। কোনও সময় শ্রীরাধার অঙ্গপরশ লালসে কলাবতী গায়িকা, বেদেনী, ভিখারিণী, মালিনী ইত্যাদি ছদ্মবেশ ধারন করেন। আবার স্বর্ণ-লতিকাকে শ্রীরাধা ভাবিয়া বুকে জড়াইয়া ধরেন। গোবিন্দ লীলামৃতে বর্ণিত "শ্রীরাধার মূর্ত্তিতরুলতাদিতে সর্ব্বত্র স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়া নর্ত্তকীর ন্যায় ভ্রমণ সহকারে সেই কৃষ্ণকে শ্রীমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করাইতেছে"। আবার রাসনৃত্যকালে "গৃহীতানাং কণ্ঠে" প্রমাণ করিতেছে যে শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণের কণ্ঠাশ্রয় করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। গোপীগণই চুম্বকের ন্যায় শ্রীরাধার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। পুনঃ, মহারাসের উপক্রম সভাতে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ যমুনা পুলিনে নিজ নিজ কুচপ্রদেশে নিজ প্রাণবল্লভের শ্রীচরণার বিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা সেই

দুর্লভ চরণ কমল অনুরোধময় বাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হন নাই, শ্রীকৃষ্ণই উত্তমস্থান বোধে গোপীগণের স্তনপ্রদেশে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে উপরোক্ত কার্য্যগুলি করাইবার কর্ত্তা রাধাপ্রেম। শ্রীরাধার কৃপাতে গোপীগণ শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ একবার বলেন, "রাধিকার প্রেম আমায় করায় উন্মত্ত"। আবার বলেন—"যে প্রেমে আমায় করে সর্ব্বদা বিহ্বল"। শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত বিহ্বল হইয়া যান, রাধাপ্রেমে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাদকতা ও উন্মাদিনীশক্তি-মত্ততা আছে যে উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। তাই শ্রীরাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের গুরু, মহাগুরু, গুরুতম। গুরুবস্তু গৌরবযুক্ত থাকিবেই। শ্রীরাধা প্রেম গুরুতম হইয়াও সর্ব্বোতোভাবে গৌরব বর্জ্জিত। কেননা, দৈন্য নামক সঞ্চারীভাবের তরঙ্গ রাধাপ্রেমে নিরন্তন বিদ্যমান। এই হেতু দৈন্যসাগরে নিমগ্না থাকিয়া তিনি মনে করেন তিনি কৃষ্ণপ্রেমহীনা ও দীণা। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে দোদুল্যমান বনমালাকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার জন্মই সার্থক। আবার, শ্রীকৃষ্ণেব মধুর অধরে মূরলীদর্শন করিয়া তিনি বংশীজন্মের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "শুধু আমি একাই কৃষ্ণপ্রেমহীনা হতভাগিনী"—"গোপগোয়ালিনী হাম অতি দীণা, না জানি ভজনপূজন। বিরহবেদন তুয়া ও দুটী চবণ পরাণে ধরিয়া নয়ন মুদিয়া থাকি"।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে দেখা যায় 'রাধামাধায় হৃদয়ে' অর্থাৎ রাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রজদেবীগণকে ত্যাগ করিলেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ক্রোধ করিয়া মানবতী হইয়া শ্রীরাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তারপর বলিতেছেন, শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ···রণ করিয়া রাধা অন্বেষিতে চলিলেন। যিনি নাই, তাহাকে আবার

"অমি য় ধারণ করেন কিরূপে? যিনি হৃদয়ে ধৃত, তাহাকে অন্বেষণ করার

শ্রীরাধা য়োজন হয় না। 'রাধামাধায় হৃদয়ে'—এ কথার তাৎপর্য এই যে,

তাই ভ ার ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাসস্থলী ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাবিরহে রাধাভাবময় হইয়া গিয়াছেন। তাই শ্রীরাধার অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া হা রাধে! বলিয়া শ্রীবৃন্দারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু শ্রীরাধাকে পাইতেছেন না। একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণাভিসারের তীব্রতা, চিত্তের উৎকণ্ঠা শ্রীরাধার ন্যায় আর কাহারও নাই। আজ রাধা-অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার। তাই তাবটি অঙ্গীকার করিয়া রাধাভাবটি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। সাধ্যশিরোমণি রাধাভাব অতি মধুর, সেইভাব যখন শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন তখন মধুরতর। সেই রাধাভাব ও বর্ণ অঙ্গীকারে যখন দেহের কান্তি ও পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্তরকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়া যান, তখন মধুরতম। শ্রীরাসলীলার পরিণতিতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

"অচিন্ত্য ভেদাভেদত্ব বিধায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারভাব গ্রহণ দার্শনিক দৃষ্টিতে অসম্ভব নহে। এজন্য মূল শ্লোকে 'প্রণয় বিকৃতি' 'রাধা' হ্লাদিনীশক্তি—এই তিনটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা কলিযুগের প্রারম্ভে, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পৃথক সত্বায় থাকিয়াও অভিন্ন। এই যে 'ভেদাভেদ' ইহা অচিন্ত্য, অর্থাৎ শ্রীগৌর কিশোরের শ্রীমূর্ত্তিটি অচিন্ত্য ভেদাভেদের সাক্ষাৎ আবির্ভাব স্বরূপ, এই দুই তনুর মিলিত দেহই নামে শ্রীচৈতন্যদেব। ভিতরে আস্বাদনের করণ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবে সুবলিত অর্থাৎ মোড়ান। এ স্থলে এক অচিন্ত্য বিষয় যাহা ভাবিতে গেলে দার্শনিকগণের মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে; যেহেতু একজনের ভাব আস্বাদক, আর অন্যের ভাবটা সেই আস্বাদনের সাধন অর্থাৎ আস্বাদন করিবেন একজন, আর আস্বাদনের সাধন অন্যের রসনা—ইহা চিন্তাতীত। এই দুইটি বিজাতীয় ভাবের এক আধারে স্থিতি এটাও আবার বিচিত্র। বাহিরে নিজ ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ শ্যামবর্ণও স্বর্ণবর্ণ এই দুইয়ের একত্র মিলনে এক স্বতন্ত্রবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এ স্থানে শ্যাম শ্যামই আছেন, গৌর-গৌরই আছেন। উভয়ের স্বতন্ত্র সত্বা বিদ্যমান থাকিয়া অভিন্নতা, ইহা আবার বিচিত্র।

শ্রীরাধার ভাবও কান্তি উভয়ই প্রয়োজন কারণ 'আমি রাধা'—এইভাবেই বিভাবিত অবস্থায় নিজাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি শ্যামলকান্তিটা দেখেন তবে উহা ভাব বিরুদ্ধ হইবে, মূলতঃ যিনি স্বরূপে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কান্তি গৌর, ভাবাবেশে শ্রীরাধা ও নামে শ্রীগৌর কিশোর। "শ্রীরাধা কৃষ্ণস্বরূপই শ্রীচৈতন্য ইহা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বপই শ্রীচৈতন্য বলা হইয়াছে কারণ, শ্রীকৃষ্ণই নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লোভী হইয়া শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন . কিন্তু শ্রীরাধা কৃষ্ণমাধুর্য্য নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং শ্রীরাধার গৌর হইবার কোন আবশ্যক নাই। পবন্ত মাদনাঘ্য মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার আশ্রয় জাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে শ্রীকঞ্চের বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ হইত না। এইজন্য শ্রীরাধিকা নিজের মাদনায্য মহাভাব ও তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী কান্তিটা প্রদান করিয়া শ্রীকঞ্চকে শ্রীগৌরাঙ্গ করিয়াছেন।"

শ্রীনন্দ-নন্দন গোপীজন বল্লভ,
শ্রীরাধার নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর,
সুরনর মুনিগণ মোহনধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর,
জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনোদ।
ব্রজতরুণীগণ লোচন মঙ্গল,
নদীয়া বধূগণ-নয়ন-আমোদ॥"

শ্রীরায় রামনন্দের মুখে রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব শ্রবণ করিবার পর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিলাস তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ বলিলেন—"নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত"। দিবারাত্রি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সঙ্গে কোনও না কোন প্রেমের খেলা খেলিতেছেন তিনি। ইহাই তাঁহার বিলাসমতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"রায়। এহ হয় আগে কহ আর"। শ্রীরায়—"প্রভো। এক প্রেম-বিলাস বিবর্ত্তের কথা বলিব, কিন্তু তাহা শুনিয়া তোমার

সুখ হইবে কিনা বলিতে পারি না।" ইহা বলিয়া স্বরচিত একটা গানের পদ গাহিলেন। কিছুকাল গাহিতেই—"প্রেমে প্রভু তার মুখ আচ্ছাদিল।"

সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণ নাম সার্থক হইয়াছে: কিন্তু যখন তিনি অন্য কাহারও আকর্ষণে প্রলুব্ধ হন, তখনই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ রাধার পূর্ণ বশীভূত হইয়া শ্রীমতী সমীপে দূতী প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেরিত দূতীর কাছে বলিতেছেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥ (চৈ: চ:)

শ্রীরাধা বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অনুরাগ প্রথমাবধি। ঐ অনুরাগ বুকে লইয়া আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের চাঁদ বদন না দেখিয়া আমি আমার নয়ন দ্বয় মেলিবনা—এই সংকল্প লইয়াই আমি জন্মিয়াছি।"

বৃষভানু রাজার একটি সুন্দরী স্বর্ণবর্ণা কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজন্যবর্গ ও কুটুম্বগণ উপঢৌকন লইয়া সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। মা যশোমতীও গোপালকে ক্রোড়ে করিয়া আগমন করিলেন। মা যশোদার ক্রোড় হইতে মৃত্তিকায় অবতরণ করতঃ হামাগুড়ি দিয়া গোপাল শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ করিবামাত্র শ্রীরাধার নয়ন উন্মোচিত হইল এবং এ জগতে আগমন করিয়া প্রথমেই নীলমণির স্মিত, প্রফুল্ল বদন দর্শন করিলেন।

শ্রীরাধা বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ রমণ আমি রমণী তিনি স্বামী, আমি পত্নী—এইরূপ সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে আমার নাই। শুধু মদন দুইজনকে প্রেমের পেশনে এক করিয়া দিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী ধর্ম্মবোধে ভজনা করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাদের প্রেম সঙ্কুচিত। এই প্রেম সম্বন্ধানুগ

নহে, প্রেমানুগ। শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ অন্যকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক দ্বিভুজমূরলীধর ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্যমূর্ত্তিকেও স্পর্শ করিতেন না শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—যথা—

"গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহ না স্পর্শে অন্যজন॥"

শ্রীরাধা মোহনাখ্য মহাভাবের চিত্রজল্পে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—আর্য্যপুত্র কি মধুপুরীতেই আছেন? শ্রীরাধা কৃষ্ণকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করায় গাঢ় অনুরাগের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের বধূভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, কারণ পরবধূ উপপতিকে 'আর্য্যপুত্র' বলিতে পারেন না। আর্য্যপুত্র পদের নিজ পতিতেই রূঢ়বৃত্তি। যে স্থানে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ব্রজাঙ্গনাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাম্পত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমুদয় স্থানেই কর গ্রহনবিধি বিনাও গাঢ় অনুরাগের আবেশে-পরকীয়া অবস্থাতেও নিত্যদাম্পত্য. ইহাই শ্রীরাসলীলার উল্লেখিত 'কৃষ্ণবধূ' অতএব ব্রজবামাগণ লীলায় ও ভাবে পরবধূ, গাঢ় অনুরাগের আবেশে ও তত্ত্বতঃ, কৃষ্ণবধূ এই সিদ্ধান্ত সমীচিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরে রাধাকৃষ্ণ এমনভাবে মিলিত যে, তাহারা রমণ রমণী ভাবাতীত। তাহারা এক দেহে মিলিত হইলেও ভাব দুইটী, এক দেহে দুইটি মনের লীলা খেলা চলিতেছে।

শ্রীরামরায় গোদাবরী তটে হঠাৎ দর্শন করিলেন—শ্রীচৈতন্যদেবের ঐ সন্ন্যাসী রূপ নাই। ইহা দর্শন করিয়া তিনি চমকিত হইয়া গিয়াছেন, আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেখানে সন্ন্যাসীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মুরলীবদন নবকন্দর্প—স্বরূপ এক শ্যামল গোপ—কিশোরকে দেখিলেন। আরও আশ্চার্য্য এই যে ঐ ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ কান্তিকে সম্মুখস্ত এক উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা বিদ্যুত প্রভার ন্যায় তাহার অঙ্গচ্ছটায় শ্যামল বেনুকর গোপকিশোরকে উজ্জ্বল গৌরকান্তিতে আবৃত (মোড়াইয়া) করিয়া হেমাভ-দিব্যচ্ছবি—একমূর্ত্তি প্রকট

করিয়া দিলেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ মূত্তি ইহাই কলির জীবোদ্ধারী মূর্ত্তি। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

"পহেলি দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চলিকা।
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামরায়কে কহিলেন—"দেখিতেছি তোমাব শ্রীরাধা-কৃষ্ণে প্রবল প্রেম, সেইজন্য আমার মধ্যে উহা দেখিতেছ।" শ্রীরামরায় —"আমার নিকট ভারিভূরি করিও না; আমার নিকট নিজস্বরূপ আর চুরি করিও না।"

আমার মনে হয় তুমি—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥" (চৈঃ চঃ)

তখন শ্রীচৈতন্যদেব স্মিতহাস্যে বলিলেন—

"তবে হাসিপ্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥ (চৈঃচঃ)

শ্রীরাধার তপ্তকাঞ্চন সদৃশ অঙ্গছটাতেই আমার বর্ণ এইরূপ হইয়াছে। ব্রজনন্দনকৃষ্ণ ব্যতীত কাহাকেও আমি স্পর্শ করি না। "গোপেন্দ্র-সুতবিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন।" চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষায় কহিলেন— আমি সেই রাধাভাব দ্যুত সুবলিত শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণ।

শ্রীরাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহিনী ব্রজদেবীগণ আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন :—

"যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু।
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবী মটসি তদ্ ব্যথতে নং কিং স্বিৎ,
কুর্পাদিভি ভ্রমতি ধী বদা যুষ্মাংনঃ॥ (ভাঃ ১০/৩১।১০)

"ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে প্রিয় তোমার যে কোমল চরণ আমরা আমাদের কঠিন স্তনোপরি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ

করি, সেই পদ দ্বারা তুমি এখন বন ভ্রমণ করিতেছ ; তোমার অম্বুরুহ সদৃশ চরণ উপলখণ্ডাদি (ব্রজের কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা) ব্যথিত হইতেছেন ? উহা ভাবিয়া আমাদের মন অতীব বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কারণ তুমি আমাদের প্রাণ। অর্থাৎ গোপীগণ নিজেদের বিরহ ব্যথায় যতটা ব্যাকুলিত, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন প্রিয়তমের শ্রীচরণে কাঁকর ও ব্রজের কঠিন মাটি দ্বারা ব্যথিত হওয়ায়। গোপীগণের কুচযুগে শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগলের স্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞান হারা না হইয়া সুখের বিরোধী যে ভীতি, সেই ভীতিমুক্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়াছেন। ইহা আত্মসুখ বর্জ্জিত কৃষ্ণসুখে পর্য্যাবসান। তাহাদের কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভৃত্তি যাবতীয় উদ্যম শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধান নিমিত্ত। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রাস-বজনীতে বলিয়াছেন—"হে অবলাগণ। তোমরা কুলবধূ হইয়াও দুশ্ছেদ্য গৃহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, স্বজন, বান্ধব ইহকাল, পরকাল, কর্ত্তব্য, অকতব্য, সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম প্রভৃতি কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ধন, দেহ, মনোপ্রাণ জীবন ও যৌবন আমার সুখের জন্য ডালি দিয়েছ! 'মদর্থ'। গোপীগণের ত্যাগ কৃষ্ণ ভগবান—এই বিচারের ফলে নহে, উহা কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগের আবেশেই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ। এতাদৃশ মহিমান্বিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিরুপাধি অনুরাগের নিকট শ্রীভগবান পরাভব মানিয়া ঋণী হইয়া থাকেন। ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিয়া কলিযুগে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব রূপে অবতীর্ণ হইয়া নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া কলির জীবের ঘরে ঘরে শ্রীরাধার মহিমা ও প্রেমরস সীমা প্রকাশ করিয়া ঋণমুক্ত হইতে হইয়াছে! তাই এই নিষ্কলঙ্ক রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হইলেন তাঁহা বলিতেছি। তথাহি শ্রীভগবদ গীতায়াং :—"যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করেন, আমিও তদ্রুপ তাহাকে ভজন ও প্রীতি করিয়া থাকি। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী-পাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্রজগোপীগণের নিরুপাধি ভজনে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ গোপীগণের কোন কামনাই নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কিছুই দিবারও নাই। শ্রীব্রজ দেবীগণের চিত্তে কৃষ্ণসুখ কামনা আছে, তাহা দিতে হইলে নিজেরই সুখী হইতে হয়। ঋণের জন্য প্রধানা গোপীকে সুখ দিতে গেলে আরও বেশী ঋণ হয়; পরিশোধের সম্ভাবনা থাকেনা। শ্রীরাধাদি গোপীগণের প্রেম অখণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেম খণ্ডিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ বহু বল্লভ। মান প্রকরনে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছিলেন বলিয়া মানবতী হইয়া শ্রীরাধা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ; এর পূর্ব্বে তিনি জানিতেন না। "মানে আমায় জানাইল সো বহু বল্লভ কান।" যিনি তাহাকে উজ্জ্বল রসের ভজন করেন, তিনি তাহারই হইয়া যান। আর শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও হইয়া যাননা। অতএব অখণ্ডিত গোপীপ্রেমের নিকট-কৃষ্ণ ঋণী। শ্রীব্রজগোপীগণের ভজনানুরূপ ভজন বা প্রীতির অনুরূপ প্রীতি করিতে অসমর্থ হইয়া নিজেই ঋণী হইয়া গিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে

(১০/৩২/২০):—

ন পারেঽহং নিরবদ্য সং যুজাং
স্ব সাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়-গৃহ-শৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে সুন্দরীগণ! তোমাদের সহিত আমার প্রেম সংযোগ নিরবদ্য (নির্মল), আমি বহু পক্ষপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদের প্রতি সাধু ব্যবহার (কর্তব্যানুষ্ঠান) করিতে সমর্থ হইবনা, তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খাল ছিন্ন করতঃ আমাকে ভজনা করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ নহি।

এতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার তোমাদের কৃত সাধু ব্যবহায়ের বিনিময় হইল। অর্থাৎ আমি প্রত্যুপকার করিয়া তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলামনা। এখন তোমাদের প্রেমই সাধু আচরণেব প্রতিদান করিয়া এই ঋণ পৰিশোধ করুক।"

শ্রীব্রজাঙ্গণাগণ যখন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কবেন তখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বদন মণ্ডলেব প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাইয়া রক্তিম আভামুক্ত হয়, তৎদর্শনে প্রিয়তম কৃষ্ণের পবম সুখ অনুভব হয়। "আহা: শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া এত সুখাতিশয্য হইল"—এই ভাবনা হইতেই গোপীগণেব মনোসুখ-তবঙ্গ আবও উচ্ছলিত হইয়া উঠে। এইরূপে পরস্পব পরস্পরের শোভা দর্শনে আনন্দ-তরঙ্গের উচ্ছাস বা হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

"আমাব দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ
এত সুখে গোপীব প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥"

যদিও কৃষ্ণসেবা জনিত আনন্দ পরম পুরুষার্থ তবুও কৃষ্ণ সেবার বাধক অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিচারকে গোপীগণ বর্জ্জন করেন। প্রেম সেবানন্দই ভক্তের জীবাতু। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে গোপীগণের স্বসুখ বাঞ্ছা একেবারেই নাই। যথা—

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দে বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥" (চৈঃ চঃ)

গোপীগণের কৃষ্ণসুখ ব্যতীত আত্মসুখ বাঞ্ছা নাই, তবে যে দেহের মার্জ্জন ভূষণ করেন, ইহাও কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত। শ্রীরাস রজনীতে বংশীধ্বনি হইলে সকল গোপীগণ আত্মহারা প্রাণে শ্রীরাসমণ্ডলীতে ছুটিয়াছেন। শ্রীশুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন :—"লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যো-হন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে"—অর্থাৎ কোন কোন গোপী নিজ দেহে চন্দনাদি লেপন করিতে ছিলেন, কেহ বা প্রসাধন দ্রব্যাদি দেহে মার্জ্জন করিতে ছিলেন, কেহবা চক্ষুতে কাজল পরিতেছিলেন। ইহাতে বোঝা

যায় গোপীগণ দেহের মার্জ্জনভূষণ করেন বটে, কিন্তু ইহাও কৃষ্ণসুখের জন্য। কেননা গোপীগণ তাহাদের দেহকে কৃষ্ণ পূজার উপাচার বলিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছেন। দেহটি কৃষ্ণ প্রেম-বিলাসের দেহ, শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য দেহ, তাহারা দেহকে সুসজ্জিত করেন শুধু শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানের জন্য। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের শিরপীড়ায় ত দেবর্ষি নারদ কোন স্থানেই ভক্তের পদরজ পাইলেন না, শুধু ব্রজে গমন করিয়া গোপীগণের পদরজঃ পাইলেন। গোপীগণ মনে করেন কৃষ্ণপদে বিক্রীত দেহের চরণও কৃষ্ণের—এইভাবে বিভাবিত হইয়াই চরণরেণু প্রদান করিলেন, কৃষ্ণের শিরঃ পীড়া উপশম হইলেই গোপীগণের সুখ। দুর্জ্জ্ঞেয় গোপীপ্রেম। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"এ দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন॥
এই দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তাষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥"

গোপীগণের এই স্বভাব নিত্যসিদ্ধ ও স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে জানা যায় যে তিনি সমগ্র বিশ্বকে আনন্দ দান করেন; কিন্তু শ্রীরাধা কৃষ্ণহৃদয়ে আনন্দদানে চন্দ্র-কিরণ স্বরূপা। শ্রীরাধা স্বীয় অসংখ্য প্রাণপুষ্প সমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গমনাগমনের পথের চরণ ধুলি কণার নিরোজন করিয়া থাকেন। তিনি কৃষ্ণ-মানস হংসের মানস-গঙ্গাস্বরূপা, ও কৃষ্ণপ্রেম সরোবরের সন্তরনশীলা মরালিনী সদৃশা। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাষ্টি হৃদয়স্থ প্রেম-রসাস্বাদনের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সুধাধারার মত শ্রীরাধাপ্রেমই রমর্থ। শ্রীরাধার মহাভাব বাসিত মধুর রতি রসের অখণ্ড পারাবারে ভ্রমণশীল কৃষ্ণের মনোমীন নিরন্তর বিলাসানন্দে নিমগ্ন থাকে। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর মদন-মোহনরূপে সমস্ত জগতকে মোহিত করিলেও আবার শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতেছেন আমাদের কৃষ্ণ মনোমোহিনী শ্রীরাধা। মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার নামে এমন একটি মাদকতা

আছে, যাহা চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত ও বিহ্বল করিয়া দেয়। শ্রীউজ্জ্বলের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীপাদ মাদনাখ্য মহাভাবের ব্যাখ্যা এইভাবে করিতেছেন—"তস্মোন্মাদনোত্র দিব্য মধুবিশেষোন্মত্ততা—ইত্যর্থ:—অর্থাৎ মাদন শব্দের অর্থ দিব্য বা অলৌকিক মধু বিশেষের মত মাদকতা সম্পন্ন। এই ভাবের পরিবেশনে অপ্রাকৃত মত্ততাই জাগিয়া থাকে। অহো! মধুক্ষরা অমিয় নিছনি সেই রাধা-নামের যে কি প্রাণকর্ষি মোহিনী শক্তি আছে, যাহা শ্রবণ করিলেই কৃষ্ণের শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেন অমিয় প্রবাহ সিঞ্চিত হয়, মনে যেন কি এক অননুভূত ভাব-লালসা জাগাইয়া দেয় এবং এই লালসায় শ্রীকৃষ্ণের বিক্ষুব্ধ, বিলোল হৃদয় যেন কি এক মনোরম অজ্ঞাত বস্তুর অন্বেষন করে, উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠে, উল্লাসে ফুলিয়া উঠে, উদ্বেগে গলিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারনা যে কেন এই নামটা তাহাকে এত উন্মনা করে। রাধানামের সহিত তাঁহার কি এক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারেন না। তবুও এই মধুক্ষরা অমিয় নিছনি নামটা শ্রবণ করিলেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইয়া যান। মাতা যশোমতী ও রোহিনী দেবীর কথোপ-কথনে যতবারই এই ভূবন মোহিনী রাধানাম শুনিয়াছেন, ততবারই আত্মহারা হইয়াছেন। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিতে অক্ষম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ অপেক্ষা শ্রীরাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ অধিকতর, এইজন্য উভয়ের মিলনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ, তদাপেক্ষা শ্রীরাবা অধিকতর সুখ আস্বাদন করেন। ইহা ভরতমুনির জানা ছিলনা।

"দোহার সে সমরস ভরতমুনি জানে,
আমার ব্রজের রস সেই নাহি জানে"॥ (চৈঃ চঃ)

মিলনের সুখানুভূতিতে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাই মহাভাবময়ীর হৃদয়ে মহাসুখের তরঙ্গ এমনই একটা নিরুপম সুদুর্লভ বস্তু যে যাহার আস্বাদন লালসায় রসিকশেখরের মন উৎকন্টাময়। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে মাদন শব্দের অর্থ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ" ইহ মোদন ও মোহনাদি ভাবাপেক্ষা অধিকতম উৎকৃষ্ট সদা শ্রীরাধাতেই এই মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজিত। অন্যত্র ইহার উদয় হয়না। সমগ্র জগতের হর্ষপ্রদ বলিয়া ইহা অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত। আলিঙ্গন চুম্বনাদি কোটি কোটি সুখসমুদ্র এককালে (যুগপৎ) উদ্বেলিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শ্রীরাধারাণীই এই মাদনাখ্য পরাৎপরের আশ্রয় হইতে পারেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—"কুতুকী রসস্তোম হৃত্বা"—অর্থাৎ কৌতুকী কৃষ্ণ কোন প্রেয়সীর রসের ভাণ্ডার হরণ করিয়া উপভোগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের 'কুতুকী'—এই পদবিন্যাস নিরুপম ও ভাবগ্রাহী। ব্রজের ঘরে ঘরে গোপীগণের নবনীত চুরি, বসন চুরি করিয়া চৌরচূড়ামণি হইয়া ছিলেন। এই পরিপক্ক চোর এখন দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণধনের শ্রেষ্ঠা ধনি শ্রীরাধারাণীর রত্নভাণ্ডার পরিলুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ঐ রত্নভাণ্ডারে মাদনাখ্য মহাভাব বলিয়া একটা অমূল্য রত্ন আছে, উহা নাকি একমাত্র শ্রীরাধারাণীর ভাণ্ডারেই আছে। উহা হরণ করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে আস্বাদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণরসে বিশ্বজগৎ সরস, শ্রীরাধার অধর রসে শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ কোটীন্দুশীতল শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ কোটীচন্দ্র সুশীতল মনে করেন। লীলা বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের শ্রান্ত কলেবর বসন্তের মলয়ের ন্যায় তিনি স্নিগ্ধা ও তরুমনপ্রাণে উল্লাস-দায়িনী। তাইত মাদলাখ্য মহাভাবের আশ্রয় স্বরূপা শ্রীরাধার সহিত লীলা বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দ লাভ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন—

"আমা হৈতে বড় গুণী জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের মৃগমদ-নীলোৎপল অঙ্গ-গন্ধ শ্রীরাধার নাসিকায় প্রবেশ করিলে তিনি আনন্দে আত্মহাবা হইয়া সেই সুগন্ধের দিকে উড়িয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন।

"অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হৈয়া অন্ধ॥" (চৈঃ চঃ)

পক্ষান্তরে, রাধার অধর রস শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়া থাকে এবং উহাতে এমনই আসক্ত হইয়া পড়েন যে বদন হইতে বদন ভুলিতে সমর্থ নহেন। আবাব, শ্রীকৃষ্ণের চর্বিবত তাম্বুল আস্বাদন করিলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের আস্বাদনে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যান। যথা—

"তাম্বুল চর্বিবত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার মধুক্ষরা বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দ অনুভব কবেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর অধরে বংশীবাদনেব মাধুর্য্যকথা শ্রবণ করিলে—"পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে শ্রবণ তখন নিকটস্থ তরুণ তমালকে জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীরাধা মনে করেন—'আজ আমার জীবন ধন্য, আমি আমার প্রাণকোটা প্রিয়তমকে বক্ষে পাইলাম"—এই সুখে তরুণ তমালকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিতে থাকেন। যথা—

"পরস্পর বেনু গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
লীলান্তে সুখে ইহার যে অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরী॥" (চৈঃ চ°)

শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্চাত্রয়ের প্রথমটি হইল (১) শ্রীবাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ। (২) দ্বিতীয় বাঞ্ছা ঃ—শ্রীরাধা কর্তৃক মাদনাখ্য মহাভাবের দ্বারা আস্বাদ্য কৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য কিরূপ? (৩) তৃতীয় বাঞ্ছা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত, অনন্ত মাধুরিমা অনুভব করিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণাপেক্ষা কোটিগুণ সুখানুভব কিদৃশ! এই তিনটি লোভ পরিপূর্ণ করিতে হইলে শ্রীরাধার মহাভাব ও কান্তি গ্রহণ ব্যতীত বিষয় জাতীয় ভাবে সম্ভবপর নহে। যদি শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে পারেন তবেই তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

"এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধকধকি।" (চৈঃ চঃ)

একজনের ভাব ও কান্তি অপর জন দ্বারা গ্রহণ কার্য্যটী সহজসাধ্য নহে। শ্রী শ্যাম রহিয়াছেন বাহিরে, তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে অন্যের অন্তরে—ইহা একটি বিচিত্র বিষয়।

"অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গোরাঙ্গ শ্রীহরি।" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ একটি উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে—"রাধায়া ভবচশ্চ চিত্তজতুনী"—ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—"শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদজল দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উভয়ের ভেদভ্রম অপসারন করতঃ শৃঙ্গার শাস্ত্র বিশারদ বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকা অভ্যন্তরে নবরাগ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং জগতের বিস্ময় বর্দ্ধনার্থ অনুরঞ্জিত করিয়াছেন" শ্রীরূপগোস্বামীপাদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তকে জতু বা লাক্ষার সহিত তুলনা দিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে ভিন্নতা উহা ভ্রম মাত্র। শৃঙ্গার নিপুণ বিধাতা স্বেদ নামক সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা উভয়ের চিত্ত গলাইয়া এ ভেদভ্রম—অপসারন করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামীপাদের শ্লোক হইতে দুই বস্তুর ভেদ অপসারন করিয়া একীভূত করার একটি সঙ্কেত জানা গেল। এই সঙ্কেতটী সুদীর্ঘ বিরহের তাপ দ্বারা চিত্তজতুনীকে গলাইয়া দুই বস্তুকে এক করা হইলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে ভেদ ভ্রম সর্ব্বতোভাবে অপসারিত হইবে না। এক দেহে অন্যের প্রবেশ হইলেও ভিন্ন থাকিবেন। অভিন্ন হইলেও ভিন্ন থাকিবেন।

শ্রীঅক্রুর মহাশয় যখন রথে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া

যাইতেছিলেন, তখন গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণী অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কোন কোন গোপী বলিতে লাগিলেনঃ—

"রথেব নিকটে সব চলহ এখন।
রথচক্র মাথা পাতি ছাড়িব জীবন॥
তার অদর্শনে সবে রব কি প্রকারে।
না রবে এ প্রাণ সখি! সে বিচ্ছেদশরে॥
যেই নন্দসুতে হেরি সুন্দর বদন।
নয়ন আনন্দ নীরে হইত মগন॥
কিবা সে সুন্দর হাস্য, কিবা সে ইক্ষণ।
ক্ষনেক না হেরে তারে ব্যাকুলিত মন।"

শ্রীরাধা হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা বিরহে কাতর হইয়া বলিতেছেন—"এতদিন অমৃতরস পান করাইয়া সে চলিয়া গেল। বুকে দিবানিশি আগুন জ্বলিতেছে, গৃহে থাকিতে পারিনা, শয্যা কণ্টকময়। শ্রীরাধার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কিছুতেই রুচি নাই, প্রাণভরা কেবল হাহাকাব, বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া হৃদয় ছুটিয়া বাহির হইতে চায়, একবারও কি তাহাকে দেখিতে পাইনা। অমৃত পান করিলাম, সবই গরল ভেল। কৃষ্ণ নবজলধর দেখিলাম, পিপাসা নিবৃত্তি হইল না, আগুন জ্বলিল, জল পড়িল না, কি সে জ্বালা, আর সইতে পারি না"। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দাবানলে মূহ্যমান শ্রীরাধা ললিতাদি সখিগণের নিকট যে সন্তাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ললিত মাধব গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ এইরূপভাবে বর্ণিত আছেঃ—হে সখি, পুটপাক হইতেও উত্তাপী, কালকূট বিষ হইতেও মোহকারী, বজ্র হইতেও দুঃসহ, হৃদয়ে লগ্ন শল্য হইতেও অতি কটু এবং গুরুতর বিসূচিকা হইতেও অতি তীব্র এই গোকুলপতির বিরহজনিত সন্তাপ বলপূর্বক আমার মর্ম্মস্থান চুড়মার করিয়া দিতেছে। এই বিরহ সন্তাপ সহিবার আর কোন ক্ষমতা নাই,"—ইহা বলিতে বলিতে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন।

কি নিষ্ঠুর সে, এমন শঠের হাতে জীবন যৌবন সঁপিয়া দিলাম। কুলবতীর কুলের গৌরব অকুলে ভাসাইয়া দিলাম। সতীধর্ম, আর্যপথ হাসিয়া বিসর্জন দিলাম। কলঙ্কের কালি গায়ে মাখিলাম ঃ কেবলমাত্র প্রেমের অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল, তাহাতে 'নাহি ভেল যুগল পলাশ। সেই প্রণয়তরুতে যুগল পত্রও হইতে পারিল না, সে চলিয়া গেল। কেমন করিয়া ইহা সহ্য করি, ঘরে ঘরে কেবলই গঞ্জনা। জীবন বিষ হইয়া গেল। জীবনে বাঁচা হইতে মরণ শতগুণে শ্রেয়। বিষ খাইয়া মরিব? কিন্তু সেই অমৃতময়ের আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যে মুখে ও রসনায় একদা সেই শঠের অধরামৃত পান করিয়াছিলাম, সেই মুখে কি করিয়া বিষ পান করিব? তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই; কিন্তু সেই শঠ নিদ্রা, জাগরণে, স্বপ্নে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। মন শাসন মানে না। তাঁহার কথা ভাবিব না বলিলেও মন শুনে না। যেদিকে যাই সেই দিকেই যেন তাঁহার মূর্ত্তি দেখি। বাতাসে যেন তাঁহার অঙ্গের গন্ধ পাই। দিকে দিকে যেন তাঁহার মধুর মূরলীধ্বনি শুনিতে পাই। শ্রীরাধা শ্যামবিরহে উন্মাদিনী। প্রবল বিরহে শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ, উদ্ঘূর্ণা অবস্থা। ললিত মাধবের তৃতীয় অঙ্কটীর নাম 'উন্মত্ত রাধিকা'। বিরহের বেদনা যত তীব্র হয়, অন্তরের প্রাপ্তিও তখন নিকটবর্তী হয়। একদিকে শ্রীরাধার বিরহব্যাথার তীব্রতা, অন্যদিকে, পরমকৌতুকী কৃষ্ণের আশ্রয় জাতীয় সুখের নিমিত্ত ধকধকি লোভ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের, মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার চিত্তজাতুনীকে সুদীর্ঘ বিরহের তীব্র তাপে দ্রবীভূত করিয়া বিরহসন্তপ্তা দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধার মর্ম্মের হৃদয় নিকুঞ্জে রহোস্থানে প্রবেশ করিলেন। বিরহ দশার পূর্ণতায় দশ দশায় এই প্রবেশটী পূর্ণ হওয়ায় শ্রীশ্যামসুন্দর অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর হইলেন। শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবী মিলনটি দর্শন করিয়াছেন নিধুবনে। ভবন বিরহের বেদনা তীব্রতম, উহা শ্রীরায় রামানন্দকে দর্শন করাইয়াছেন। তিনি দেখিলেন—শ্রীশ্যামসুন্দর আজ স্বর্ণকমলতুল্য শ্রীরাধার হৃদয় কোষের পাপড়িগুলি বিকশিত করত ঃ পেলব কর্ণিকার স্থলে প্রবেশ

করিতেছেন। মিলন সময়ে বাম্য স্বভাবা নায়িকা সোহাগে শক্ত হইয়া যায়। তাই বিরহের তীব্রতাপে গলাইয়া মাদনাখ্য মহাভাবের কোষগুলিতে স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া রসরাজ নবরাগের হিঙ্গুলভরে শ্রীরাধার রঞ্জিত হৃদয় নিকুঞ্জ নিবাসে লুক্কায়িত হইলেন। শ্রীরায় বামানন্দ পরমানন্দের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অপ্রাপ্তির জন্য আর্তনাদ যখন চরমপ্রাপ্তি হয়। অন্তর রাজ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন তখন অতিশয় নিবিড় হয় এবং অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হাঁ প্রাণনাথ মূরলীবদন বলিয়া অশ্রুবর্ষণকারিণী রোরুদ্যমানা শুধু রাধার মূর্তিখানি—ইহাই শ্রী গৌরাঙ্গসুন্দরের মূর্তি। এই গৌরশশী যুগপৎ মিলনও বিরহের প্রতিমূর্তি। নিত্য নবানবায়নভাবে এই মিলন বিরহের জোয়ার ভাটা খেলিতেছে শ্রীনদীয়া বিনোদিয়ার হৃদয়াভ্যন্তরে। যথা শ্রীশ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃতে ঃ—

ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষনমহহ সাশ্রুয় ক্ষণমথ ক্ষণং স্মেরশীতঃ ক্ষণমন
লতপ্ত হীবণপি—ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমাধকজল্পন ক্ষণমহো
ক্ষণং মুকো গৌরঃ স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ। ৭৬॥

(শ্রীপ্রবোধনন্দ সরস্বতী)

ক্ষণকাল ক্ষীণ, ক্ষণকাল পুষ্ট, ক্ষণকাল প্রেমাশ্রুপূর্ণ, কখনও হাস্যানন, কখনও শীতল ক্ষনে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, ক্ষনে ধাববান, আবার তখনই স্তম্ভিত, ক্ষনে বহুভাষী, আবার তখনই মৌন, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গৌরদেহ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইক। ৭৬॥ শ্রীরসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ হইল শ্যাম, আর মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার বর্ণ হইল গৌর বা স্বর্ণবর্ণ। কিভাবে শ্যাম গৌর হয় তাহার কয়েকটী উপায় বা প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে ঃ—

(১) নিরন্তর উভয়ের ভাবনা। ইহার মধ্যে শ্যামের গৌর হইবার ভাবনাটী বেশী। শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার আশ্রয় জাতীয় মাদনাখ্য মহাভাবের লালসায় শ্রীরাধাকে নিরন্তর চিন্তা ভাবনা হইতে শ্যামসুন্দর রাধা হইয়া গিয়াছেন।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—"পেশস্কৃত ভ্রমর অন্য কীটকে উহার কুলায় লইয়া গেলে ঐ কীটটি পেশস্কৃত ভ্রমরের দেহ প্রাপ্ত হয়। এই অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাস বলিতেছেন ঃ—

"যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জনে অবশ্য পায়
ত্রিভঙ্গ পোকা দেখ আন জীব মাঝে
সে হয়, ভৃঙ্গের কায় ॥"

(৩) শ্রীধর স্বামী পাদ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে এক স্থানে টীকায় বলিয়াছেন—"ইন্দ্রণীলমণি যেমন চম্বক কুসুমের সহিত একস্থানে থাকিলে তাহারই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তেমনই হ্লাদিনী সারভূতা শ্রীরাধার সহিত একত্রে স্থিতি হেতু তাহার কান্তিতে ইন্দ্রণীলমণি সদৃশ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ বাহিরে গৌর বর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

(৪) কৃষ্ণ ভৃঙ্গ সুপ্রভাতে স্বর্ণপদ্মের মধুর লোভে পুষ্পের উপরে বসিয়া মধুর গুঞ্জন করিতে থাকে, সূর্য্যরশ্মি তাপ বর্ষণ করিলে ধীরে ধীরে স্বর্ণপদ্মের পাপড়ীগুলির ভিতরে ধীরে ধীরে পথ করিয়া প্রবেশ করিয়া সারাদিন মনের সাধে মধুপান করিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্ণপদ্ম মুদ্রিত হইতে থাকিলে সে বাহিরে চলিয়া আসে, তখন দেখা যায়, কৃষ্ণভৃঙ্গ সতত মধুপান ও একত্রে স্থিতি হেতু কৃষ্ণভৃঙ্গ বর্ণ ভৃঙ্গের কায় বা বর্ণ গ্রহণ করিয়াছে ; তদ্রুপ, স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধার মূর্ত্তি ভাবনা হেতু শ্রীকৃষ্ণ মহাভাব স্বরূপিণীর হৃদয় নিকুঞ্জ নিবাসে প্রবেশ করিয়া ভাব ও বর্ণ পাইয়া শ্রীগোরঙ্গ হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অথ শ্রীমন মহাপ্রভুআবির্ভাবের গৌণ অন্তঃরঙ্গ কারণ ঃ—

শ্রীঅদ্বৈত নমস্তুভ্যং কলিহত কৃপানিধে।
গৌর প্রেম প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।

আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীহরির অন্তর যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, তখন যুগাবতারের সময় আবির্ভাব হইল। তখন সন্ধানী শক্তির বৃত্তি গুরুবর্গ, পিতামাতা ও অন্যান্য পরিকরগণ শ্রীহরির আবির্ভাবের পূর্বেই মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি, শ্রীঈশ্বর পুরী গোসাঞি, পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, গর্ভধারিণী শচীমাতাঠাকুরাণী, রাঢ়দেশে এক চাকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীহট্টে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, তিরোতে পরমানন্দ পুরী গোসাঞি, বুঢ়নে ঠাকুর হরিদাস, চট্টগ্রামে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীবাসুদেব দত্ত জন্মগ্রহন করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীগদাধর, শ্রীমুরারী, মুকুন্দ ও অন্যান্য বহ পার্ষদগণ ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সকলেই শ্রীধাম নবদ্বীপ আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণের মনের ব্যথা, কলিহত জীবের হৃদয়ের বেদনা, মানবের সীমাহীন তমঃ, দুরন্ত অবিদ্যা, পাপবাসনা, মানবের ভগবৎ বিমুখতা. কৃষ্ণ নাম ও ভক্তিশূন্য সকল সংসার দর্শন করিয়া শ্রী অদ্বৈত প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ—

"করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্বনয়ন গোচর।
তবে, অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥"

জগতে লোকজনকে হরিভক্তিহীন দর্শন করিয়া নিত্য পরিমল যুক্ত তুলসী মঞ্জুরী, সুরভি কুসুম ও গঙ্গাজল দ্বারা সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন। ঐ হুঙ্কারের ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোলকে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্বাবতার।" অন্তরঙ্গ পার্ষদের আহ্বান ব্যতীত তাহার আবির্ভাব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার বা সদাশিব। তাহারই কাতর প্রার্থনা ও ক্রন্দনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোরাঙ্গ ভাবে অবির্ভাব। "তাহার পিবীতে আইলা ত্বরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ।" এই হেতু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুতে অন্তরঙ্গ শক্তির বিলাস আছে বলিয়া শ্রীগোরাঙ্গের আবির্ভাবের গৌণ অন্তরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে। "যথা শয়ানে আঁছিলা ক্ষীর সাগর ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥ অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই

অবতার। এইমত মহাপ্রভু বোলে বার বার॥ (চৈঃ চঃ অন্তখন্ড) সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সমুদয়—সুমঙ্গল ঐ পূর্ণিমা তিথিতে মিলিত হইল। শ্রীভগবানের ইচ্ছায়ই রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। নদীয়ার সকল লোকগণ চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। "উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি সংকীর্ত্তন।" এই মঙ্গলধ্বনি ভারতের সর্বত্র ও স্বর্গে প্রতিধ্বনিত হইল। স্বর্গের দেবগণ সর্বত্র পুষ্পরাশি বর্ষন করিয়া অনুক্ষণ জয় জয় শব্দে দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন।

হেন সময় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সহিত প্রভুর শুভ জন্ম হইল। যথা—

"পিতামাতা গুরুজনে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণপূর্ণ ইন্দু॥" (চৈঃ চঃ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য বহিরঙ্গ কারণ ঃ

আজানুলম্বিত ভূজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ
বন্দে জগত প্রিয় করৌ করুণাবতারৌ॥

যাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, কনকবৎ কনণীয় কান্তিবিশিষ্ট কমল নয়ন, সংকীর্ত্তনের একমাত্র পিতা, জগতের হিতকারী, আমি সেই করুণার অবতার দ্বয়কে (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে) বন্দনা করি।

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধুপান করি॥

শ্রীব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রচার ও ব্রজপ্রেম দান মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য বহিরঙ্গ কারণ ঃ—

ব্রজের রাগাত্মিকা ভজন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইলা (এ দীনকৃত 'মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে আদর্শ বৈষ্ণব' গ্রন্থে ইহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।)

ভক্তির অনুশীলনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

এই অপার্থিব ভক্তি বস্তুটি ব্যতীত কলিহত জীবের শান্তি লাভের কোন উপায় নাই। "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান"।

সর্ব্বোপাধিবির্নিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(শ্রী নারদ পঞ্চরাত্র)

ইহার ভাবার্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ যথা—

সর্ব্বোপাধি অন্যভিলাষ যতনে ছাড়িব,
জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি নির্ম্মল হইব॥
ইন্দ্রিয় দ্বারায় করে গোবিন্দ সেবন।
ইহাকে অনন্য ভক্তি কহে মুনিগণ॥

এই ভক্তি ত্রিবিধ যথা—(১) সাধনভক্তি-ইনি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা (২) ভাবভক্তি-ইনি মোক্ষলঘুতাকারিণী সুদুর্ল্লভা। (৩) প্রেমভক্তি-ইনি সান্দ্রানন্দ প্রদায়িনী ও কৃষ্ণ আকর্ষণী। এই সাধনভক্তি বৈধীও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। প্রথমটি লোভাধীন না হইয়া শুধু শাস্ত্র-শাসনে হয়। "রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়"। ইহার অনুশীলনে সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন

করেন। আর শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপদর্শনে অথবা শ্রীমৎভাগবৎ শ্রবণে ভজনে যে লোভ তাহাই রাগপদবাচ্য। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী জনের স্বাভাবিকী ভাব ও রাগময়ী কৃষ্ণ ভক্তিই রাগাত্মিকা। এই ব্রজ গোপ-গোপীগণের ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছা অনুগমনকেই রাগানুগা ভক্তি কহে। তমাল তরুকে আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত মাধবীলতার যেমন নিরাশ্রয়তা, ও হৃদয়ের অবসন্নতা দূরীভূত হয় না, সেইরূপ নিরলম্বন জীবও এই মাধবীর মত কোন বীটবীকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে অবলম্বিত হইয়া হৃদয়ের যত অবসাদ, যত গ্লানি বিঘ্ন ও বিসন্নতা দূরীভূত করিয়া এক অখণ্ড আনন্দের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়। যেমন নব বল্লরী মাধবী তরুণ তমালকে জড়াইয়া ধরিতে ভালবাসে, তেমনই মাধবীর অবলম্বন হইবার জন্য তমালের ও একটি অব্যক্ত অভিলাষ নিশ্চয়ই আছে। পরস্পরের এই অবলম্বিত ও অবলম্বন ভাব, উভয়ের মিলনের জন্য যেমন উভয় পক্ষেরই সম প্রয়োজন, সমব্যকুলতা, তদ্রূপ জীব-ঈশ্বরে মিলনের জন্য সেবক ও সেব্যভাবে কোন এক স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ লুক্কায়িত রহিয়াছে—যাহা উভয়েরই সমপ্রয়োজন।

পরমাত্মার পূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মার মিলন মধ্যে উভয় পক্ষেরই যে প্রয়োজনবোধ ও পরস্পরের উৎকণ্ঠার ভাব নিহিত রহিয়াছে—ইহা কেবল প্রেমভক্তি ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম কর্তৃক বিঘোষিত হয় নাই। ইহা কেবল প্রেমভক্তি ধর্মেরই বিজয় বার্তা। শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রেমধর্মই ভক্তিবাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি। শ্রীভগবানের এই যে প্রেমাধীনতা, ভক্তবশ্যতা ইহা প্রেমধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অগোচর। এই যে ভক্ত-ভগবানের প্রাণ বিনিময়ের নিগূঢ় গোপনীয় বার্তা—ইহা জীবের পক্ষে নিরাশার ঘণান্ধকারের মাঝে আশার উজ্জ্বলবর্ত্তিকা। ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই এই প্রীতিরসে গড়াতনু। শ্রীভগবান এই প্রীতিরসের অসমের্দ্ধ আস্বাদক আর ভক্ত প্রীতিরসের অসমোর্দ্ধ পরিবেশক। অনন্ত প্রেমপিপাসু শ্রীভগবানের প্রীতিরস আস্বাদনের চাতুর্য্যের যেমন অনন্ত বৈচিত্র্য, ভক্ত তেমনই

মনের সাধে, অনন্ত পারিপাট্যে শ্রীভগবানের বাসনানুযায়ী তাঁহাকে প্রীতিরস নিবেদন করিয়া বিমুগ্ধ করাইতে সমর্থ। যাঁহার মায়া শক্তিতে অনন্ত জগৎ বিমুগ্ধ, যাঁহার ভগবত্তা শক্তি অন্য নিরপেক্ষ, সেই শ্রীভগবানও ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনে আনন্দিত ও বিমোহিত হইয়া ভক্তের নিকট আত্মবিক্রীত হন। ভক্তও তখন অখণ্ড পরমানন্দে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। সুতরাং "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই শ্রুতি বাক্যের এই স্থানেই চরমসীমায় পর্যাবসান হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! জ্ঞানীগণ যে মুক্তিকে পরিশেষ সাধ্য মনে করেন, ভক্তগণ তাহা সাধন ভক্তির অনুশীলনের আনুসঙ্গিক ফলরূপ অনায়াসে সেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীগোবিন্দের অনন্ত সুন্দর ও মাধুর্য্যময় জ্যোতিপরিমণ্ডিত নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রূপ, গুণ ও লীলাতে আকৃষ্ট হইয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার নিমিত্ত জীবের লালসাময় হৃদয়ের যে আর্তি তাহাই ভক্তি। এই ভক্তিই প্রণয় রজ্জু স্বরূপ, যাহা দ্বারা শ্রীভগবান স্বয়ং বদ্ধ চরণ হইয়া থাকেন।

"ভক্ত মোরে বাঁধিয়াছে হৃদয় কমলে
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা দেখয়ে আমারে
কভু মোর অবয়ব দেখে মনোহর,
কভু মোর হাসি মুখ দেখয়ে সুন্দর॥"

ভক্তি হইতেছেন শ্রীভগবানের রহস্যময় গুহ্য ধর্ম, যাহার অনুশীলনে বা সাধনে জন্ম মৃত্যু সংসার দুঃখ অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ পার্ষদ দেহপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভক্তিরত্ন শ্রীভগবান কাহাকেও দিতে চাহেন না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

শ্রীভগবান সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় দিতে চাহিলেও ভক্তগণ ভগবদ্ সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না। সালোক্যাদি মুক্তি যদি সেবার দ্বার স্বরূপ হয় তবে ভক্ত কদাচিৎ গ্রহণ করেন। আর জ্ঞানীর

সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্ত নরক হইতেও হেয় প্রতিপন্ন করেন। এই ভক্তি অহৈতুকী। কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য লইয়া ভক্ত আপন হৃদয় ভগবানে অর্পণ করেন না। ভগবৎ চরণে শ্রদ্ধা ও নির্গুণা ভক্তি ব্যতীত তাহার কোন প্রার্থনা নাই। ভক্ত কাম জানেন না, ক্রোধাদি জানেন না, স্ত্রীপুত্র বিষয়সম্পত্তি জানেন না। তিনি ধন ও ঐশ্বর্য্য চাহেন না, যশ ও প্রতিষ্ঠা চাহেন না, তিনি জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত হইয়া জাতি কূল, মান, জীবন, যৌবন ভগবদ্ রাতুল চরণে সমর্পণ করিয়া শুধু প্রার্থনা করেন ভগবৎ ভাবনা ও তাহার জগৎ মোহনকারী শ্রী চরণ কমলের দাস্য। লোক শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বকৃত শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভক্তাবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন ঃ—

> "ন ধনং, নজানং, ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতকী ত্বয়ি।
> অয়ি নন্দতনুজ। কিঙ্করং পতিতং সাবিষমে ভবাম্বুঠৌ,
> কৃপয়াতব পাদ-পঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয় ॥"

শ্রী মন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত বিধি মার্গের ভজনই প্রচলিত ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত রাগানুগা সাধন ভক্তির অনুশীলনের ফলেই অচিরাৎ শ্ররাধা কৃষ্ণ যুগল পাদপদ্মে ভক্তি লাভ এবং সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের পুরুষার্থের চরম পরাকাষ্ঠা। এই রাগানুগা সাধন ভক্তি (১) স্বকীয়া ও (২) পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধা। কৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত এই উভয়বিধ ভজনই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধভাবে বিধি ও রাগানুগায়—উভয় মার্গেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বহুবিধ উপায় ও কর্ত্তব্যের বিধান আছে, যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞান যোগ, যোগ সাধন ও ভক্তিরসাধন থাকিলেও ভক্তি সাধন ব্যতীত অন্য কোন সাধনে অর্জ্জিত কৃষ্ণ বশীভূত হন না। তাই তিনি শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন ঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়ন স্তাগো যথা ভক্তি র্মোর্জ্জিতা॥

শ্রীভগবান বলিলেন—"হে উদ্ধব! যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বস্তু তত্ত্ব প্রকাশক সাংখ্য, যোগ, অহিংস ধর্ম্মাচরণ, বেদ পাঠ; তপস্যা সন্ন্যাস প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে লাভ করিতে পারে না। কেবল একমাত্র ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাৎকার ও সেবালাভ হইয়া থাকে।"

শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেনঃ—"ভক্তিহীন সর্ব্বক্রিয়া গর্ব্বয়ৈব ভবতি"—ভক্তিহীন সর্ব্বকর্ম গর্ব্বের নিমিত্ত হইয়া থাকে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেনঃ—

জ্ঞান কর্ম্মে যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস॥ (চৈঃ চঃ)

দেবদুর্ল্লভ এই মনুষ্য দেহের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে শ্রীভগবানের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চরস গ্রহণের সামর্থ্য দিয়াই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বাক, পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ লীলাদি কীর্ত্তন, হস্তদ্বারা শ্রীভগবানের ও তদ্ভক্তের সেবা ও পরিচর্য্যা ও পদ দ্বারা ভগবৎ ক্ষেত্রে ও বৈষ্ণব সম্মিলনে গমন। অপর, অন্তবেন্দ্রিয় মন ও চিত্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ, লীলাদি স্মরণে তথা মানসী সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। শ্রীগুরু ও শাস্ত্র বাক্যের সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা কহে। এই শ্রদ্ধাই কৃষ্ণ পাদ পথের প্রীতির বীজ স্বরূপ। এই বীজ মহৎ কৃপা বা ভক্ত কৃপাতেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যেমন মূল হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশার উদগাম্ হয় ও ক্রমশঃ পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয় তদ্রূপ মহৎ কৃপা লব্ধ শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তির লতার উদয় হইয়া ক্রমে সাধুসঙ্গ সোপান অতিক্রম করিয়া ভজন ক্রিয়া রূপ স্তরে আরূঢ় হইলে তাহা হইতে সাধনাঙ্গ রূপ গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন প্রভৃতি চতুর্ষষ্টি (৬৪) শাখা সাধনাঙ্গ দ্বারা এই ভক্তিলতা পারপুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা হইয়া যথা সময়ে অনর্থ নিবৃত্তি, তাহার পর,

নিষ্ঠা, তারপর রুচি ও আসক্তি স্তরে আরূঢ়া হইলে এই ভক্তিলতা হইতে প্রস্ফুটিত সুরভি পুষ্পের উদয় হয়, উহাই ভাব ভক্তি এবং ঐ: পুষ্প হইতে যে মহাফলের আবির্ভাব হয় তাহাই প্রেম ভক্তি।

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হৈয়া করে সেই বীজ আরোপন।
শ্রবণ কীর্ত্তন জল করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মালোক ভেদি পর ব্যোম পায়॥
তবে যায় ততুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহন॥" (চৈঃ চঃ)

নববিধাভক্তি বা নব লক্ষণা ভক্তি ঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং অত্মনিবেদনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ লীলাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন, নাম, রূপগুণ লীলাদির স্মরণ, শ্রীবিগ্রহের পাদ সেবা, পূজা, নমস্কার দাস্যাভিমান, দেহাদি সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নিবেদন—ইহাই সাধন ভক্তির নব লক্ষণ। আবার গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি চৌষট্টি সাধনাঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভক্তির অঙ্গ ও সাধনাঙ্গ উভয়েরই সমভাবে অনুশীলন বিধেয়। ভক্তি দেবী শ্রীহরির স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বলিয়া নিখিল মায়া শক্তির বৃত্তিগুলিকে সাধকের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে ধ্বংস করিয়া ভক্তের চক্ষু কর্ণাদি প্রাকৃত —ইন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূতা হন।

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।"
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)

ভজনক্রিয়া হইতে ভাবভক্তি প্রাপ্ত অবস্থাকে সাধক অবস্থা বলা

হইয়া থাকে। এই অবস্থায় (১) বৈষ্ণব সদাচার সমূহের পালন, (২) শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন। (৩) মনে নিজ সিদ্ধ মঞ্জুরী দেহ ভাবনা করতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির স্মরণ-মনন করিয়া থাকেন। প্রবল বিরহোৎকণ্ঠার সহিত এই ভজন সাধন করিতে করিতে কালক্রমে এ সাধন পরিপক্ক হইয়া সাধক হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। নিখিল ক্লেশ, লেশ বর্জ্জিত, নিত্যকৃষ্ণক্রিয়াশীল ও নিরবচ্ছিন্ন প্রেমসুখাস্বাদক সজ্জনই 'সিদ্ধ'।

ভক্ত এখন শ্রীভগবানের নিত্যদাস, আর কাহারও নহেন। অর্ঘ সিদ্ধি ও মুক্তিরূপ মাকাল ফল তাহার সম্মুখ দিয়া তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। এমনকি ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ, ভগবদ ধামের প্রাপ্তির বাঞ্ছা ও তাহার কৃষ্ণচিন্তাময় একাগ্র হৃদয়ের নিকটে দাঁড়াইতে পারেনা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ জ্বালা প্রভৃতি আপনা হইতেই পলায়ন করে। ভক্ত স্ত্রী-পুত্র, বিষয়াদি, যশ, লোভ, প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ ভক্তির বিশেষ প্রতিকূল বলিয়া উহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপাদ পদ্মে সমর্পণ করেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, যাহার জন্য স্বয়ং শ্রীগোপী-নাথ ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার সুযশ প্রচার হওয়ার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়া ছিলেন। "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাইয়া।"

চিৎকণজীব নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই স্বরূপ ভ্রম হওয়াতে মায়া তাহার কিৎকণ স্বরূপ আবরণ পূর্বক মায়িক দেহান্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করাইয়াছেন এবং তৎপ্রভাবে জীব জরা, মৃত্যু, শোক দুঃখাদি সংসার স্রোতে আবহমান কাল হইতে ভাসিতেছে। কুহকিনী মায়া আত্মাকারে গঠিত মনকে জীবের নিকট স্থাপন করিয়াছেন। ব্যাধ যদ্রুপ শিকারী পাখীর দ্বারা বনের পাখী অবরুদ্ধ করে, মায়াও তদ্রুপ মনরূপ শিকারী পাখীদ্বারা জীবরূপ বনের পাখীকে সংসার পিঞ্জরে বন্দী করিয়াছে। এই মায়া যাহার তাহাকে ভজন করিলেই এই মায়ার গোলক ধাঁধা

হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন :—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব কে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।

(শ্রীভগবদ গীতা)

হে অর্জ্জুন! ত্রিগুণময়ী মায়া আমারই অলৌকিকী শক্তি, ইহা জীবের পক্ষে দুরতিক্রমনীয়া। যাহারা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তাহারাই কেবল মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। সাধন ভক্তির নবধা অঙ্গের অনুশীলনে ভক্তি দেবীর কৃপাতেই এই দুরত্যয়া মায়া হইতে ভক্ত পরিত্রাণ পায়।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপ্রেম চিরকাল দান করেন নাই বলিয়া জীবও তাহা পায় নাই। আবার করুণা শক্তির বিকাশ বশতঃই শ্রীহরি "করুণয়া" অবতীর্ণ কলৌ। সেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কল্প করিলেন—"চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন"। শ্রীমদ্ভাগবতে রাগানুগা কথনে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"দেশকালাদিতে অপরিছন্ন সচ্চিদানন্দ রূপ যে আমি, যাহারা সেই আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া কেবল অনন্যভাবে শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন বা যশোদা নন্দন আলম্বনে নিজ রুচি অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যে যে কোন একটা ভাবে আমাকে ভজন করিতেছে, আমি তাহাদিগকে ভক্ততম বলিয়া মনে করি। যতদিন দাস্যাদি কোন একটি ভাবের সহিত আমাকে ভজন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই ভাবহীন বা সম্বন্ধ হীন ভজনে আমার চিত্ত বিগলিত হয়না। যাহারা কেবলমাত্র সম্বন্ধ অবলম্বনে ভজন করে অর্থাৎ "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোর করে শুদ্ধ রতি॥"—সেই সম্বন্ধযুক্ত ভজনে আমার চিত্ত বিগলিত হয়। ঐশ্বর্য জ্ঞান মিশ্রিত ভাব হইতে সম্বন্ধযুক্ত ভাবের গৌরব অধিক "ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীতি"।

"গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় শ্রীনন্দ নন্দনে॥" চৈঃ চঃ

এই অভিপ্রায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে যোগেশ্বরগণ ও শ্রীহরিকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—"হে প্রভো! যে ভক্ত স্বামী-ভৃত্য ভাবে তোমাকে ভজন করেন, বিশ্বাত্মা পরমব্রহ্মা তোমাকে নিজ হইতে পৃথক দৃষ্টি করেনা অর্থাৎ তোমাকে পর ভাবিয়া দূরে সরাইয়া রাখেনা, কিন্তু নিজ প্রভু বুদ্ধিতে নিজ জন বলিয়া মনে করেন, সেই ভক্ত হইতে তোমার অন্য কেহ প্রিয় নাই।" শান্তরতিতে পণ্ডিতগণ অসাধারণ উদ্দীপন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ব্রজে এই শান্তভাবের স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব নাই। এই রাগানুগা সাধন ভক্তি (১) স্বকীয়া (২) পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। কৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত এই উভয় বিধ ভজনই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবে বিধি ও রাগানুগায় উভয় মার্গেই হইয়া থাকে।

অথ দাস্যরস:—শ্রীনন্দ নন্দনের সহিত প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে অভিমান আশ্রয় অবলম্বন—শ্রীরক্তক পত্রক, মধুব্রত, সুবিনাস, প্রেমমন্দ—আনন্দ, চলহা প্রভৃতি ব্রজের অনুগ। তাহাদের মধ্যে রক্তকই বর্ধীয়ানা তাহারা নিজ প্রভু বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন বলিয়া মনে করেন এবং পৃথক বুদ্ধিতে দূরে সরাইয়া রাখেনা। এই মদীরতা ভাবই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিগলিত করাইয়া সেবা করিয়া থাকেন।

"পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।"

অথ সখ্য রস:—এই রসের বিষয় অবলম্বন রাখালরাজ ব্রজ দুলাল আশ্রয় অবলম্বন—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ। উহারা চারি প্রকার। যথা—(১) সুহৃদ (২) সখা (৩) প্রিয় সখা ও (৪) প্রিয় নর্ম্ম সখা। (৫) সুহৃদগণের বাৎসল্য গন্ধযুক্ত সখ্য, ইহাদের বয়স কৃষ্ণাপেক্ষা কিছু অধিক। তাহারা অস্ত্রধারী, কোন অমঙ্গল হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সদা প্রস্তুত। শ্রীবলরাম, সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, বিজয় প্রভৃতি, তাহারা বনের ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গ ও অন্যান্য শত্রু হইতে শ্রীকৃষ্ণের কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে নয়নের আড়াল হইতে দেননা, ক্ষুধায় কাতর দেখিলে বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখাল

রাজাকে প্রদান করেন। (২) সখা :—যাহারা কনিষ্ঠকল্প দাসগন্ধি সখ্যরসিক—তাহারই সখা। দেবপ্রস্থ, বিশাল বৃষভ, বরসর্প, মনিবন্ধ প্রভৃতি। তিলক রচনা, চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য শ্রীঅঙ্গে বিলেপণ, পদ্মিনী-দল দ্বারা বীজনাদি ইহাদের ক্রিয়া। (৩) প্রিয় সখা :—যাহারা সমবয়সী ও কেবল শুদ্ধ সখ্য রসাশ্রয়ী তাহারাই প্রিয় সখা। শ্রীদাম, সুবল, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ, ভদ্রসেন, বিলাসী প্রভৃতি। এর মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ। এই সখ্য রসে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর জ্ঞানহীন, সমতা ও মমতা বুদ্ধি অধিক।

"মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
এতএব সখ্য রসের বশ ভগবান॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে নবনীতাদি কাঁড়িয়া গ্রহণ করা, সকলে মিলিয়া গোপীগৃহে নবনীত, দধি চুরি প্রভৃতি ক্রিয়া করেন। (৪) প্রিয় নর্ম্ম সখা :—ইহারা বিশিষ্ট ভাবযুক্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা সখিভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে প্রেমের আদান প্রদানরূপ গুপ্তকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। সুবল, উজ্জ্বল, গন্ধর্ব, বসন্ত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গোষ্ঠলীলা কৌমার ও পৌগণ্ড বয়সেই চলিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব মিশ্রিত নব যৌবন বা নবকিশোর মুর্ত্তিই প্রায় সর্বভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার বাল্যসখা শ্রীদাম সুবলাদির সহিত নিত্য ধেনু চড়াইতে গোষ্ঠে যাত্রা করেন এবং উত্তর গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই গোষ্ঠলীলায় আমরা ব্রজ উপাসনার পঞ্চরসই দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর পদ পরিবেশিত হইল। যথা—

"যায়পদ রহিয়ে রহিয়ে গো,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি [illegible]
পদ [illegible] [illegible] যায় ।
[illegible] রহিয়ে রহিয়ে গো ।
শ্রীদাম টানে বন পানে রাণী টানে ঘর পানে
রাইটানে নয়নে নয়নে গো ॥ ইত্যাদি ।

অথ বাৎসল্য রস ঃ—এই রসের বিষয় অবলম্বন—নীলপদ্ম সমূহের মালার ন্যায় স্নিগ্ধ, শ্যামল কোমলাঙ্গ গোপাল। আশ্রয় অবলম্বন—ব্রজেশ্বরী ও ব্রজরাজ শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত রোহিণী দেবী, দেবকী ও তাহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দিপনি প্রভৃতি গুরুজন। "আমার গোপাল, আমার পুত্র আমার নীলমণি বলিয়া পিতা নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোমতী ঈশ্বর বুদ্ধিহীন আত্মজ আবেশে প্রচুরতর অনুগ্রহ সমাযুক্ত চিত্তে পালক ও লালক বুদ্ধিতে কৃপাযুক্ত হৃদয়ে, অতি হেয় জ্ঞানে কৃষ্ণকে লালন পালন করিয়া থাকেন। অহো! যিনি পরম ব্রহ্মের ও অনুগ্রাহক তত্ত্ব, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে পুত্র বুদ্ধিতে অধিকমন্য ভাবে যাহারা কৃপাকৃত হইয়া অনুগ্রহ বশতঃ পাল্য ও পালক সম্বন্ধে গোপালকে লালন, পালন, তাড়ন ভৎর্সন করিতেছেন সেই মহারাজ নন্দ ও মাতা যশোমতীকে নমস্কার করিতেছি। যদি মা যশোদা তাঁহার বাৎসল্যময়ী জননী না হইবেন, তবে দধিমন্থন গাগরী ফোটম অপরাধে তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিলেন। সেই বন্ধনে গোপালের মুখখানি মলিন হওয়াতে পিতা নন্দ মহারাজ অশ্রুসিক্ত হইয়া বন্ধন খুলিয়া দিলে প্রাণের গোপাল যে মধুর হাসি হাসিয়াছিল তাহাতে পিতা-মাতার প্রাণ আনন্দে ভরিয়াছিল। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ভক্তিহীন জনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি ভক্তের ঘরেই যান ও ভক্তই তাহার পিতামাতা, ভক্তই সুহৃদ, সখা। শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজরাজের কৃষ্ণ বিরহ বেদনা অপনোদনের জন্য 'পরমাত্মা অন্তর্য্যামী প্রভৃতি উপদেশ করিলে ব্রজরাজ বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে এমন কাহারও সাধ্য নাই যে আমার রামকৃষ্ণের প্রতি পুত্র বুদ্ধি বিন্দুমাত্র শিথিল করিতে পারে।" বরং

শ্রীউদ্ধবই 'বালবুদ্ধি' বলিয়া অভিহিত হইলেন। মা যশোদা বাৎসল্যের সজীব মূর্ত্তি। মাতা যশোমতী শিখিপুচ্ছ চূড়া, অলকা তিলকা লাঞ্ছিত বদন গোপালকে বক্ষে ধারণ করিয়া, দণ্ডে শতবার চুম্বন করিয়া, আবার নাচাইতে নাচাইতে তাহার শ্রীমুখে ক্ষীর, সর নবনী তুলিয়া দিতেছেন, মা যশোদার করুণা ছলছল আঁখি বর্ষার বারিধারা সদৃশ ; স্তন হইতে মধুর ক্ষীরধারা বর্ষন প্রভৃতি বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি বৈষ্ণব সাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁহার এই মাতৃমূর্তি যেন ত্রিভুবনের চির স্নেহময়ী, কল্যাণদায়িনী মাতৃত্বের আদর্শ মূর্তি। প্রাণ কানুকে গোষ্ঠে প্রেরণ করিয়া মায়ের মনে সোয়াস্তি নাই। গোধুলী লগ্নে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মা নন্দরাণী—

"কোলেতে লইয়া নন্দের দুলাল
বদন চুম্বন রসে।
কত শত শত অমিয় পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে॥
এতক্ষন কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ বড় গৃহমাঝে ছিল
পরান তোমার সনে॥" ইত্যাদি

গোপালকে সাজাইয়া দিয়া, দণ্ডে শতবার চুম্বন করিয়া, ক্ষীর সর ননী ভোজন করাইয়া, সতত নয়নে নয়নে রাখিয়াও যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। বাৎসল্য রস যেন নব-নবায়ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। মা যশোদা আমাদের নিকট পুত্র প্রাণা, বাৎসল্যময়ী মুগ্ধা জননীরূপেই আমাদের মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে অহো! মুনি ঋষিগণ যাঁহার কণামাত্র কৃপালাভের আশায় শত সহস্র বর্ষ, অনাহারে, অস্থিচর্মসার বিশিষ্ট দেহে কঠোর তপস্যা করিয়া প্রাপ্ত হন না ; দেবাদিদেব মহাদেব যাঁহার দর্শন লালসায় শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করেন, মা যশোদা কিনা তাহাকে পুত্রজ্ঞানে কোলে করিয়া স্তন পান করাইতেছেন! যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৩৬)

নন্দ কিম করোদ্ ব্রহ্মণ শ্রেয়ঃ এব মহোদয়ম।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ হ্য স্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামী পাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ব্রহ্মণ! নন্দ এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিলেন এবং মহাভাগা যশোদাই এমন কি পুণ্য কার্য্য করিয়াছিলেন যে ভগবান শ্রীহরি তাহার স্তন পান করিলেন।

বাৎসল্য রসের এই সংকোচহীন, গৌরবহীন, ঈশ্বর বুদ্ধিহীন পাল্যজ্ঞান ও মমতাধিক্য ভাব বর্তমান থাকায় শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হইয়া তিনি ভক্তাধীন হইয়া যান। তিনি সম্বন্ধ বিহীন ঈশ্বর বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট নন। ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের সাধনে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া সাধক ও ভগবানের সম্বন্ধ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। যথা—

ঐশ্চর্য্য ও জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥" চৈঃ চঃ

শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভয়ে ত্রস্ত্য হইয়া অর্জ্জুন 'সম্বর, সম্বর' রূপ বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কৃষ্ণ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে, ভয়ে ও সংকোচে অর্জ্জুনের সখ্য প্রেম সঙ্কুচিত হইয়াছিল। আবার সম্বন্ধযুক্ত সখ্য রসে অর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। ব্রজে সংকোচহীন সখ্যরসে তিনি শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং মনুষ্য হইয়া মনুষ্যলিঙ্গ গূঢ় পরমব্রহ্ম দ্বিভূজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধযুক্ত ভজন করাই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে জানে। যথা—

"যে জন মানুষ সে জানে মানুষ,
মানুষে মানুষ চিনে।" (চণ্ডীদাস)

এই স্বাভাবিক বৃত্তির সঙ্কোচহীন ভজনই ভগবৎ হৃদয় আর্দ্র হইয়া

ভক্তের পক্ষপাতী হইয়া যান। আবার, ভক্ত যদি নিজেকে অধিক হীন মনে করেন, তাহাতে শ্রীভগবান ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, বটে ; কিন্তু ভক্তের অধীন হন না। শ্রীল ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী গোপালকে পাল্য ও হেয় জ্ঞানে আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাদের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদের চর্ব্বিত তাম্বুলাদি গ্রহণ করিতেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

আপনারে বড় মানে আমাকে সমহীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালনপালন ॥”

সখ্য ও বাৎসল্যরসে অনুরাগ পর্য্যন্ত হয়, সুবলাদির ভাব পর্য্যন্ত হয়।

অথ মধুর ভক্তি রস :—

শাস্ত্রে এই রসকে মধুর রস, আদিরস, শুচিরস, উজ্জ্বলরস ও শৃঙ্গার রস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তিকে শ্রীলশুকমুনি “পীতাম্বর স্রগ্বী সাক্ষান্মনমন্মথ” অর্থাৎ সাক্ষাৎ মদনমোহন মূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহার মধুর রূপ দর্শনে ‘পুরুষ যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম’ মোহিত হইয়া যায়, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সেই অপ্রাকৃত নবীন মদন, শৃঙ্গার রসমূর্ত্তি রসিকেন্দ্র :চূড়ামণি শ্রীনন্দ নন্দন এই মধুর রসের বিষয় আলম্বন।

যে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাহাদের দেহ, গেহ, ইহকাল-পরকাল, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানস সুখ, আত্মসুখ, বেদ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আর্যপথ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় অনুরাগের আবেশে প্রাণকোটী প্রিয়তমও রমণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন সেই কৃষ্ণ প্রেয়সী ব্রজ গোপীগণই এই মধুর রসের আশ্রয় অলম্বন। এই মধুর রস স্বকীয়া ও পরকীয় ভাবে দ্বিবিধ। এই উভয়বিধ লীলাই নিত্য, শ্রীগোলক, বৈকুণ্ঠ, দ্বারকাই ধামের লীলা স্বকীয়া, একমাত্র ব্রজধামের লীলাই পরকীয়া, দ্বারকাধামে রুক্মিনী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের

মহিষীগণ স্বকীয়া নায়িকা, শ্রীব্রজে শ্রীরাধা, ললিতাবিশাখাদি ব্রজদেবীগণ পরকীয়া নায়িকা। ব্রজাঙ্গনাগণ করবিধি অনুসারে পত্নী নহেন, গাঢ় অনুরাগের আবেশে কৃষ্ণবধূ, উপপতিভাবা ভ্রষ্টা স্ত্রীর চক্ষে যেমন উপপতির অসংখ্য দোষ থাকিলেও তাহা লক্ষিত হয় না, শ্রীভগবানের সহিত সেইরূপ প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়ার নাম কান্তা প্রেম। পতিব্রতা সতীর চক্ষে পতির দোষও দেখা সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু উপপত্নীর চক্ষে সহস্র দোষ থাকিলেও গুণব্যতীত কিছুই পরিলক্ষিত হয় না এবং গাঢ় ভাবের আকর্ষণে সর্বদা উপপতির ভাবনা করিয়াই সুখ পায়। যোগাবিশিষ্ট রামায়ণ দ্রষ্টব্য। এই হেতু ব্রজাঙ্গনাগণ নিজ নিজ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিলেও তাঁহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন পরমপুরুষ (পর পুরুষ নয়) শ্রীকৃষ্ণের পছার বিন্দেই অনুক্ষণ অবস্থিত থাকিত। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাণ, জীবন-যৌবন প্রাণকোটী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁহারা পতিপুত্র, পিতামাতা, স্বজন বান্ধবাদি ত্যাগ করিয়াছেন। প্রিয় প্রাণ হইতেও নিরুপাধি প্রীত্যম্পদ পরমাত্মা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানেন। তাঁহারা কখনও দেহাভিমানী আত্মাকে আত্মা বলিয়া জানেন না। সৃষ্টির অন্তর্গত ভাব স্থূল ও সৃষ্টির বহির্গত ভাব সূক্ষ্ম শ্রীব্রজদেবীগণের ভাব সৃষ্টির অন্তর্গত ছিল না। প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত ভাবের উদয় হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত দেহের কার্য অন্যরূপ। উহা কেবল চৈতন্যময় পরমাত্মার ভাবে বিভাবিত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করে। এই গোপীগণ আনন্দ চিন্ময় রসপ্রতিভাবিতা। পতি-পুত্রাদির এই দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; দেহাবসানানে যখন তাহাদের সহিত সম্বন্ধ চিরকালের জন্যই বিচ্যুত হইবে, "তখন এই মরণশীল স্বজনদিগকে উপেক্ষা করিয়া পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত চির সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়"—এইরূপ সঙ্কল্পাত্মক মন লইয়াই ব্রজদেবীগণ নিশীথকালে, নির্জ্জন বৃন্দারণ্যে, গাঢ় অনুরাগের আবেশে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইতেন। পতি ও স্বজনের তাড়না-ভর্ৎসনা উপেক্ষা করিয়া, জাতি-কুল-মান, লজ্জা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া গোপীগণ

ব্যকুলিত প্রাণে, উদ্দাম গতিতে পরম-পতির সহিত মিলিতা হইতেন। এই পরকীয় মধুর ভাব ভিন্ন দাস্য-বাৎসল্যাদিতে এও অনুরাগের পরকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। মর্যাদা প্রাপ্তা কুলবধূগণের পক্ষে অতি দুস্তর ধর্ম্মবাধা অতিক্রম করাতেই অনুরাগের পরাবধিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে মধুর বা উজ্জ্বল রসের উজ্জ্বলতা ও পরমোৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ভরতমুনি ইহাকে পরমারতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রাগের লক্ষণে বলা হইয়াছে—"প্রণয়ের উৎকৃষ্ট অবস্থায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় অতিশয় দুঃখচিত্তে সুখ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার কৃষ্ণ প্রাপ্তির অসম্ভাবনায় অতিশয় সুখও দুঃখধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। রসিক পণ্ডিতগণ ইহাকে 'রাগ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। লজ্জা ত্যাগ ও পাতিব্রত্য ধ্বংস করলেই প্রাণকোটী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিব - এইরূপ আকুল পিপাসার আবেগে পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয়সূত্রে চির সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া, অতি দুঃখকেও পরমসুখ বলিয়া প্রতিপন্ন করায় বলিয়া এখানে রাগের ইয়ত্তার পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদিত হইতেছে। গাঢ় প্রীতিময় তৃষ্ণার আবেগে এই বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম স্বজনাদি ত্যাগ হইয়াছে বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে এই অনুরাগের এত গৌরব, কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনরূপ আকুল পিপাসা যেমন সর্ব্ববেদ দুর্ল্লভ, শ্রীসত্রজদেবীগণের কৃষ্ণ-প্রাপ্তিও সর্ব্বোত্তম। যথা—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ চঃ)

যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন ; যাঁহারা কৃষ্ণের ক্ষণিক অদর্শন কোটীকল্প মনে করিয়া তরিতাহত-বৎ হইয়া থাকেন এবং কৃষ্ণরূপ দর্শন সময়ে নেত্রের যে নিমেষ পতিত হয়, তাহা সহিতে না পারিয়া নেত্রের পক্ষ কর্ত্তা বিধাতাকে যোগ্য সৃজন জানে না বলিয়া "জড়তাসাধন" বলিয়া কত অভিসম্পাত করেন, যাহারা কৃষ্ণের বুকের উপর মুখখানা রাখিয়াও অনুরাগের চরম লক্ষণ প্রেমবৈচিত্ত্যভাবে বিরহে উন্মত্তা হইয়া কত দৈন্য, কত বিলাপ করিয়া থাকেন, তাহাদের

অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণানুরাগী এই জগতীতলে আর কেহ নাই। ইহাতে শৃঙ্গার রসের পরম উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রজবিলাসে এই পরকীয়া পরমারতির পরম উৎকর্ষতাই শ্রীরাধার মহাভাব। ব্রজ ভিন্ন এই পরকীয়া রতির প্রকাশ অন্য ধামে নাই। যথা—

"এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজবিনা ইহা না জানে অন্য॥"—চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুই প্রকার—ব্রজ লীলা ও পুর লীলা। মথুরায় লীলা প্রকটাবতারে হইয়া থাকে। অপ্রকাশ হয় না বলিয়া উহা নিত্য লীলা নহে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসমূর্ত্তিকে, সে অন্তরঙ্গা লীলা করেন, উহা গৌনী অন্তরঙ্গা. ইহা দ্বারকার নিত্য লীলা। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অর্থাৎ অন্য কোন জয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া গোপেন্দ্র নন্দনরূপে যে অন্তরঙ্গ লীলা করেন, উহা মুখ্যা অন্তরঙ্গা উহাই ব্রজের নিত্যলীলা। শ্রীব্রজ ও দ্বারকাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা ধাম, লীলার সহায়কারিনী পৌর্ণমাসী যোগমায়া ব্রজদেবীগণের নিজপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিভাবে ও নিত্যকান্তাগণকে পরবধূরূপে প্রতীতি করাইয়া সর্ব্বোত্তম নরলীলা সম্পাদন করেন। রসময় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে গোলক ও গোকুল উদ্ধার সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া সপরিবারে অবতরন করিলেন। পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মোহনাখ্য মহাভাবে দিব্যোন্মাদ দশা পর্যন্ত এই লীলা পরিপূর্ণভাবে অনুদিত হয়। শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখাদি অষ্ট সখি, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা শ্যামা, ভদ্রা গোপালী, সধুনক্ষি প্রভৃতি ব্রজ গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী যুথেশ্বরীর মধ্যে শ্রেষ্টা। ললিতা, বিশাখা, পদ্মা. শৈব্যা যুথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও তাহারা সখি ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা বা প্রধানা গোপীকা সর্ব্বোত্তমা যথা—

সেই গোপীগণের মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপগুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥ (চৈঃ চঃ)

এই মধুর রসের প্রেম ক্রমোবর্দ্ধিত ভাবে স্নেহ, মান, প্রনয়, রাগ

অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরে মহিষীগণের রূঢ় ভাব, আর ব্রজ গোপীগণের অধিরূঢ় মহাভাব। কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্তই এই মহাভাবের নিখিল চেষ্টা কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বা নিজেন্দ্রিয় তর্পনের জন্য নহে। এই অধিরূঢ় মহাভাবটি শ্রীরাধার মুখেই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, তন্মধ্যে রাধারাণীই ভাবের অবধি। যথা—

"প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।

সেই মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী॥" চৈঃ চঃ এই মহাভাবের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীউজ্বল নীলমণি গ্রন্থে - বলিতেছেন :—

অনুরাগ স্বসম্বেদত্তশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।

যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেম্ভাব ইত্যভিধীখতে॥

অর্থাৎ রাগ যতটা পরিমানে উদয় হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে ততটা পরিমাণে উদয় হইলে তাহার নাম অনুরাগের আশ্রয় বৃত্তি, ঐ যাবদাশ্রয় বৃত্তি যদি স্বয়ং (বেদ) দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রসিক ভক্তগণ তাহাকে মহাভাব বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থির সম্ভাবনার অতিশয় দুঃখও যদি সুখধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় অতিশয় সুখ ও দুঃখ ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় তাহাকে রাগ কহে। কুলবধুগণের লজ্জাত্যাগ. কুলধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ও দুস্ত্যাজ্য আর্য্যাপথ ত্যাগ অত্যন্ত দুঃখদায়ী হইলেও কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনায়, উহা সুখরূপে প্রতিভাত হইয়া রাগের ইয়ত্তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমময়ী তৃষ্ণার আকুল আগ্রহে সেই রাগের উপরে উদিত অনুরাগই স্বয়ংবেদ্য দশা হইয়া মহাভাব সংজ্ঞা লাভ করে। এই অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন দুইটা ভেদ আছে। যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাব সমূহের উদয় হয় তাহার নাম - মোদন। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে এই সাত্ত্বিক বিকার সমভাবে অভিব্যক্ত হয়। ভক্তি রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই সাত্ত্বিক বিকারের পাঁচটা অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—ধূমায়িত জ্বলিত, দীপ্ত, ও সুদীপ্ত। এই মোদনখ্য মহাভাবই সুদীর্ঘ বিরহে মোহনাখ্য মহাভাব

হইয়া থাকে। শ্রীউজ্জ্বলে—এই মোহনাখ্য মহাভাবের ছয়টা অনুভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ অনুভাববী দিব্যোন্মাদ। এই মোহনাখ্য মহাভাবের কোনও এক অদ্ভুত বিচিত্রা অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অন্য পদার্থ দর্শন করেন, এক শুনিতে অন্যকথা শ্রবণ করেন, এক বলিতে অন্য কথা বলেন, এক ভাবিতে অন্য ভাবনা করেন ইত্যাদি। শ্রীরাধারাণীর মোদনাখ্য মহাভাবে সুদীর্ঘ বিবহাবস্তায় সাত্ত্বিক বিকার সমূহ সুদীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মোহনাখ্য সংজ্ঞা লাভ করে। আবার মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র রাধারাণীতেই বিরাজমান। ইহা শ্রীকৃষ্ণেব বাঞ্ছাত্রয়ের ভিতরে বণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের প্রেমসেবায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পিতামাতা, ভ্রাতা, সখা, সখি, প্রেয়সী প্রভৃতি সম্বোধন দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এবং ব্রজবাসীগণের মনোরঞ্জনের জন্য কখনও বা গোচারণ, কখনও বা শিরোদেশে পাদুকা গ্রহন, কখনও বা রাখালগণকে স্কন্ধে ধারণ, কখনও বা যশোমতীর পদধারণ, কখনও বা সখাগণ সঙ্গে নবনীত চুরি প্রভৃতি অশেষ প্রকার লীলা দ্বারা আপনাকে ধন্য মনে করিতেন বৃন্দাবন চন্দ্রের বৃন্দাবন লীলা রস আস্বাদনকারী ভক্ত বিনা এই প্রেমের মধুরিমা কেহই অবগত নহেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ও মহাদেব এমনকি তাঁহার অঙ্গ-সংশ্রিতা লক্ষ্মীদেবীও তাহা পান নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ মাধুর্য্যাদির আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তপদ হইতে শ্রেষ্ঠ শুভপদ আর ত্রিজগতে নাই। অন্যের কি কথা রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। মধুর রসে পুরে রূঢ় ভাব ও ব্রজে অধিরূঢ় মহাভাব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন দাস-কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি॥

শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের গৌন বহিরঙ্গ কারণ :—

যুগধর্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচার ও করুণার অবতার রূপে দীন, হীন, পতিত. পাষণ্ড গণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা।—

এতৎসহ 'শ্রীচৈতন্য চরিত সুধা' এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

আজানুলম্বিত ভূজৌ কণকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়-তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয় করৌ করুণাবতারৌ॥

যাহার আজানুলম্বিত বাহু কনকবৎ, কমণীয়-কান্তি বিশিষ্ট, কমল নয়ন, সংকীর্ত্তনের একমাত্র পিতা, জগতের হিতকারী, আমি সেই করুণার অবতার দ্বয়কে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি।

এস্থলে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন, নামের সহিত প্রেমদান ও জীবোদ্ধারন সম্বন্ধে বর্ণিত হইংছে। শ্রীচৈতন্য লীলায় বেদব্যাস, মহাভাগবত ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের ও ধন্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের পদধূলি শিরোভূষণ করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিত-সুধা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিতে হৃদয়ে আকুল আগ্রহ জাগিতেছে।

বৃন্দাবন দাস-কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধুপান করি॥

যিনি পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দেহকান্তি, যোগীগণ যাহাকে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই এই কৃষ্ণ চৈতন্যের বিভূতি, তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণসর্ব্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্র কয় ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল্য অবতার ॥" চৈঃ চঃ
"নন্দসুত বলি যাঁরে, ভাগবতে গাই ।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥" চৈঃ চঃ

দেব হলায়ুধ বলদেব এই চৈতন্যাবতারে প্রভু নিত্যানন্দ রূপে মিলিত হইয়াছেন। পাষণ্ডদলন পুর্ব্বক ভক্তিদান করায় প্রভু নিত্যানন্দ হলায়ুধ শব্দে খ্যাত। তিনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ বা কলেবর। বিশ্ববন্ধু প্রেমপ্রদ ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণু বা সদাশিব অবতার রূপে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু এক আর দুই প্রভু-নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দেবর্ষি নারদ শ্রীবাসরূপে অবতরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহালক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও গদাধর পণ্ডিত আবির্ভূভ হইয়াছিলেন। কিম্বা শ্রীরাধা বৃন্দাবনে যেমন নানাপ্রকার ভেদে বহু গোপীকা মূর্ত্তিতে বিলাস করিতেছেন; শ্রীগৌর অবতারেও তিনি একপ্রকার শ্রীচৈতন্য হইতে অভিন্না থাকিয়াও প্রকারান্তরে গদাধর পণ্ডিতরূপ ধারণ করিয়াছেন। আবার একপ্রকাশে তিনি গদাধর দাসরূপেও রহিয়াছেন। যেমন স্বয়ং ভগবান প্রকাশ ভেদে বহুরূপে অবতীর্ণ হন, তাহার হ্লাদিনী-শক্তিরূপা শ্রীরাধার অবতারও সেইভাবে জানিতে হইবে। যাদবগণও বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সুন্দর যথাক্রমে যশোদা ও নন্দমহারাজার প্রকাশভূত। সকল ব্রজবাসিগণ, ব্রজ রাখালগণ, দাসগণ, সখা সখিগণ, সহচরী সহ সমস্ত গোপীগণ, যোগমায়া এবং বনদেবীগণ সকলেই প্রকাশ ভেদে প্রকটে অবতরণ করিয়াছিলেন। ভগবৎ শক্তি একই রূপ, একই সময়ে অনেক অনেক স্থানে প্রকট হন তাহাকে প্রকাশ বলা হয়। সুতরাং চৈতন্যপার্ষদগণ নিত্যসিদ্ধ। "শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ যদি মানে, সে যায়রে ব্রজেন্দ্র সুত পানে।"

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের রঙ্গে,
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন সঙ্গে ॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তার বিবিধ বিভেদ ॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। তাঁহার শুভাবির্ভাবের বার্তা শ্রবণে শচী মাতার পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আগমন করিয়া জন্মলগ্ন বিচার করতঃ বলিতে লাগিলেন—"ইহার জন্মের প্রতিলগ্নে অদ্ভুত রহস্য বিদ্যমান। গণনায় মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষের ভূষণ, তাহা সকলই এই শিশুর অঙ্গে দেখিতে পাইতেছি। "বিপ্ররাজ্যে গৌড়ের রাজা হইবেক"—বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ আছে। তথায় এক জ্যোতির্বিদ বাধা দিয়া বলিলেন—(রাজা হেন বাক্যে)—এই শিশুর পরিচয় হয় না। তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি হইতেও বিদ্বান ও সর্ব্বগুণের আধার হইবেন। তথায় এক মহাজ্যোতির্বিদ ও মহাজন ব্যক্তি কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিলেন—"এই শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া, ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সর্ব্বজগতকে উদ্ধার করিবেন। ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদাদি যাহা অনুক্ষণ বাঞ্ছা করেন, সেই প্রেমধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বজগতের প্রীতি ও হিত করিবেন। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী ও দয়ালু ও করুণার অবতার ও ভক্তিমান হইবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে বলিলেন—"তুমি এ হেন পুত্রের পিতা, তোমাকে কোটী প্রণাম।" যথা চৈঃ ভাগবতে—

"হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান্ ॥"

বিশ্বম্ভর নামকরণ হইল—১৪০৭ শকাব্দ ১২ই চৈত্র।

পিতামাতা ডাকিনী শকিনীর ভয়ে নিমাই নাম রাখিয়াছিল। নিমতরুতলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন।

দিব্য কোষ্ঠী গণনা শ্রবন করিয়া শ্রীমিশ্রের আত্মীয়-স্বজন, বান্ধবগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করিয়া 'জয় জয়' শব্দে আনন্দে অধীর হইলেন। তখন বাদ্যকারগণের সানাই, মৃদঙ্গ, বাঁশী, ঢোল-করতালের শব্দের সঙ্গে পুরনারীগণ ও দেবমাতাগণ একত্র হইয়া ধান-দূর্ব্বা লইয়া উলুধ্বনি সহকারে 'চিরায়ু থাক বাবা' বলিয়া শিশু শিরে অর্পণ করিলেন। শ্রীবাস ঘরণীও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণী ও নানাপ্রকার উপহার ও আভরণ লইয়া ধান-দূর্ব্বা শিরে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। দেবমাতাগণ প্রত্যাগমনের সময় শচীমাতাকে প্রণাম করিলেন, শচীমাতা কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। আজ হরি হরি ধ্বনির মধ্যে শ্রীমিশ্রের গৃহে ও সর্ব্ব নদীয়ায় মহা-আনন্দের কোলাহল হইতে লাগিল।

যখন শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিল, তখন যাহা দেখে তাহাই ধরিতে যায়। অগ্নি, জল, সর্প কিছুতেই ভয় নাই শিশুর। একদিন আঙ্গিনায় এক জাতি সর্প আসিলে শিশুর চাপল্য স্বভাবে ঐ সর্পকে ধরিলে সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রভুকে বেড়িয়া রহিল। প্রভু সর্পের উপরে শয়ন করিয়া রহিলেন, মনে হইল যেন ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত শয্যায় শায়িত শ্রীবিষ্ণু। পিতামাতা ভয়ে 'গড়ুর, গড়ুর' বলিয়া ডাকিয়া ক্রন্দন করিলে সর্প অন্তর্দ্ধান হইল।

এইমত দিনে দিনে শচীনন্দন শচীর আঙ্গিনায় পায়ে হাঁটিয়া ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কি নিরুপম বল-গোরাঙ্গের রূপ। সুবলিত মস্তকে চাঁচর কেশ, দীর্ঘায়ত কমল লোচনে মনোরম ঈক্ষণ হইল, চন্দ্রবিনিন্দিত বদন, আয়ালুলম্বিত ভুজদ্বয়, অর্ধরোষ্ঠ বান্ধুলী পুষ্পের ন্যায় ইষৎহাস্যে দেদীপ্যমান, দেহ স্বর্ণকান্তির ন্যায় মনোহর, কর-চরণ-অঙ্গুলী ও নখরাজি স্থল পদ্ম সদৃশ আভাযুক্ত। একদিন বাল গৌরাঙ্গের গমনকালে শচীমাতা দেখিলেন বালকের পদতল রক্তিম আভায় রঞ্জিত, দেখিলে মনে হয় পেলব পদতল হইতে শোণিত ঝরিতেছে। আর একদিন পিতামাতা অরুণ বর্ণ-চরণতলে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ, মৎস, পদ্ম, জবাদি, দেখিলেন। সুন্দর বালক হরি ধ্বনি

বন্ধ হইলে বিষাদে ক্রন্দন করেন। প্রভাতকালে নদীয়া নাগরীগণ বালককে মধ্যকেন্দ্র করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করেন, তখন প্রভু আমার আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। নামকীর্ত্তন বন্ধ হইলে প্রভু ক্রন্দন করিতে থাকেন। হরিধ্বনি করিলে বালকের ক্রন্দন বন্ধ হয় বলিয়া নদীয়া নাগরীগণ প্রভুর নাম রাখিলেন 'গৌরহরি।'

একদিন দুই চোর প্রভুর অলঙ্কার চুরি করিবার মানসে তাঁহাকে চুরি করিয়া কোলেতে লইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আবার চোরদ্বয় আপন ঘর মনে করিয়া জগন্নাথগৃহে আসিয়া প্রভুকে কোল হইতে নামাইয়া দেয়।

পিতা জগন্নাথ মিশ্র একদিন বলিলেন—"বিশ্বম্বর। বাপ। ঘর হইতে আমার গ্রন্থখানি আনিয়া দাও।" ইহা শ্রবনে সত্বর গ্রন্থখানি আনিতে গেলে রুনুঝুনু শব্দে নুপুরহীন পদে নুপুর বাজিয়া উঠিল। মাতাপিতা বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

—"আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নুপুব।
কোথায় বাজিল বাদ্য নুপুর মধুর॥"

একদিন ব্রহ্মণ্যতেজ বিশিষ্ট এক বিপ্র বাল গোপালকে কণ্ঠে দোলাইয়া নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে তীর্থপর্যটন চ্ছলে জগন্নাথ গৃহে বিজয় করিলেন। তিনি ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত। মিশ্র পুরন্দর অতিথির তেজময় কলেবর দর্শন করিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া নিজহস্তে পাদপ্রক্ষালন পূর্বক উত্তম আসনে বসিতে দিলেন। শ্রী মিশ্র হর্ষভরে, বাল গোপালের ভোগের জন্য অতিথিকে রন্ধন করিতে দিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মন বাল গোপালকে নিবেদন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বাল-গৌরচন্দ্র ধূলা ধূসরিত অঙ্গে উলঙ্গ বেশে আসিয়া—

"হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপে তিনবার রন্ধন করিয়া গোপাল দামোদরকে নিবেদন করিলে তিনবারই শ্রীগৌরসুন্দর ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন। অতিথি

বলিলেন—"আর রন্ধনের প্রয়োজন নাই। আমি কিছু ফলমূল ইষ্টদেবকে নিবেদন করিব।" তখন শ্রীগৌরহরির অগ্রজ নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপ আগমন করিয়া অতিথিকে বহু মিনতি ও আপ্যায়ন করিয়া চরণ ধরিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। তখন বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ পুনঃ রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইলেন। তখন দেড় প্রহর রজনী, পিতামাতা, অগ্রজ সকলেই যোগমায়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এবারও বাল গৌরাঙ্গ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিতে আসিলে ব্রাহ্মণ হায়! হায়! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু নিদ্রিত বলিয়া কেহই শুনিতে পারিলেন না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

"প্রভু বোলে আর বিপ্র তুমি ত উদার।
তুমি আমায় ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপ করি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমাস্থান॥
সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অষ্টভুজরূপ॥" চৈঃ ভাঃ

ব্রাহ্মণ দেখিলেন—"এক হস্তে নবনীত, অন্য হস্তে যায়, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষ, পরিসর বক্ষে বৈজয়ন্তী মালা দুলিতেছে, শিরে নবগুঞ্জা সহ শিখিপুচ্ছ শোভা পাইতেছে, নখর মনির কিরণে অন্ধকার দূরে যাইতেছে। ব্রাহ্মণ গোপ গোপী, গাভীগণ দর্শন করিলেন। কদম্ব বৃক্ষে কোকিল, শুকসারী ও ময়ুরময়ুরীগণের নৃত্য দেখিলেন, এই ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। করুণার অবতার প্রভু গৌরসুন্দর ব্রাহ্মণের অঙ্গে শ্রীহস্ত সঞ্চালন করিলে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার গ্রস্ত হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রী হস্তে খড়ি দিবার শুভক্ষণ আগমন করিলে শ্রীমিশ্র পুরন্দর হাতে খড়ি দিলেন। এতৎসহ কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ করিলেন। ১৪১৬ শকাব্দে অক্ষয় তৃতীয়ায় নিমাইর উপনয়ন হইল। বর্ণাক্ষর দেখিবামাত্র

লিখিয়া যান। গৌরহরি নিরন্তর কৃষ্ণের নাম-মালা লিখেন। প্রায়শঃ রাম, কৃষ্ণ, মুরারী, মুকুন্দ, বনমালী প্রভৃতি নাম লিখিয়া উহা শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন।

প্রত্যেকদিন নিমাই সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলা করিয়া শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করেণ বলিয়া জননী শাসন করেন। একদিন শচীমাতা খই ও সন্দেশ নিমাইর হস্তে দিয়া গৃহকার্যাদি করিতে চলিয়া গেলেন। নিমাই তাহা না খাইয়া মাটি ভক্ষণ করিলেন। মাতা হায়! হায়! বলিয়া শ্রীহস্ত হইতে মৃত্তিকা ফেলিয়া দিলে নিমাই ক্রন্দন করিয়া বলিলেন—"মা এই মাটিতেই আমাদের দেহ সৃষ্টি, এই মাটিতেই অন্ন হয় ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ কথা মাতাকে শিক্ষা দিয়া শচীমাতার কোলে উঠিয়া স্তন পান করিতে লাগিলেন।

নিমাই প্রায়শঃই সহচরগণের সহিত সুরধুনি গঙ্গায় যাইয়া জল ক্ষেপনাদি লীলা করেন। প্রত্যহ নদীয়া নাগরী কন্যাগণ দেবতা পূজনের জন্য পুষ্প, মালা, চাল, কলা, নৈবেদ্যাদি লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। নিমাই ও সহচরগণের সহিত গঙ্গায় গমণ করেন। নদীয়ার কিশোরীগণ দেবতার পূজা আরম্ভ করিলে চঞ্চল নিমাই কন্যাগণের মধ্যে বসিয়া বলেন—"তোমরা আমাকে পূজা দাও। গঙ্গা, দুর্গা, প্রভৃতি দেবীগণ আমার দাসী, শঙ্করও আমার কিঙ্কর। নিজ শ্রীহস্তে নিমাই ঐ পুষ্পের মালা কণ্ঠে দোলাইয়া দেবতা অর্চ্চনের সন্দেশ, কলা, চাউল নৈবেদ্যাদি ভোজন করেন। তাহা দর্শন করিয়া কন্যাগণ ক্রোধ করিলে নিমাই বলেন—"তোমাদের পরম সুন্দর বর হইবে এবং প্রত্যেকের সাতজন মতিমান পুত্র হইবে।" ইহা শ্রবণে সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। "যদি আমাকে নৈব্যদ্যাদি ভোজন করিতে না দাও, তবে তোমাদের প্রত্যেকের একজন করিয়া বৃদ্ধ বর ও চারিটী করিয়া সতিনী হইবে।" এতৎ শ্রবণে কন্যাগণ তাহার সম্মুখে নৈবেদ্য রাখিলে উহা ভোজন করিয়া কন্যাগণকে ইষ্টবর প্রদান করিলেন। অপরদিন শ্রীবল্লভ আচার্য্যের কন্যা কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবতা পূজনের জন্য গঙ্গায় গেলে শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁদবদন দর্শন করিয়া

আচার্য্যদুহিতার চিত্তে প্রীতির সঞ্চার হইল। সাহজিক প্রীতিতে দুঁহা দুঁহুকে দর্শন করিয়া দুঁহার চিত্ত উল্লসিত হইল। লক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে সুরভি সচন্দন পুষ্প অর্পণ করিয়া কণ্ঠে মল্লিকার মালা দোলাইয়া বন্দনা করিলেন। নিমাইয়ের চাপল্যদর্শনে পুরবাসীগণ তাঁহার পিতা-মাতার নিকট নালিশ করিলে মাতা ভৎর্সনা করিয়া নিমাইকে ধরিতে গেলে নিমাই পলায়ন করিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর সুখে বসিয়া আছেন দেখিয়া মাতা পুত্রকে গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে বলিলেন। এই বাক্য শ্রবণে নিমাই মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। শ্রী মিশ্র পুরন্দর নিমাইকে অধিক শাসন করিতে দেখিলে পুববাসিগণ পিতাকে বলেন যে তিনি এই নিমাইর তত্ত্ব কিছুই জানেন না। উত্তরে শ্রীমিশ্র বলিলেন—

মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষন॥ চৈঃ ভাঃ

ইং ১৫০৫ সালে শ্রী নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ণ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া পঞ্জীটীকাতে পারদর্শী হইলেন। নবীন হইয়াও প্রবীনদের তিনি বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একদিন মাতার পদে প্রনাম করিয়া বিশ্বম্ভর বললেন—"মাত! তোমার চরণে একটি নিবেদন আছে ও তাঁহা কি পূর্ণ করিবে? মাতা কহিলেন—"কি সে নিবেদন?" প্রভু কহিলেন—"একাদশীতে অন্ন খাইবে না।" মাতা বলিলেন—"ভালই হইল"। শচীদেবী সেই দিন হইতে একাদশী ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিশ্বরূপের যৌবন দেখিয়া পিতা শুভ পরিণয়ের জন্য সুকন্যা দেখিতে লাগিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। প্রভু কহিলেন—"পিতৃকুল, মাতৃকুল উভয় কুলই উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের সেবা করিব, মনে কোন দুঃখ করিওনা।"

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শ্রী মিশ্র ইহলীলা সংবরন করিলেন। শচীদেবী ও গৌরহরি শোকে বিষাদিত হইলে আত্মীয় স্বজন আগমন করিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বিধি অনুসারে প্রভু পিতার শ্রাদ্ধ তর্পনাদি করিলেন।

শ্রীগৌরহরি চিন্তা করিলেন যে গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন না করিলে গৃহধর্ম্ম শোভা পায়না। অকস্মাৎ একদিন অধ্যাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে গঙ্গার পথে দর্শন করিলে উভয়েরই পূর্ব্বসিদ্ধ প্রীতিভাব জাগিয়া উঠিল। তারপর, বনমালী ঘটক একদিন শচীমাতার নিকটে গিয়া শুভ বিবাহের কথা বলিলে মাতার ইঙ্গিতে শুভ পরিণয়ের দিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে ধার্য্য হইল। প্রভু শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। প্রভুর চাঁদবদন, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী চাঁদবদনী। তুঁহে তুঁহার পূর্ব্ব সাহজিক প্রেমে মুগ্ধ। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাশয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীশচী নন্দনের শতশত শিষ্যগণ তাহার নিকটে আসিয়া অধ্যয়ন করেন। প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবন করিয়া সুপণ্ডিতগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মহাপণ্ডিত-গণ শাস্ত্রতর্কে পরাজিত হইলেও মহাপ্রভুর বিনয় স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ তিনি শিষ্যগণের সহিত সুরধুনি গঙ্গায় নানা ভঙ্গিতে জলকেলি করেন।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করিবার ইচ্ছা হইল। গমন কালে যাহাকে দেখেন তাহাকেই বলেন—"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলো। নিরবধি হরি সংকীর্ত্তন করো।" পূর্ব্ববঙ্গে তপন মিশ্র নামে একভক্ত সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মন ক্ষুব্ধ। স্বপ্নে এক বিপ্র তপন মিশ্রকে কহিলেন—"(হে তপন! নিমাই পণ্ডিতের নিকট যাও, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিতে পারিবে।" মহাপ্রভু সাধ্য সাধন তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীতপন মিশ্রকে বারানসী যাইতে

আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন যে বারানসীতে তাহার সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাৎ হইবে। তিনি এই ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। এদিকে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী প্রভুর বিরহে দিবারাত্রি অশ্রু বর্ষণ করেন। প্রভুর বিরহের তীব্র তাপে তিনি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে শ্রীগৌরাঙ্গে মিলিত হইলেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীকে দংশিল। বিরহ সর্প বিষে তার পরলোক হইল।" কিছুদিন পরে শ্রীগৌরহরি পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্তর্যামী রূপে তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়োগের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন প্রভু গ্রন্থ হস্তে অধ্যাপনা করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে শচীমাতা বলিলেন—"তুমি ত বিদ্যারসে বিভোর হইয়া আছ; ঘরে একদিনের খাইবারও সম্বল নাই। তখন প্রভু অধ্যাপনা করিয়া জাহ্নবীতীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীমাতাকে বলিলেন—"মাতঃ! কৃষ্ণই পালন কর্ত্তা, এই দেখো—কৃষ্ণই এই দুই তোলা স্বর্ণ দিয়াছেন যথা—

দেখ মাতা! কৃষ্ণ এই দিলেন স্বম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥" চৈঃ ভাঃ

এইভাবে সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর মহাপ্রভু গুপ্তভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করেন। প্রত্যহ স্নান করিয়া গঙ্গা বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তুলসী দেবীকে জলসেচন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণ-পূজা সমাপনান্তে কৃষ্ণের অধরামৃত প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ক্ষণকালের জন্যও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীহস্ত হইতে ত্যাগ করেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের সুন্দর ললাটে ঊর্দ্ধ তিলক শোভা পাইতেছে, শিরে মনোহর চাঁচর কেশ স্কন্ধে উপবীত যেন ব্রহ্মতেজ বিকীর্ণ করিতেছে; হাস্য চন্দ্রবদনে উজ্জ্বল আভা বিস্তার করিতেছে; আকর্ণ বিস্তৃত পদ্ম-পলাশ সদৃশ নয়ন ভাবাবেশে স্নিগ্ধ ও তরল। নদীয়াবাসিগণ সুন্দর ও ভাবময় মূর্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দররূপে মদন, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় সরস্বতী-পতি, বিনয় ও দৈন্যে পরম ভাগবত। তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে সংস্কৃত অধ্যাপকগণ, মহা মহা পণ্ডিতগণ, ধন্য ধন্য করিতেন এবং অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। প্রভু বিদ্যারসে সতত মগ্ন। মাতা পুত্রের জন্য উপযুক্ত কন্যা অনুসন্ধান করিতেছেন। নবদ্বীপে এক রাজপণ্ডিত সনাতন বাস করেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী উচ্চবংশ জাত ও পরম উদার। তাহার কন্যা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, পরম সুচরিতা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌরসুন্দর সুপ্রভাতে গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা সমাপনান্তে আত্মীয়স্বজনসহ নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিলেন। সানাঞি. ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য ও জয় জয় কোলাহলের মধ্যে মহাসমারোহে শুভদিনে শুভক্ষণে শুভ পরিণয় হইয়া গেল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া প্রণাম করতঃ আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নবকন্যার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। পরে বর ও কন্যা উভয়েই পরস্পরের অঙ্গে গন্ধপুষ্প বরিষণ করিতে লাগিলেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

অথ দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ ও কৃপা দান:—সেদিন জ্যোৎস্নাবতী রজনী। শ্রীগৌরাঙ্গ অজস্র শিষ্যগণসহ শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যয়ন করিতেছেন। এমনই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গামাতাকে প্রণাম করিয়া প্রভুর স্থানে আগমন করিলে প্রভু তাহাকে আদর করিয়া সসম্ভ্রমে তথায় বসাইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অবজ্ঞার সুরে তাহাকে বলিলেন—"তুমি ব্যাকরণ ও কলাপ অধ্যাপনা করিয়া বাল্য শাস্ত্রে তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া শিষ্যগণ বলে: প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই আমি অভিমানে, শিষ্যগণও বুঝে না, আমিও বুঝাইতে পারি না। প্রভু দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন—"আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে ও কবিত্বে প্রবীণ, আর আমি শাস্ত্রেতে নবীন, আপনি কৃপা পূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত এক ঘণ্টায় গঙ্গার একশত শ্লোক অনর্গল ঝঞ্ঝাবাতের মত বলিতে লাগিলেন। শ্রবণে প্রভু বলিলেন—"আপনার সমতুল্য কবি আর কোথায়ও দৃষ্ট

হয় না বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন।" দিগ্বিজয়ী প্রভুর নিকট শ্লোকের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে শত শ্লোকেব এক শ্লোক প্রভু ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

তথাহিদিগ্বিজয়ী বাক্যম্ ঃ—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততামিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎ পতি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরচ্চ্য চরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্য্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

অর্থাৎ গঙ্গার এই মহিমা দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। কি সুর কি নর সকলেই দ্বিতীয় কমলের ন্যায় ইহার চরণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আর ইনি ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুত গুণ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন। প্রভু পণ্ডিতকে কহিলেন—"এই শ্লোকের কি গুণ আর কি দোষ আছে বলুন।" উত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—"শ্লোকে কোন দোষ নাই, তুমি ব্যাকবণ অধ্যয়ন করিয়াছ, অলঙ্কাব শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, সুতরাং কবিত্বের সাব এই শ্লোকেব কি বুঝিবে? প্রভু বলিলেন—

"প্রভু কহে কহি শুন না করিও রোষ—
পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥

এই শ্লোকে অবিমৃষ্ট, বিধেয় অংশে দুই স্থানে দোষ, বিরুদ্ধমতিকৃৎ, ভগ্নক্রম ও পুনরাত্তি এই তিন দোষ মিলিয়া পঞ্চালঙ্কারে পঞ্চদোষ হইয়াছে। ইদং শব্দের অনুবাদ পূর্ব্বে না বলিয়া পরে বসাতে দোষাবহ, কারণ বিধেয় আগে বলিয়া পরে অনুবাদ করা হইয়াছে বলিয়া শ্লোকের অর্থ বাদ পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীলক্ষ্মী দ্বিতীয় বিধেয়, উহা সমাসে গৌণ হইল বলিয়া শব্দের অর্থ নষ্ট হইল। ইহাতে লক্ষ্মীর সমতা অর্থ বিনষ্ট হইল। এই দোষের নাম অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ বলা হইয়া থাকে। তারপর, ভবানীভুক্ত শব্দের অর্থ মহাদেবের ভার্য্যা,

উহার ভর্ত্তা বা পতি বলিলে ভবানীর দ্বিতীয় পতি বুঝায়। ইহাকে শাস্ত্রে বিরুদ্ধ মতিকৃৎ বলিয়া মহাদোষের মধ্যে পরিগণিত। অতএব, শিবপত্নীভর্ত্তা শুনিতে বিরুদ্ধ। আরও একটি দোষ এই যে বিভবতি ক্রিয়ার সঙ্গে পুনরায় অদ্ভুতগুণা আবৃত্তি করাতে পুনরাবৃত্তি দোষে দূষিত।

বালকের নিকট পরাজিত হইয়া বিষাদিত অন্তঃকরণে গৃহে গিয়া দিগ্বিজয়ী অভিভূত হইলেন। স্বপ্নে দেবী সরস্বতী আগমণ করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন—"পণ্ডিত তুমি দুঃখ করিও না। তোমার মহাভাগ্যের উদয় হইয়াছে; তুমি যার নিকট পরাজিত হইয়াছ তিনি স্বয়ং ভগবান, আমার পতি। তুমি প্রভাতে যাইয়া তাহার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিও। তুমি ভাগ্যবান।"

"ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যারসে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু বাল্যভাবে ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনাম শুনাইলেন। বাল্য বয়সে হাতে খড়ি ও কর্মবেধ হইল। নিমাইর শুভ বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌগণ্ড বয়স। এই পৌগণ্ডে তিনি শিষ্যগণকে বিদ্যাশিক্ষা দেন, সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা করেন। এই পৌগণ্ড বয়সেই পঞ্জীটীকাতে পারদর্শী হইলেন, এবং যাহাকেই সম্মুখে দেখেন তাহাকেই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণভক্তির উপদেশ প্রদান করেন। দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তনে তিনি গৌড়মণ্ডলকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার প্রকাণ্ড অবয়বে তপ্ত হেম সম কান্তি, নবজলদ জিনিয়া গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি, মহাপুরুষ লক্ষণ মতে নিজ হস্তের চারিহাত দীর্ঘ, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, তিলফুল সম উন্নত নাসিকা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, চন্দনের অঙ্গদ ও বালা পরিধান করতঃ হেমদণ্ড বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। তাহার দেহের দ্যুতি কোটি চন্দ্র হইতেও সমুজ্জ্বল। বদন চন্দ্রমার ছটায় কোটি-শারদ পূর্ণিমার শশধর নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে।

পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে যেমন সমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হয়, সেইরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেম-মহাসমুদ্রে বান ডাকিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল প্রেম-বন্যায় প্লাবিত। পূর্ণিমার চাঁদ সৌরকর তপ্ত জগতকে শীতল করে. আর এই গৌরচাঁদ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক তাপত্রয়ে জ্বলিত বিশ্বমানবগণকে প্রেম-মাধুর্য্য ধারায় স্নিগ্ধ করিতেছেন। নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন লোভে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্যামসুন্দর প্রেমানন্দে হেমদণ্ড সদৃশ ভূজদ্বয় উত্তোলন করিয়া নদীয়ার ধূলায় নৃত্য করিতেছেন এবং এই নৃত্যের তালে তালে যেন সমগ্র বিশ্বের পাপ, কলুষ, বিবিধ দুর্বাসনা মানব চিত্ত হইতে চিরতরে মুছিয়া যাইতেছে। অযোগ্য, দীন-হীন জনতা প্রেমদান করেন বলিয়া তিনি কল্পতরু হইতেও উদার। তিনি অপরাধের বিচার না করিয়াই নামেব মুখ্যফল প্রেম নামের সহিতই দান করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ পাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"
অদ্যাপিও দেখ, চৈতন্যের নাম যে লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাঙ্গ বিহ্বল সে হয়॥"

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন মহাপ্রভু গয়াধামে গমন করিয়া শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত: গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর গুরু কেহই হইতে পারেন না, এবং তাহার দীক্ষারও কোন প্রয়োজন ছিলনা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে প্রথমেই দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা জন সাধারনকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই এই দীক্ষা। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।

১৪৩০ শকাব্দে পৌষের শেষে গয়াধাম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ এক বৎসর কাল পার্ষদগণসহ শ্রীহরিণাম সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীমন মহাপ্রভুব অসংখ্য পার্ষদগণ-মধ্যে কতিপয় নাম উল্লেখ করিলাম। যথা—শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরামপণ্ডিত দুই সহোদর সহ শ্রীপতি, শ্রীনিধি, এই চারি ভাইএর দাসদাসী প্রভৃতি পরিকরগণ,

হেথায় শ্রীমন মহাপ্রভু প্রায়শই শ্রীহরি সংকীর্ত্তন করিতেন। আচার্য্য-রত্ন ও তাহার শাখা-উপশাখা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য যার ঘরে প্রভু দেবীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন ; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, যার জন্য প্রভুই (বাপ বাপ) বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন পণ্ডিত গদাধর, লক্ষীরূপা বলিয়া যিনি খ্যাত, পণ্ডিত বক্রেশ্বর যিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর নাম-সংকীর্ত্তনে নৃত্য করেন। সত্যভামা নামে খ্যাত পণ্ডিত জগদানন্দ, পণ্ডিত রাঘব এ তাহার মুখ্য শাখা মকরধ্বজ কর ও তাহার ভগ্নী-দময়ন্তী—যিনি প্রভুর ভোগের সামগ্রী বারমাসী করেন, ভোগের দ্রব্যাদি শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঝলিতে রাখেন বলিয়া রাঘবের ঝালী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, আচার্য্য পুরন্দর, পণ্ডিত দামোদর, শঙ্কর পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, নারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দন আচার্য্যও তাহার শাখা, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নাম-মহাত্ম্য প্রচারক ঠাকুর হরিদাস, কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ-খান ও কুলীন গ্রাম বাসিগণ, শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীমান সেন, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শাখাগণ, শ্রীসেন শিবানন্দ, নকুল ব্রহ্মচারী, শিবানন্দের উপশাখা ও তাহার পরিকর সেন-শিবানন্দের তিনপুত্র শ্রীচৈতন্যদাস, রামদাস ও কবি কর্ণপূর, শ্রীবল্লভ সেন, শ্রীকান্ত সেন, শ্রীগোবিন্দানন্দ, প্রভুর আদি কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্ত, আখরিয়া বিজয় দাস, প্রিয় ভক্ত কৃষ্ণদাস, খোলাবেচা শ্রীধর—যাহার মোচা, থোর, ফলাদি প্রভু নিত্য গ্রহণ করেন, ভগবান পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য মহাশয়, বনমালী পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান, খণ্ডবাসী নরহরি, মুকুন্দ দাস, রঘুনন্দন, কুলীন গ্রামের রামানন্দ, সত্যরাজ, শঙ্কর, বানীনাথ বসু, অনুপম, বল্লভ, শ্রীরূপ-সনাতন, প্রিয় রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, শঙ্করারণ্য আচার্য্য, মুকুন্দ, মহেশ পণ্ডিত, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব তিন ভাই, যাহাদের কীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নৃত্য করেন। রামদাস, অভিরাম ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব, শ্রীরঘু নন্দন, মাধাবাচার্য্য, যদুনন্দন, জগাই মাধাই দুই ভাই

গৌরমণ্ডলের ভক্তগণের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। অসংখ্য অনন্ত শ্রীচৈতন্যের পরিকব গণের নাম লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য।

শ্রীনিত্যানন্দের অসংখ্যগণ মধ্যে কতিপয় পরিকরের নাম প্রদত্ত হইল অসংখ্য শাখা প্রশাখা সহ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি, শ্রীরামদাস, গঙ্গাধর দাস, মাধব, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর দাস, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীমুরারী চৈতন্যদাস—যিনি ব্যাঘ্র গালে চড় মারেন ও সর্পসঙ্গে খেলা করেন, ব্রজসখাগণ প্রায়ই নিত্যানন্দ প্রভুব ব্রজশাখা বঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়, সুন্দরা নন্দ, কমলাকর পিপলাই, সূর্য্যদাস সরখেল, কৃষ্ণদাস, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীপুবন্দর পণ্ডিত, পবমেশ্বর দাস, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, পণ্ডিত ধনঞ্জয়, মহেশ পণ্ডিত, পণ্ডিত পুরুষোত্তম, শ্রীসদাশিব কবিবাজ, শ্রীকানু ঠাকুব, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত, শ্রীজীব পণ্ডিত, বাম'নন্দ বসু, শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ, জ্ঞানদাস, মীনকেতন, রামদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা নাবায়নী নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তগণ।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুব গণমধ্যে কতিপয পবিকবের নাম প্রদত্ত হইল। যথা শ্রীঅচ্যুতানন্দ বড শাখা, কৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীগোপাল, বলবাম জগদীশ, কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, বাসুদেব দত্ত, ভাগবতাচার্য্য ও বিষ্ণুদাস আচার্য্য চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য, নন্দিনী আব কামদেব, দুর্ল্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ কব আর ভবনাথ কর হৃদয়ানন্দ সেন, যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দ্দন দাস, কানু পণ্ডিত, নাবাযণ দাস, ব্রহ্মচারী হরিদাস, পণ্ডিত পুরুষোত্তম, কবিচন্দ্র, মাধব পণ্ডিত আর মুরারী পণ্ডিত, বিজয় পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীরাম প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তগণ। এইরূপে পণ্ডিত গদাধব ও ভক্ত হরিদাস ঠাকুরেব বহু ভক্তগণ রহিয়াছেন।

একদিন অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন মহাপ্রভুকে বলিলেন—"দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সখা অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে আমার অভিলাষ। এই বাক্য বলিতেই আচার্য্য প্রভু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্যামল সুন্দররূপ দর্শন করিলেন।

তাহার বদন বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য, চন্দ্র, নদনদী এবং পতঙ্গের মত দুর্যোধন.দুঃশাসনাদি প্রভৃতি কৌরবগণের প্রবেশ তিনি দর্শন করিলেন।

শ্রীমন মহাপ্রভু আর্দ্রনয়নে দ্রবীভূত হৃদয়ে নিরন্তর কৃ+ষ্ণ এই দুই বর্ণ জানিতেছেন। কাহারও মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলেই তিনি আত্মহারা হইয়া অশ্রু, পুলক, মহাকর্ম্মাদি প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক বিকার আবেশে ভূমে গড়াগড়ি যান, কখনও 'গোপী গোপী' বলিয়া রোদন করেন; কখনও বলেন—'আমিই সেই মদন গোপাল।' শ্রী:গৌরাঙ্গকখনও কৃষ্ণবিরহিনী রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন. তাঁহার অঙ্গ বিরহ তাপে বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে। কখনও মিলনোৎকণ্ঠায় শ্রীমতীর ভাবে শ্রীঅঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া প্রেমামৃত পানে যেন স্নিগ্ধভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রী:গৌরাঙ্গ একদিন পড়ুয়া ছাত্রগণকে বলিলেন—"ভাইসব তোমরা অদ্য হইতে আমার নিকট আর অধ্যয়ন করিতে আসিও না। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলেই এই ত্রিভুবনে শুধু শ্রী:গাবিন্দকেই দর্শন করি, অধ্যাপনা কালে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছুরই স্মরণ হয় না, কি ভাবে তোমাদিগকে পডাইব? ইহা সত্য করিয়া বলিলাম, কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না।"—এই বলিয়া তিনি সাশ্রুনেত্রে পুঁথিগুলিকে ডোর দিয়া বন্ধন করিলেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের মূরলিধ্বনি শ্রবণ করিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মূরলী-বাজায়।
সবে দেখো তাই ভাই বোঁলো সর্ব্বথায়॥" চৈ ভাঃ

কৃষ্ণ না বলিয়া 'কৃষ্ণবর্ণ একশিশু' বলায় বিশেষ রহস্যের অবতারনা করা হইয়াছে। এই রহস্যের তাৎপর্য্য আমরা চণ্ডীদাসে পাইতেছি। চণ্ডীদাসের চিত্ত-নিকুঞ্জ বাসিনী শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

"পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব মূলে
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥
মূরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া সহজে কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পীরিতি কেমন জ্বালা।"

তাহা হইলে, গৌরাঙ্গকৃষ্ণ কিশোর যে বাঁশী শ্রবণ করিতেছেন;

সে মুরলী বাজাইতেছেন কৃষ্ণাঙ্গিনী কিশোরী শ্রীরাধা শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোর প্রকাশ বিশেষে অন্তরে সন্নিহিতা রাধাভাবে নিজের অন্তর ভাবিত করিয়া "কৃষ্ণবর্ণ এক শিশুর" মুরলীগান শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন। প্রিয়তমকে সন্নিহিতে পাইয়াও বিরহ—ইহা প্রেম বৈচিত্রের লক্ষণ।

১৪৩০ শকাব্দে পৌষের শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর গয়াধাম হইতে গৃহে আগমনের সময়ে কানাইর নাটশালা গ্রামের সন্নিহিত হইলে তমাল শ্যামল বালককে দর্শন করিয়া বলিলেন—"তাহার নিবিড় সুচিক্কন আকুঞ্চিত কেশদামে নবগুঞ্জা বিবিধ রত্নে বিভূষিত, চন্দ্রবদনে স্মিত-হাস্য ও অধরে মধুর মুরলী, সুবর্নিত ভূজদ্বয়ে রত্নালঙ্কারে ভূষিত, বিস্ফারিত কমল-নয়নের ভ্রু নাচাইয়া আমার নিকট আগমণ করত: আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আঁখির পলকে পলায়ন করিল"। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে —

"আমার সম্মুখে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥"

—এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শচীমাতাকে প্রেম ভক্তি প্রদান করিলেন। তারপর, পণ্ডিত শ্রীবাস শ্রীমন মহাপ্রভুর অভিষেক করিলেন। তিনি বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। তারপর প্রভু নিত্যানন্দের আগমন হইল। তিনি প্রথমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেনুধর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিন অঙ্গ বক্রযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন; তাহার দুই হস্তে বেণু আর দুই হস্তে শঙ্খ ফুৎকার করেন। অবশেষে, প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীমন মহাপ্রভুকে দ্বিভূজ মুরলীধারী পীতাম্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দররূপে দেখিতে পাইলেন।

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখয়ে যারে সে দেখিতে পারে॥ চৈঃ ভাঃ
না বুঝি যে নিন্দে তান চরিত্র অগাঢ়।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি,
নিতাই-গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধুপান করি॥

অথ জগাই মাধাই উদ্ধার ও কৃপাদান :—

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসকে আজ্ঞা করিলেন —"আপনারা দুজনে প্রতি ঘরে ঘরে গমন করিয়া এই বাক্য বলিয়া ভিক্ষা করুন। "কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বলো, গাও কৃষ্ণনাম।" আজ্ঞা পাইয়া উভয়ে প্রতি ঘরে ঘরে বলিলেন—

বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন॥ চৈঃ ভাঃ

একদিন নদীয়ার পথে দুইজন বিশাল মন্তপ, মহাদস্যু ও মাতোয়ালকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা মদ ও গোমাংস ভক্ষণকারী, চুরি ও দস্যুবৃত্তিতে সিদ্ধহস্ত, প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস ঐ দুই মাতাল জগাই ও মাধাইকে শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞার কথা বলিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ॥" চৈঃ ভাঃ

এই কথা শুনিতেই মাধাই মুটকী তুলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে আঘাত করিলে ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ইহা দর্শনে জগাই মাধাইকে, পুনরায় আঘাত করিতে নিষেধ করিল। লোকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরহরি ঐ স্থানে আগমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে রক্তপাত দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া চক্র চক্র চক্র বলিয়া তিনবার আহ্বান করিলে সুদর্শন আগমন করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে বলিলেন—"মাধাই আমাকে আক্রমণ করিতে আসিলে জগাই বাধা প্রদান করিয়াছিল, অতএব আমার কোন দুঃখ নাই।

প্রভোঃ এই দুইজনের প্রাণ ভিক্ষা দিন, এই করুণা অবতারে, এই পতিত পাবন অবতারে সকলেই করুণা পাইবে।

"মারিল কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" "রামাদি অবতারে ধনুক ধরিয়া করে অসুরেরে করিল সংহার।" এবে অস্ত্র না ধরিল, কারও প্রাণে না মারিল, হরি নামে তারিল সংসার॥ মহাপ্রভু জগাইকে কৃপা করিয়া মাধাইকে বলিলেন—

"মো হইতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাভ দৃঢ়॥" চৈঃ ভাঃ

মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকেও কৃপা করিলেন। তখন জগাই ও মাধাইকে লইয়া পণ্ডিত শ্রীবাস, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে জগাই ও মাধাই হরি হরি ধ্বনি করিয়া অশ্রু, কম্প, পুলকে মুর্ছিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এইভাবে দুই মহাপাপী দস্যু মহাভাগবত হইলেন।

পরে মুরারী ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার কাঁধে চড়িয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। অতঃপর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীব তণ্ডুল ভোজন করিয়া 'হরের্নাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা কবিলেন।

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গোস্ত্র পার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ে যজন্তি হি সুমেধ সঃ॥

যাহার মুখে কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ, যাহার কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ উপাঙ্গ ও অস্ত্র পার্ষ্যদ সমন্বিত, সুমেধাগণ নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

মনে হয় ব্রজলীলায় শ্রীনন্দ নন্দনের সর্ব্বোত্তম, হৃদকর্ণ রসায়ন শ্রীরাসলীলায় ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীরাস মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়াও সাধ পূর্ণ হয় নাই। তাই সর্ব্বযুগসার এই কলিযুগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই সাধ পূর্ণ করিবার জন্যই কি শ্রীধাম নবদ্বীপে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নামরূপ যজ্ঞস্থালী শ্রীবাস আঙ্গিনায় নামাবেশে হেমদণ্ড বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া উদণ্ড নৃত্য করিতে আসিয়াছেন। দ্বাপরের মুরলী বদন কলিতে হরিকীর্ত্তন মুখর বদন হইয়াছেন। মনে হয় দ্বাপরে ভব, বিরিঞ্চির যে সাধ মিটে নাই, কলিতে সেই সাধপূর্ণ করিবার জন্যই কি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ও ঠাকুর হরিদাসরূপে প্রচ্ছন্নভাবে প্রচ্ছন্নবতারে শ্রী:গৌরাঙ্গ মাধবের সহিত শ্রীবাস আঙ্গিনা রূপ রাসমঞ্চে কলিযুগে মোহনাখ্য মহাভাবের তরঙ্গাভিঘাত-রূপ হরি সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে আসিয়াছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব শ্রীহরি কীর্ত্তনে তাহার সমস্ত অন্তর দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া শ্রীহরি নাম উচ্চারণ করিতেন। তাহার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ত্তিময় বাঞ্ছাত্রয়ের আস্বাদন গৌর-কণ্ঠোচ্চারিত নামাক্ষরের মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। গৌরকণ্ঠের 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ বিরহিনী শ্রীরাধার পুঞ্জিত বিরহ বেদনা প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দ্বা·া জীব হৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া এই নামের ভিতরে বিরহের তরঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়া উজ্জ্বল রসের সূত্রদ্বারা নাম ও প্রেমের মালা গাথিয়া জীবের গলায় পরাইয়া দিলেন। ইহাই প্রেমদাতা-শিরোমণি শ্রী:গৌরাঙ্গ

মাধবের মহাদান। সাধন নাম ও সাধ্যশিরোমণি রাধাপ্রেম। বহিরঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন আর অন্তরঙ্গে শ্রীরাধার রহোদাস্তে উৎকণ্ঠাময়ী মানসী সেবা—ইহাই সাধ্যশিরোমণি।

কলিপাবনাবতারি শ্রীমণ মহাপ্রভু কৃপা-পূর্ব্বক শাস্ত্রের প্রমাণসহ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন যে অন্য তিন যুগে ধ্যান, যজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল লাভ হইত কলিযুগে শুধুমাত্র শ্রীহরিনাম যজ্ঞের দ্বারাই কলিহত জীব সেই ফল লাভ করেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর কর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র ধর্ম্ম॥
হর্ষে প্রভু কহে স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কেলি পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিযুগে তারকব্রহ্ম নামই মহামন্ত্র। ইহাতে ষোলটি নাম ও বত্রিশটি অক্ষর আছে:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

শ্রীনামের মহিমা সম্বন্ধে পদ্যাবলী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃত আস্বাদন;
সর্ব্বাত্ম স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

যাহা চিত্তরূপ দর্শনের মালিন্য অপসারণ করেন, যাহা সংসাররূপ দাবাগ্নির জ্বালা নিবারণ করেন, যাহা পরম মঙ্গলরূপ শ্বেতপদ্মের শুভ্র জ্যোৎস্না সদৃশ, যাহা পরম বিদ্যারূপ বধুর প্রাণস্বরূপ, যাহার শ্রবণে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হয়, যাহার পদে পদে পূর্ণরূপে অমৃতাস্বাদন বিদ্যমান, যাহা আমাকে প্রেম-রসাবেশে স্নাত করাইয়া অভূতপূর্ব্ব প্রীতিরস প্রদান করেন, সেই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ চৈঃ চঃ

একদিন শ্রীবাস আঙ্গিনায় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে 'সহস্র নাম' পাঠ করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। শ্রীবাস নরসিংহ নাম পাঠ করিলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃকেশরীর আবেশে হস্তে গদা লইয়া মহাতেজোময় রূপে পাষণ্ডী দলন করিতে গমন করেন। লোকসব ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়, তখন প্রভু বাহ্য পাইয়া শ্রীবাসাঙ্গনে গদা রাখিয়া দিলেন। আর একদিন প্রভুর অঙ্গনে এক শিবভক্ত ডম্বুরু বাজাইয়া নৃত্য করিবার কালে তিনি মহেশাভাসে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করেন।

অতঃপর একদিন এক সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষ শ্রীমন মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল ত সর্ব্বজ্ঞ! আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম? প্রভুর বাক্য শ্রবণে সর্ব্বজ্ঞ ধ্যান করিয়া গণনা করিতে লাগিলে এক মহাজ্যোতির্ময় অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিরূপে পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে দর্শন করিলেন।

অথ কাজী উদ্ধার

শ্রীবাস আঙ্গিনায় ভক্তসঙ্গে চারি-প্রহর হরিসংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে আগমন করিলেন, এবং নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বহু মৃদঙ্গ

ও করতালে 'হরি হরি' ধ্বনিসহ সংকীর্ত্তন আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিল—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমো। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।" সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গগর্জ্জন ও 'হরি হরি' ধ্বনি শ্রবণে সকল যবন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। যবনগণ কাজির নিকট আগমন করিয়া নালিশ করিলে কাজী সন্ধ্যাবেলায় এক গৃহে আসিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন! সকল নদীয়াবাসীগণ শ্রীমন মহাপ্রভুর নিকট আগমন করতঃ সমস্ত বার্ত্তা নিবেদন করিলে তিনি আজ্ঞা দিলেন—

প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিমু আজি সকল যবন॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগর মণ্ডল॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনের জন্য তিনটি সম্প্রদায় করিলেন। অগ্রগামী সম্প্রদায় নৃত্য করেন, ঠাকুর হরিদাস, মধ্যভাগ সম্প্রদায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উল্লাসে নৃত্য করেন, পশ্চাৎ সম্প্রদায়ে নৃত্য করেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ। চতুর্দ্দিকের লোক কোলাহল, বহু মৃদঙ্গ-গর্জন, করতালির ঝঙ্কার, 'হরি হরি' সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণে কাজী ভয়ে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে তখনও "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমো" ও "তোহারি চরণে মন লাগহরে" প্রভৃতি শ্রীহরি সংকীর্ত্তন কাজীর গৃহের চতুর্দ্দিকে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে, কিছুক্ষণ পর কাজী মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিলে প্রভু কাজীকে সসম্মানে বসিতে বলিলেন। কাজী বলিলেন—"গ্রাম্য সম্পর্কে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার চাচা হয়, সেই সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনেয় হও।" "যেদিন আমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া গৃহে আসিলাম, সেদিন রাত্রিতে স্বপ্নে এক মহাভয়ঙ্কর সিংহ দন্ত কড়মড় করিয়া লম্ফ দিয়া আমার বুকে চড়িয়া তীক্ষ্ণ নখাগ্রে আমার

বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলে আমি ভয়ে ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিলাম”—এই কথা বলিয়া কাজী সকলকে বুকে সিংহ-নখাগ্রের ক্ষত চিহ্ন দেখাইলেন। ইহা দর্শনে সকল লোকগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন—“আমার মনে হয় তুমি পয়গম্বর, তুমিই নারায়ণ, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই ঈশ্বর।” শ্রীগৌরহরি বলিলেন—

“হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লইলে এই তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান তুমি বড় পূণ্যবান॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয় বাণী॥”

এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দর কাজীকে উদ্ধার করিলে তাহার বংশের প্রায় সকলেই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবাসও পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। তখন শ্রীবাসের এক পুত্র পরলোক গমন করিলেন কিন্তু পিতা শ্রীবাসের চিত্তে কোন শোক লক্ষণ দেখা গেল না। পণ্ডিত শ্রীবাস সব সময়ই ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। এইজন্য স্ত্রীপুত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। এক যবন দর্জ্জি শ্রীবাসের সন্তানদিগকে মাঝে মাঝে পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিয়া দিতেন এবং তণ্ডুলাদি ভোজ্যদ্রব্য দিয়া সাহায্য করিতেন। শ্রীমন মহাপ্রভু যবন দর্জ্জির প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। পরে ঐ দর্জ্জি মহা বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

অতঃপর, শ্রী আচার্য্য প্রভুর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণলীলা করিয়া রুক্মিনী স্বরূপ হইলেন। কভু দুর্গা, কভু লক্ষী, কখনও বা চিৎ শক্তির রূপ ধারণ করেন। আচার্য্য প্রভুর বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ভক্তগণকে প্রেম ভক্তির উপদেশ করেন।

"সপ্তম পরিচ্ছেদ"

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ।

বৃন্দাবন-দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি। নিতাই-গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গাইয়া মধুপান করি॥ একদিন এক বিদ্যার্থী প্রভুগৃহে আগমণ করিয়া দর্শন করিলেন—শ্রীগৌরহরি গোপী, গোপী, বলিয়া বিরহভাবে, বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন। বিদ্যার্থী বলিলেন—"কৃষ্ণ নামই ধন্য, তাহা না বলিয়া 'গোপী, গোপী নাম বলিতেছেন কেন? ইহা শ্রবণে প্রভু ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যার্থীকে মারিতে গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া পড়ুয়াগণ, নিন্দুক ও দুর্জ্জনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—

"মোর নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণতঃ হইব॥" চৈঃ চঃ

মনে এই দৃঢ় যুক্তি লইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময়ে শ্রীপাদ কেশবভারতী নদীয়া নগরে আগমন করিলে প্রভু তাহাকে নমস্কার করিয়া ভিক্ষা করাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন,। পরে তিনি ভারতী গোসাঞিকে বলিলেন—"আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সংসার মোচন করিয়া দিন"। শ্রীভারতী গোসাঞি বলিলেন—"তুমি অন্তর্যামী ঈশ্বর, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব, আমি স্বতন্ত্র কেহ নই।" এই বলিয়া ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গমন করিলেন। শ্রীমন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন "তিনি সন্ন্যাসী হইবেন এই কথা আপনি, শচীমাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, আচার্য্য চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ—এই পঞ্চজন ব্যতীত আর কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না।" গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিনে পঞ্চতত্ত্বসহ সকল বৈষ্ণবগণের সহিত তিনি সংকীর্ত্তন রসে মগ্ন। অশ্রুসিক্ত নয়নে

হেম দণ্ড বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর গদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণ নামের দুইটি বর্ণ উচ্চারণ করিতেছেন। দেহে কম্প, পুলক অশ্রু প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে হেমকান্তি দেহ ধূলায় ধূসরিত হইয়া যাইতেছে। কখনও ভক্ত—বৈষ্ণবগণকে প্রেমালিঙ্গন করতঃ 'গোপী, গোপী' বলিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন। ভাবাবেশে প্রভুর বিহ্বলতা ও রোদন দর্শনে শচীমাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সংক্রমন উত্তরায়ন দিবসে মাঘ শুক্লপক্ষে গৃহত্যাগ করিবেন বলিয়া তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেদিন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শয্যায় শয়ন করিলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর পাদসম্বাহণ করিতেছেন আর নয়নদ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বর্ষিত হইতেছে। শ্রীমন মহাপ্রভু শয্যায় উপবেশন করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে অলঙ্কার ও আভরনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্রীহস্তে গলায় সুরভি পুষ্পের মালা পরাইয়া দিয়া বলিলেন— —"প্রিয়ে! তুমি গৌরভাবিনী, তুমি কৃষ্ণদাসী, তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তুমি আমাকে সেবা করিয়াছ; কিন্তু ক্ষনিকের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলামনা। তোমার সদগুনের তুলনা নাই। হে মঙ্গলদায়িনে। জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবোদ্ধারনের জন্য তোমার ও আমার এ জগতীতাল আবির্ভাব। প্রিয়ে,! তুমি এই জীবহিতকর কার্য্যে, পরমার্থিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী ও বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সার্থক করো, আমি তোমায় ভুলিবনা"—এই কথা বলিয়া প্রভু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ শয্যা গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে প্রভুর নিদ্রা নাই, নিরন্তর কৃষ্ণনাম ও গোপী নাম মৃদুভাবে জপ করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সে রাত্রিতে যেন যোগমায়া নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন ১৪৩১ শকাব্দে ২৭শে মাঘ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে প্রভু গভীর নিদ্রাভিভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া দেখিলেন—শচীমাতা বাহির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। বুকে হস্ত দিয়া প্রভু পুনঃ পুনঃ শচীমাতাকে বলিতেছেন—"তোমার সকল ভার আমার—আমার"—এই কথা বলিয়া জননীর পদধূলি শিরে গ্রহণ করিয়া শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ

করিয়া সত্বর গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। শচীমাতা জড়প্রায়, অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিবর্ণ নয়নধারায়— বসুমতী সিক্ত, নদীয়ার সকল লোক এমনকি নিন্দুক ও পাষণ্ডী পর্য্যন্ত বিষাদে মগ্ন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে ভাষা নাই—"জননী ডাকেন নিমাই! নিমাই! প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই।" হায়রে! নবদ্বীপ আজ প্রদীপশূন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রতিদিন প্রভাতে কোকিল করে "কুহু কুহু," আজ কেন প্রভাতে কোকিল করে উহু উহু মুহুমুহু শোনা যায়। আজ ভ্রমর ভ্রমরীগন মধুর গুঞ্জন শব্দে গৌর গুণগান করেনা। আজ গাভীগণ তৃণ ভক্ষন করে না। ময়ূর ময়ূরী পেখম তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করেনা। কুন্দমালতী—যুথী প্রভৃতি কাননজাত পুষ্প সমূহ হইতে প্রভাতকালীন শিশির বিন্দু টপ টপ করিয়া পত্র নিকরে ঝাড়িতেছে, দেখিলে মনে হয় প্রভুর বিরহে উহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

এদিকে প্রভু সুরধুনি গঙ্গা পার হইয়া কণ্টক নগরে আগমন করিলে তথায় শ্রীনিত্যানন্দ অবধুত, পণ্ডিত গদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। গয়াধামে গমন করিয়া শ্রীপাদ কেশবভারতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন— দয়া করিয়া সেই উপদেশ দিন যাহাতে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ প্রেমজলে প্লাবিত হইলে হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগন সময় বুঝিয়া হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নয়নদ্বয়ে অবর্ণনীয়, অদ্ভুত শ্রাবনের বারিধারার মত প্রেমের প্লাবন।

"ক্ষণে কম্প, ক্ষনেস্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ভয়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর প্রেমভক্তির দর্শনে প্রেমানন্দে প্রভুকে স্তুতি করিয়া বলিলেন—

"যে ভক্তি তোমার আমি, দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥"

"তুমি যে জগৎ গুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর দেহের কম্পন নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডনে ক্ষৌর কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। শিখা ও চঁচর চিকুরের অন্তর্ধানে ভক্তগণ ও কাটোয়ার ভক্ত-রমনীগণ বিষাদপূর্ণ অন্তকরণে অশ্রু মোচন করিলেন। চতুর্দিকে সুমঙ্গল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীমন মহাপ্রভুর মনোনীত মহামন্ত্র শ্রীপাদ কেশব ভারতী তাহার কর্ণে প্রদান করিলেন। ১৪৩১ শকাব্দে ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু অরুন বর্ণ বসন পরিধান করিলেন। শ্রীমস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, গলায় সুরভি পুষ্পের মালা দুলিতেছে। প্রভুর এক হস্তে দণ্ড, অন্য হস্তে কমণ্ডুল। প্রভু নিবন্তব নিজ প্রেমানন্দে বিভোর। প্রভুর শ্রীবদন কোটীচন্দ্র জিনিয়া শোভা পাইতেছে। কমল লোচন দ্বয় প্রেম বারিতে পরিপূর্ণ। আহা! সন্ন্যাসী রূপের কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। এক্ষণে প্রভুর সন্ন্যাস নাম হইল—'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। শ্রীবেদব্যাস বলিয়াছিলেন যে কোন অবতারে শ্রীভগবান সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন,—এই সেই সন্ন্যাসী ভগবান। তথাহি সহস্রনাম স্তোত্রে—"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠ, শান্তি-পরায়নম॥ ১॥ অর্থাৎ (সেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু) সন্ন্যাসকারী. শম, শান্তো, নিষ্ঠা, শান্তি ও পরায়ণ। অর্থাৎ (মহাভাব পর্য্যন্ত ভাব সকলেরই তিনি আশ্রয়)।

আদিলীলায় শ্রীমন মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্বসহ অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে লইয়া হরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসবে রত থাকেন চব্বিশ বৎসর কাল, আর অবশিষ্ট চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে, গৌড়ে, দাক্ষিণাত্যে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমনাগমন করেন, উহা মধ্যলীলা। আর শেষ লীলায় অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষ লীলায় মধ্য ও অন্তঃ দুই নাম হয়। নীলাচলে অবস্থান সময়ে নিজে আচরণ দ্বারা জীবের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার করেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য গৌড় দেশে প্রেরন করিলেন। এই প্রেমধর্ম্ম বিতরণ কার্য্যে প্রেমময় কলেবর প্রভু

নিত্যানন্দ অবধূত হইতেছেন মূল বা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, পণ্ডিত শ্রীবাস, পণ্ডিত গদাধর, প্রেমের গাগরী শ্রীনরহরি, ঠাকুর হরিদাস, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি অসংখ্য গৌর পার্ষদগণ শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমস্ত গৌড়দেশ তথা বঙ্গদেশ প্রেমে ভাসাইলেন। 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদীয়া ভেসে যায় প্রেমের বন্যায়।'

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার দিন রাত্রিতে ভক্তসঙ্গে কণ্টকনগরে অবস্থান কালে শ্রীমুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সংকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীচৈতন্যদেবে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইয়া সিংহপ্রায় হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইলেন। পরে শ্রীচন্দ্রশেখরকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমণ করিয়া সকলকে বলিলেন যে প্রভু বনে গমন করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণে ভক্তগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন, শচীমাতা জড়প্রায় নির্ব্বাক। অতঃপর সন্ন্যাসী চূড়ামনি হরি হরি ধ্বনি করিয়া পশ্চিম দিকে ছুটিয়াছেন, সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত। আগে শ্রীকেশব ভারতী এবং পশ্চাতে গোবিন্দ। ১৪৩১ শকাব্দে এইভাবে তিনি রমনীয় রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন। ভাব নিধি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌর হরি শ্যামতৃন দর্শনে শ্যামসুন্দর মনে করিয়া আর চরণ ফেলিতে না পারিয়া বলিতেছেন—"বধু। তুমি আমার পদতলে কেন? এখন আমার আর মান অভিমান নাই, এই নদীয়াতেই মিলন হইবে। আবার কখনও নীলাকাশের নীল রঙ দেখিয়া নীলমনি ভাবিয়া ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার কখনও নিজের ছায়াকে কৃষ্ণ মনে করিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া বলিতেছেন—"বধু। আমার জীবন ধন্য, তোমার স্পর্শ আমার হৃদয়ে হর্ষপ্রদান করিতেছে।" এইভাবে রাঢ়দেশ ধন্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পণ্ডিত বক্রেশ্বর যে বনে আছে আমি সেথায় নির্জ্জনে থাকিব।"—এই বলিয়া তিনি পূর্বদিকে গমন করিয়া বলিলেন,—"আমি নীলাচলে চলিলাম"—এই বলিয়া গঙ্গায়

গতিপথ ধরিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া ১৪৩১ শকাব্দে ৪ঠা ফাল্গুন ঠাকুর হরিদাসের ফুলিয়া নগরে গেলেন। প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর গৃহের গঙ্গাঘাটে আগমন করতঃ প্রথমে শচীমাতা চরণ দর্শন করেন। পুত্রের গৃহত্যাগের পর হইতে দ্বাদশ দিবস শচীমাতা উপবাসে আছেন জানিয়া প্রভু নিত্যানন্দ অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া শীঘ্র কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করিতে বলিলেন। তখন প্রভু নিত্যানন্দ সকল ভক্তবৃন্দকে শুভবাণী কহিলেন—

"সত্বর চলহ সবে প্রভু দেখিবারে।
শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে॥"

এই শুভবার্ত্তা শুনিবামাত্র সকল ভক্তগণ আনন্দে অধীর হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শচীমাতার পাকান্ন শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া কৃষ্ণ প্রসাদ শচীমাতা নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্তগণকে পরিবেশন করিয়া নিজে কৃষ্ণ-প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন। ফুলিয়া নগরে সর্ব্বজনকে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩১ শকাব্দে ৬ই ফাল্গুন আগমন করিলে অদ্বৈতপ্রভু তাহার চরণে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়ের আচার্য্য প্রভুকে কোলে লইয়া উভয়েই প্রেমজলে বক্ষ প্লাবিত করিলেন। পরে আচার্য্য নন্দন মহাজ্যোতির্ম্ময় শ্রীঅচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর চরনে প্রনতঃ হইলে তিনি দিগম্বর শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিলেন। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত আনন্দিত ভক্তগণ সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া আচার্য্যের গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহামত্ত নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে হুঙ্কার-গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রদক্ষিন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রভু উল্লাসভরে হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিবার তালে তালে সমস্ত পরিকরগণ হরিধ্বনি সহকারে পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপুরী আজ বৈকুণ্ঠ পুরী হইয়া উঠিল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে সকল

পরিকরগণ ও নদীয়াবাসীগণ করজোড়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবীন সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"আমি কৃষ্ণ, আমি নারায়ন, আমি রাম, আমিই নীলাচলচন্দ্র, আমিই নৃসিংহ। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"এত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন কারনে॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস।
অতএব কলি যুগে আমার প্রকাশ॥"

পরে শ্রীচৈতন্যদেব তুলসীদেবীকে জল প্রদান করিয়া তুলসী ও শ্রীবিষ্ণু মন্দিরকে প্রদক্ষিন করতঃ বিষ্ণু প্রসাদ ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুদ্বয় আর চতুর্দ্দিকে সব ভক্তমণ্ডলী মহাপ্রসাদ পাইলেন; মনে হইল যেন কৃষ্ণ-বলরাম শ্রীবৃন্দাবনে গোপগণ সঙ্গে ভোজন করিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে গমন :—

জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

পর দিন প্রভাতে নবীন সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দকে প্রবোধ দান করিয়াও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩১ শকাব্দে ৯ই ফাল্গুন নীলাচলে চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পণ্ডিত গদাধর, শ্রীমুকুন্দ, গোবিন্দ পণ্ডিত, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তিনি ভক্তসঙ্গে পদব্রজে ভাবাবেশে আটিসার নগরে গমন করতঃ পরম সাধু পণ্ডিত শ্রীঅখণ্ডের গৃহে অবস্থান করিলেন শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বগণসহ তথায় ভিক্ষা করিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীঅনন্ত সাধুকে শুভদৃষ্টি দান করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে ছত্র ভোগে গমন করতঃ তথায় অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে শিবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিয়া হরিকীর্ত্তন করিলেন। তথায় শ্রীরামচন্দ্র খান দোলায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর মহাতেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে দোলা হইতে নামিয়া প্রভুর পদে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরহরি হাহা! জগন্নাথ! বলিয়া ক্রন্দন করিলে সকল লোকের হৃদয় বিগলিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র খানের ব্যবস্থায় নৌকাযোগে প্রয়াগের ত্রিবেনী সঙ্গমে গমন করিলেন। তিনি গণসহ উৎকল প্রদেশের ওড্রদেশে গমণ করিয়া তথায় স্নান-করতঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরের স্থাপিত মহেশ বিগ্রহকে নমস্কার করিলেন। নিরন্তর প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম, দিবারাত্রি নামসুধারসে বিহ্বল। শ্রীচৈতন্যাবেশে প্রভু নিত্যানন্দ মত্ত হইয়া কখনও রোদন, কখনও হুঙ্কার করেন। সুবর্ণরেখা স্থানে আগমন করিলে শ্রীজগদানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড রাখিয়া তাহার জন্য ভিক্ষা করিতে গেলেন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীহস্তে দণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডের সহিত লীলার কথা বলিতেছেন—

"অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে॥
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিনখণ্ড॥" চৈঃ ভাঃ

তিনখানা ভাঙ্গা দণ্ড দর্শন করিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন —"এ দণ্ড ভাঙ্গিল কে? প্রভু নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন—যাহার হস্তে দণ্ড ছিল, সেই ভাঙ্গিয়াছে আর কে?

"আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিয়া আপনে।
তার দণ্ড ভাঙ্গিতে কে পারে অন্যজনে।" চৈঃ ভাঃ

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন —

"প্রভু বোলে সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ॥ চৈঃ ভা:

পরে পুনঃ বলিলেন—

"মোর দেহ হইতে নিত্যানন্দের দেহ বড়।
সত্য সত্য সভারে কহিলু এই দৃঢ়॥" চৈঃ ভাঃ

ঐ রাত্রিতে জলেশ্বরে অবস্থান করিয়া পরের দিন রেমুনার গ্রামে প্রবেশ করিলেন। এখানে নিজমূর্ত্তি গোপীনাথকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রেমুনার গোপীনাথ জিউকে 'ক্ষীরচোরা' গোপীনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোপীনাথ স্বয়ং প্রেমময় কলেবর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবগণ সহ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত নগর যাজপুরে গমন করিলেন। তথায় মহানদীর জলে স্নান সমাপন করিয়া সাক্ষীগোপাল স্থানে গমন করিলেন। শ্রীমূর্ত্তির লাবণ্য দর্শনে তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া প্রেমজলে দেহ প্লাবিত করিলেন। অতঃপর, ভুবনেশ্বরে গমন করিয়া বিন্দু-সরোবরে স্নান করতঃ শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিলেন :—

যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নিত্য করে শিব বিদ্যমানে॥ চৈঃ ভাঃ

আঠার নালায় গমন করিলে শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুকে আগে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পণ্ডিত গদাধর, পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দদত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চাতে গমন করিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতঃ শ্রীজগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে গেলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মন্দিরে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তখন মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরের সেবক (পড়িছা) শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রহার করিতে গলে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম নিবারণ করিলেন। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম নবীন সন্ন্যাসীর মহাতেজময় মূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দেহের অষ্টসাত্ত্বিক প্রেম বিকার দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগের সময় উপস্থিত। শ্রীমন মহাপ্রভু তখনও মূর্চ্ছিত, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, উদরও স্পন্দিত হইতেছে না। তখন পণ্ডিত সার্ব্বভৌম নিজ শিষ্যগণ ও পড়িছা দ্বারা মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে অতি পবিত্র স্থানে শয়ান করাইলেন। তাহার দশা দর্শন করিয়া পণ্ডিত সার্ব্বভৌম চিন্তিত হইলেন। নাসিকায় তুলা ধাবণ করিলে তুলার ঈষৎ সঞ্চালন দর্শনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ইহা অবিরূঢ় মহাভাবের সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার। ইহা প্রাকৃত মানবদেহে আবির্ভাব হয় না। এই সময় নদীয়াবাসী বিশারদের জামাতা, গৌরতত্ত্ববেত্তা ও গৌরভক্ত শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বপরিচিত শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যকে নমস্কার করিলে তিনি শ্রীমুকুন্দ দত্তকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়া শ্রীআচার্য্য নমস্কার করিলেন। সকল ভক্তগণ শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ পুত্র শ্রীচন্দনেশ্বরের সহিত সকল গৌরভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে পাঠাইলেন। সকল গোড়ীয় ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে আনন্দিত। প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে অস্থির হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে সুস্থির

করিলেন। সেবকগণ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পরিবেশন করিলে সকলে মিলিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীমন মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে শ্রীচৈতন্যদেব তৃতীয় প্রহরে চৈতন্য পাইয়া হরিহরি বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন শ্রীসার্ব্বভৌম পদধূলি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যাহ্ন করিতে বলিলেন। তিনি সমুদ্রে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম আপন হস্তে স্বর্ণ থালায় শ্রীমহা-প্রসাদ পরিবেশন করিলে ভক্তসঙ্গে তিনি আনন্দে ভোজন করিলেন। তারপর শ্রীসার্ব্বভৌম ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব বার্ত্তা গ্রহণ করিলেন শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে বললেন বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, অতএব পণ্ডিত সপ্তদিবস সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়াইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসার্ব্বভৌমকে কহিলেন —"আপনার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার মন বিকলিত হইয়া পড়িতেছে, আপনি কল্পনা প্রসূত সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে মুখ্যার্থ বাদ দিয়া গৌনার্থ কল্পনা করিতেছে। শ্রীব্যাস-দেবের সূত্রের অর্থ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঝলমল করিতেছে, উহা আপনার কল্পনাপ্রসূত অর্থরূপ মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। যথা—

ষড়ৈশ্চর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তারে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজনবেদে তিন বস্তু কয়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীসার্ব্বভৌম ইহা শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—"বিস্মিত হইবার মত কিছু নাই, কারণ, আত্মারাম মুনিগণও ঈশ্বর ভজনা করেন।" পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তর্কশাস্ত্রানুসারে আত্মারামের নববিধ অর্থ করিলেন। আর শ্রীচৈতন্যদেব আত্মারাম শ্লোকের আদর্শ অর্থ করিলেন। শ্রীপণ্ডিত ইহা শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া

বলিতে লাগিলেন—"আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তোমাকে বেদান্ত পড়াইতে গিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি। তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ" ইহা জানিয়া আত্মনিন্দা করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর শ্রীচরনে শরণ গ্রহন করিলেন। তিনিও কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া পরে নিজমূর্ত্তি সবংশীবদন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখাইলেন ও শ্রীসার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌমের দেহে থরথর কম্পন অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত মধ্যে পরিগনিত হইলেন। ১৪৩১ শকাব্দে চৈত্র মাসে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন।

"নবম পরিচ্ছেদ"

অথ শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যে ভ্রমন ও প্রেমদান

আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়,
তস্মৈ মহাপ্রেম প্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে গমণ করিবেন জানিয়া ভক্তগণ বিষাদিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ভক্তকে দিলেন। কারন তাহার শ্রীহস্তদ্বয় নামের সংখ্যাগননায় বদ্ধ থাকিবে। প্রেমাবেশে অচেতন হইলে কৌপীন, বর্হিবাস, জলপাত্র কৃষ্ণদাস সংরক্ষন করিবেন। শ্রীসার্ব্বভৌমের কাতর বিনয়ে শ্রীচৈতন্য-দেব সার্ব্বভৌম গৃহে কিছুদিন রহিলেন। তিনি ও তাহার স্ত্রী (ষাঠীর মাতা) সহ কিছুদিন মহাপ্রভুকে সেবা করিলেন। ১৪৩২ শকাব্দে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে দাক্ষিণাত্যে গমনের দিন মহাপ্রভুর পাদদেশে শ্রীসার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেও তিনি নিত্যানন্দ প্রভুসহ অন্যান্য

ভক্তগণের সঙ্গে আলাল নাথ পর্য্যন্ত গমণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে 'হরি হরি' ধ্বনির মধ্যে নবীন সন্ন্যাসী নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। পরিধানে অরুন বসন। নয়ন-কমল ও নাসিকা হইতে অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইয়া রমনীয় মুক্তা হারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিত। স্বর্ণ-বিনিন্দিত সুদীর্ঘ দেহে আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় উত্তোলন পূর্বক সংকীর্ত্তন রসে বিহ্বল। তিনি সম্মুখে যাহাকেই দর্শন করেন তাহাকেই প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনামজপ করিতে উপদেশ দেন। সেতুবন্ধের পথে যাইতে যত নগরাদি গ্রামবাসীগণকে হেমদণ্ড বাহু তুলিয়া প্রেমালিঙ্গন করতঃ সমস্ত দক্ষিন দেশ বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন। কুর্ম্মস্থানে যাইয়া স্তুতি করিলে তথায় কুর্ম্মবাসী সকল লোক প্রভুর প্রেমরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া প্রেমাবেশে হরি হরি ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুর্ম্মস্থান হইতে কিছু দূরে বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইতে যে কীড়াভূমিতে পতিত হয়, তাহা হস্তদ্বারা উঠাইয়া পুনঃ গলিত কুষ্ঠের মধ্যে রক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া বাসুদেব তথায় আগমন করতঃ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলে কুষ্ঠ-দেহ দিব্য-দেহে পরিনত হইল। এইভাবে কুর্ম্ম-দর্শন ও বাসুদেব-বিমোচন করিয়া তিনি জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং জয় জয় নৃসিংহদেব, 'জয় জয় প্রহ্লাদ' বলিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেদিন নৃসিংহ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি গোদাবরী তটে গমন করিলেন। গোদাবরীতে স্নান সমাপন করিয়া তথায় তটে উপবেশন করিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীরায় রামানন্দ তথায় দোলায় চড়িয়া আগমন করিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ নবীন সন্ন্যাসীর শত সূর্য্যসম দেহ কান্তি ও প্রেমে তরলিত পঙ্কজ সদৃশ নয়নদ্বয় দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। সন্ন্যাসী সতৃষ্ণ হৃদয়ে তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিলে প্রভু ও ভৃত্য দুহে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। উভয়ে অশ্রু, পুলক, স্বেদ, স্তম্ভ

সমূহ সাত্ত্বিক বিকারে বিবর্ণ ও উভয়ের মুখে গদগদ কৃষ্ণনাম। উভয়ের পূর্ব্ব স্বাভাবিক প্রেমের কথা মনে পড়িল। চৈতন্যযুগের শ্রীরায় রামানন্দ দ্বাপর যুগের বিশাখা সখি, আর শ্রীচৈতন্যদেব রাধাভাব-দ্যুতি সুফলিত শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমন মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের কথোপকথন পূর্ব্বে বর্নিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্যদেব সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করিলে ঐ তীর্থ সমূহ মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে মহাতীর্থ হইল। তিনি মুখে 'রাম, রাঘব, কৃষ্ণ, কেশব' শ্লোক উচ্চারন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশকে স্তুতি করিয়া অহোবল নৃসিংহ স্থানে গমন করিয়া স্তব করিলেন। তারপর, সিদ্ধবটে গমন করিয়া সীতাপতি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। স্কন্দ ক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমল্লো আগমন করতঃ তথায় ত্রিবিক্রম বিগ্রহকে নমস্কার করিয়া পুনরায় সিদ্ধ বট স্থানে গমন করিয়া যে রামভক্ত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন, সে রামভক্ত ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ করেন। রামভক্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন।

বাল্যবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
'সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ' ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল। চৈঃ চঃ

তাহাকে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধ কাশীতে গমন করিয়া শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তিনি তথা হইতে কিছু দূরে ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এক গ্রামে গমন করিলেন। গোসাঞির প্রেমময় ও প্রেমবিহ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইতে লাগিল। তথায় তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদীগণ, বহুশাস্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাস করেন। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ শাস্ত্রের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সকল শাস্ত্রবিদগণের মতাদর্শকে খণ্ডন করিয়া সর্ব্বত্র বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এইভাবে প্রায় সকলেই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণব হইলেন। এক বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে তর্ক আরম্ভ করিলে

দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তিতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলে সর্ব্ব দার্শনিক পণ্ডিতগণ পরাজয় ববণ করিলেন। এরপর ঐ বৌদ্ধাচার্য্য কুমন্ত্রণা করিয়া অমেধ্য অন্ন 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া একটা বড় থালায় শ্রীচৈতন্যদেবেব সম্মুখে রাখিলেন; বৃহদাকার একটি পক্ষী চঞ্চুতে করিয়া উহা লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের শিরোদেশে নিক্ষেপ করিল। থালার কাঁধার তীক্ষ্ণাঘাতে তাহার মাথার অনেকটা কাটিয়া রক্তপাত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। ইহা দর্শন করিয়া হাহাকার করিয়া সব শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া সকল বৌদ্ধগণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কট অঞ্চলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিপদীতে আগমন করিয়া শ্রীরাম-মূর্ত্তিকে স্তব-স্তুতি করিলেন। তিনি পানানরসিংহ স্থানে গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শনে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবকাঞ্চি গমন করিয়া শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিষ্ণু কাঞ্চিতে গিয়া তথায় লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহকে স্তব করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিলে বিষ্ণুকাঞ্চিবাসীগণ সন্ন্যাসীর প্রেমাবেশে নৃত্য দর্শন করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি দুই দিন অপেক্ষা করিয়া বহু লোককে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। পরে, পক্ষীতীর্থে গমন করিয়া শিবকে নমস্কার করিয়া বৃদ্ধকোলতীর্থে শ্বেত বরাহমূর্ত্তিকে নমস্কার করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব পীতম্বর শিবস্থানে শিবকে নমস্কার করিয়া গোসমাজ-শিব দর্শন করতঃ বেদাবন স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তারপর শিবমূর্ত্তি দেখিয়া পাপনাশন স্থানে গিয়া শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। ১৪৩২ শকাব্দে আষাঢ় মাসে শ্রীচৈতন্যদেব রঙ্গক্ষেত্রে গমন করতঃ তথায় কাবেরীতে স্নান সমাপনান্তে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহকে বহুস্তব ও স্তুতি করিয়া তথায় হরি হরি ধ্বনির মধ্যে শ্রীগৌরহরি প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন। সকল লোক মহাপ্রভুর সুন্দর হেমাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত

হইলেন। তথায় শ্রীগোপাল ভট্টের পিতা শ্রীবেঙ্কট ভট্ট প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে গমন করতঃ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই পাদোদক পান করিলেন। তখন চাতুর্মাস্যের সময় উপস্থিত। শ্রীবেঙ্কট ভট্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে কহিলেন—"আপনি দয়া করিয়া এই চারিমাস আমার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথা আলাপনে আমার ভববন্ধন খণ্ডন করুন।" মহাপ্রভু রাজী হইলেন। প্রত্যেক দিন কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ মূর্ত্তি দর্শন করেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তথায় প্রেমাবেশে প্রতিদিন নৃত্য করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের সুদীর্ঘ দেহে অপরূপ সৌন্দর্য্য ও ভাবাবেশে নৃত্যের শ্রবণে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক কৃষ্ণভক্ত হইলেন দেখিয়া লোকসব আনন্দিত হইলেন। তথায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই চারিমাসে প্রত্যেকের গৃহে একদিন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তথায় এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব শ্রীমদভগবত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় অশুদ্ধ ভাবে পাঠ করেন বলিয়া লোকগণ উপহাস করেন। কিন্তু যতক্ষণ শ্রীমদগীতা প্রেমাবেশে পাঠ করেন ততক্ষণ শ্রীঅর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আপনি শ্রীমদগীতা অধ্যয়নের সময় শ্যামলসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পান, অতএব আপনারই শ্রীমদগীতা অধ্যয়নের অধিকার আছে।" অপরদিন. তিনি হাস্যপরিহাসে, সখ্যভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীবেঙ্কট ভট্টকে কহিলেন ঃ

"প্রভু কহে ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানী।
কান্ত বক্ষস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥" চৈঃ চঃ

শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীঠাকুরানীর মন হরণ করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। পূর্ব্বে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের অভিমান ছিলো শ্রীনারায়ণই আদি এবং লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা সর্ব্বোপরি। শ্রীমন মহাপ্রভুর বাক্য

শ্রবণে সেই অভিমান স্তিমিত হইল। "শ্রুতি পায় লক্ষ্মী-নাপায় ইথে কি কারণ ?" ইহার উত্তরে শ্রীমন মহাপ্রভু বলিলেন—"শ্রুতিগণ গোপীর অনুগা হইয়া রাগমার্গে ভজন করিয়াছিলেন, ব্যুহান্তরে গোপী-দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবেঙ্কট ভট্ট কহিলেন :—

"এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ কহিল প্রভু মোরে কৃপা করি। চৈঃ চ:

শ্রীচৈতন্যদেব অশ্রুসিক্ত বেঙ্কট ভট্টকে অনেক যত্নে বিদায় দিয়া ঋষভ পর্ব্বতে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তুতি নতি করিলেন। তথায় শ্রীপরমানন্দ পুরীকে দর্শন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান কবিয়া শ্রীপবমানন্দ পুরী নীলাচলে গমন করিলেন, আব শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশৈলে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে শিবতুর্গা দর্শন কবিয়া আনন্দিত হইলেন। তথায় এক বামভক্ত জগমাতা সীতাঠাকুরানীকে রাক্ষস স্পর্শ করিয়াছে শ্রবণে মৃত্যুপণ করিয়া উপবাস করিতেছিলেন ; শ্রীচৈতন্যদেব রাম ভক্তকে বলিলেন——"সীতাঠাকুরানী চিদানন্দ মূর্ত্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা রাবণ তাহাকে স্পর্শ করা দূরের কথা, তাহাকে দর্শন করিতে পারেন নাই। রাবণ 'মায়াসীতাকে' হরণ করিয়াছিলেন তুমি কোন দুঃখ কবিও না "

শ্রীচৈতন্যদেব তাহাকে আশ্বাস দান করিয়া কৃতমালায় স্নান সমাপন করিয়া দুর্ব্বেশনে আসিয়া শ্রীরঘুনাথকে নমস্কার করত মহেন্দ্র শৈলে শ্রীপরশুরামকে বন্দনা করিলেন। অতঃপর সেতুবন্ধে গমন করিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিয়া শ্রীরামেশ্বর দেখিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন ; তিনি চিড়য়তল তীর্থে রাম লক্ষনকে, শিবকাঞ্চিতে শিবদর্শন, গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি পানাগড়ি তীর্থে সীতাপতি চামতাপুরে শ্রীরাম লক্ষণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তিকে নমস্কার ও বন্দনা করিলেন। মলয় পর্ব্বতে শ্রীঅগস্তমুনিকে বন্দনা করিয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর আমলীতলাতে রামমূর্ত্তি মল্লার দেশেতে তমাল কার্ত্তিক বাতাপানিতে শ্রীরঘুনাথ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌর হরি তথায়

রাত্রি যাপন করিলেন। পয়স্বিনী নদীতে তিনি স্নান করিয়া আদি কেশব মন্দিরে যাইয়া শ্রীকেশব মূর্ত্তি দর্শন করতঃ প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন। তথায় বহু ভক্তের বাসস্থান। এখানে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও ধন্য গ্রন্থ (ব্রহ্মসংহিতা) প্রাপ্ত হইয়া প্রভু আনন্দিত হইয়া উহা লিখাইয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দুই দিন পদ্মনাভ মূর্ত্তিকে দর্শন করতঃ জনার্দ্দন মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলেন। তথায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া দুইদিন নৃত্য করিলেন। পয়োষ্ণী গ্রামে আগমন করতঃ শ্রীশঙ্কর নারায়ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শঙ্করাচার্য্যস্থান সিংহারি মঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় মৎসতীর্থ দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রানদীতে স্নান সমাপন করিয়া যেথায় তত্ত্ব বাদীগণ বাস করেন, তথায় মাধবাচার্য্যস্থানে উপনীত হইলেন। তথায় নর্ত্তক বেশে মনোহর উরুপকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমান্মাদি হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথায় তত্ত্ববাদীগণের সহিত শ্রীমন মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনি তত্ত্বাবিদগণকে বলিলেন—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরমপুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা।" চৈঃ চঃ

তত্ত্ববিদগণের দর্প হরণ করিয়া তিনি ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা আসিয়া গোকর্ন শিব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দ্বৈপায়নী সুর্পারিক তীর্থে উপস্থিত হইলেন, তিনি কোলাপুরে লক্ষ্মীদেবী, ক্ষীর ভগবতী, দর্শন করিয়া পাণ্ডুপুরে উপনীত হইলেন। তথার বিঠঠল ঠাকুর দেখিয়া কীর্তনানন্দে নৃত্য করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীকে তথায় দর্শন করিয়া দুইজনে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হইলে পাণ্ডুপুরে এই বিঠঠল ঠাকুর তীর্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জেষ্ট ভ্রাতা বিশ্বরূপ (শঙ্করারণ্য) সন্নাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকাধামে গমন করিলেন। শ্রীবিঠঠল ঠাকুর দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেব কৃষ্ণবেন্নু তীর্থে আগমন করিলেন।

তথায় বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব গ্রন্থ শূর 'কর্ণামৃত' অধ্যয়ন করেন। শ্রীমন মহাপ্রভু কর্ণামৃত গ্রন্থ লিখাইয়া আনিলেন। ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত

ধন্য গ্রন্থদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

"সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততলে বৈকুণ্ঠে চলিল॥" চৈঃ চঃ

তখন স্থানীয় লোক সকল বলিতে লাগিলেন যে সুদীর্ঘকায়, হেমাঙ্গ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত অরুন বসন পরিহিত এক সন্ন্যাসী এ সপ্ততালকে আলিঙ্গন করিলে সপ্ততাল শো শো শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। এখনও সেই তাল বৃক্ষগণের গোঁড়ার মাটীর গর্ত্ত সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতঃপর, তিনি পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটী বনে বিশ্রাম করিয়া নাসিক ত্র্যম্বক ও ব্রহ্মগিরি দর্শনান্তে গোদাবরীতট তীর্থে আগমন করিলেন। তথায় পুনরায় শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন হইল। শ্রীরায় রামানন্দ দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে পতিত হইলে শ্রীমন মহাপ্রভুকে তাহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন। উভয়েই পূর্বকথা মনে করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন শুনিয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন শ্রীরায় রামানন্দ রাজার আজ্ঞা পাইয়া দশ বার দিন পরে নীলাচলে গমন করিবেন জানিয়া শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দে নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে অসংখ্য বৈষ্ণবগনের হরিধ্বনির মধ্যে তিনি আলালনাথে আগমন করতঃ নিজ পার্ষদ গণকে সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে পাঠাইলেন, ১৪৩৪ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে এই বার্ত্তা শ্রবণে প্রভু নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীদামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর সঙ্গে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত আগমন করিলে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম আনন্দ-ক্রন্দনে শ্রীগৌর হরির চরণে পতিত হইলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গণসহ জগন্নাথ দর্শনে গেলে তাঁহার দেহে কম্প পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিচারে বক্ষ ভাসাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকাশী মিত্র আসিয়া

তাঁহার চরণে পতিত হইলে বহু সম্মান করিয়া তাহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গ দিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌমগণসহ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মোরদ্বারে ভিক্ষা' বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের দিব্য দিব্য বহু প্রসাদ আনয়ণ করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুকে গণসহ মধ্যাহ্ন ভোজন করাইলেন। শ্রীচৈতন্য দেবকে উত্তম শয্যায় শয়ান করাইয়া পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তাহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর এই দাক্ষিনাত্য ভ্রমনের কথা শ্রবণ করিলেও প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপর, রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীসার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করিলে তিনি রাজার উৎকণ্ঠার কথা শ্রীচৈতন্য দেবকে বলিলে তিনি কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া বলিলেন

"সন্ন্যাসী-বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী দর্শন সম বিষের ভক্ষণ॥" চৈঃ চঃ

এই কথা শ্রবণে রাজা প্রতাপাদিত্য মর্ম্মাহত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"পাপী ও নীচ ব্যক্তিকে এমনকি জগাইমাধাইকে তিনি কৃপা করিলেন আর আমার মত হীনজনকে কৃপা না করিলে আমি এ জীবন রাখিব না।" শ্রীসার্ব্বভৌম চিন্তিত হইয়া রাজাকে বলিলেন—"আগামী রথ যাত্রার দিন শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যখন পুষ্পোত্থানে প্রবেশ করিবেন তখন তুমি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইবে, কৃষ্ণনাম শ্রবণে তিনি তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দিবেন। শ্রীরায় রামানন্দ তোমার প্রেমগুণের কথা বলিবার পর মহাপ্রভুর মন তোমার প্রতি প্রসন্ন।"

প্রত্যব্দের সময় যখন শ্রীমন মহাপ্রভুর সন্দর্শনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, সত্যরাজ খান প্রভৃতি দুইশত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীধামনীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, তখন রাজা প্রতাপ

রুদ্র তাহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অধীর হইলে অট্টালিকার উপর হইতে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য গৌর ভক্তগণকে পরিচয় করাইয়া দিলে রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"রাজা কহে দেখি আমার হইল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐক্যে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটী সূর্য্যসম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"

শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীস্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় রাজা মহাপ্রভুর কৃপা অবলোকন করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীমন মহাপ্রভুকে বলিলে—"যদি তোমার একটি বহির্বাস রাজাকে দান কর, তবে তোমার শ্রীচরণ মনে ভাবিয়া রাজা প্রাণ রক্ষা করিবেন।" ইহা বলিয়া পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দের নিকট হইতে একখানা বহির্বাস লইয়া শ্রীসার্ব্বভৌমকে প্রদান করিলে তিনি উহা রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা বহির্বাস পাইয়া বহির্ব্বাসকে প্রভূ ভাবিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাজার উৎকণ্ঠা দর্শন করিয়া শ্রীরায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন। তিনি রাজপুত্র সুদর্শন হরি চন্দনকে আনিতে বলিলেন। কিশোর হরিচন্দন আগমন করিলে মহাপ্রভূ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে অশ্রু বিগলিত হইল। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পিতাও মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পাইলেন মনে করিয়া প্রেমাবিষ্ট' হইলেন। সেইদিন হইতে হরি চন্দন শ্রীমন মহাপ্রভুর পরিকর মধ্যে গণ্য হইলেন।

রথ যাত্রার পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডল হইতে আগত ভক্তগণকে সেবা করিবার নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্র পড়িছাগণকে আদেশ দিলেন যে গৌড় হইতে আগত শ্রীমন্ মহাপ্রভু:র ভক্তগণের যেন সেবার কোন

ত্রুটী না হয়। সকল ভক্তগণকে স্বচ্ছন্দ বাসা ও স্বচ্ছন্দ মহাপ্রসাদ দিয়া আপ্যায়ন করিতে বলিলেন। এদিকে গোপীনাথ আচার্য্য, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দূরে অবস্থান করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর বৈষ্ণব মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন আজ তোমার মিলনে আমি পূর্ণ হইলাম। শ্রীবাস, শ্রীবাসুদেব, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীসেন শিবানন্দ, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে তিনি প্রত্যেক ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সকল গৌড় ভক্তগণকে মালা-চন্দন পরাইয়া দিলেন। শ্রীমুরারী গুপ্ত ও ঠাকুর হরিদাস দণ্ডবৎ হইয়া বাহিরে অবস্থান করিলে তিনি শ্রীমুরারী গুপ্তকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে হরি কীর্ত্তন মুখর ঠাকুর হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে গেলে তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুকে বলিলেন ঃ—

"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র কর্ম্ম নাহি আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥" চৈঃ চঃ

অতঃপর, উচ্চ হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীজগদানন্দ সকল বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু মধ্যে উপবেশন করিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন। ভোজনান্তে শ্রীমন মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে মালা-চন্দন পরাইয়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীজগন্নাথ দেবকে ধূপ ও প্রদীপ প্রদান করিয়া ভক্তগণ বেড়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের তাণ্ডব উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ

হইল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এক সম্প্রদায় নিত্যানন্দ প্রভুর এক সম্প্রদায় পণ্ডিত বক্রেশ্বরের এক সম্প্রদায় আর শ্রীবাস পণ্ডিতের এক সম্প্রদায় —এই চারি সম্প্রদায়ে অষ্ট মৃদঙ্গ ও বত্রিশ করতাল। উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন ও নৃত্যের মহামঙ্গল ধ্বনি আকাশ, বাতাস ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোমে উঠিল। সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও উড়িষ্যাবাসিগণ প্রেমাবেশে শিহরিত হইয়া পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমন মহাপ্রভু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। চারিদিকে যত ভক্তগণ নৃত্য করেন, সকলই দেখিতেছেন যে মহাপ্রভু তাহাদের প্রত্যেককে দর্শন করিতেছেন। এইভাবে প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তন ও নৃত্য চলিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গৌরাঙ্গে-পাদ-পদ্মের ভৃঙ্গ হৈয় মধুপান করি॥

শ্রীচৈতন্য দেবের গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন।

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিবস উপনীত। শ্রীমন মহাপ্রভু স্বয়ং গুণ্ডিচা মার্জ্জনের ভার গ্রহণ করিয়া পড়িছাগণকে আজ্ঞা করিলে একশত জলঘট ও একশত সংমার্জ্জনী আনিয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাখিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সকল ভক্তগণকে মালা পরাইয়া চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া শোধিত মর্জ্জনী ও জলঘট প্রদান করিয়া গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন করিতে গেলেন। ভক্তগণ প্রেমোল্লাসে ভোগ মণ্ডপ সহ সকল প্রাঙ্গন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধূলি, কাঁকড় তৃণাদি প্রভৃতি আবর্জ্জনা দূরীভূত হইল। শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সিংহাসন মার্জ্জন করিয়া শতঘট জলে মন্দিরে

মার্জ্জন করিয়া নিজ বহির্বাস দ্বারা মুছিয়া উহা সমুজ্জ্বল করিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি সহকারে আনন্দে প্রাঙ্গণ ও গৃহ মার্জ্জন করিলেন। নৃসিংহ মন্দিরের ভিতর ও বাহির শোধন করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বেদ, কম্প, বৈবর্ন, অশ্রু, পুলক, হুঙ্কারে তাঁহার নয়নদ্বয় ও নাসিকা হইতে পিচকারীর মত জলধারা শ্রীঅঙ্গ প্লাবিত করিয়া শ্রাবনের বারিধারার মত ভক্তগণের দেহ প্লাবিত করিলেন। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রীঅদ্বৈত তনয় শ্রীগোপালকে তিনি নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীগোপাল প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গোপালকে কোলে করিয়া নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া জলের ঝাপটা দিলেও গোপালের চেতনা আসিল না। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তগণ সহ ক্রন্দন করিলে শ্রীমন মহাপ্রভু গোপালের বক্ষে শ্রীহস্ত সঞ্চালন করিয়া "উঠও গোপাল!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। শ্রীগোপাল চেতনা পাইয়া হরিধ্বনি কবিতে লাগিলেন। অতঃপর, ভক্তগণ সঙ্গে জলক্রীড়া করিয়া মহাপ্রভু উদ্যানে ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিলেন। শ্রীবাণীনাথ পঞ্চশত ভক্তগণের (যোগ্য) প্রসাদান্ন, পিঠা পানা লইয়া আসিলেন। পুরী গোসাঞি, মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, পণ্ডিত শ্রীবাস, পণ্ডিত গদাধর শঙ্করারন্য আচার্য্য, রাঘব পণ্ডিত, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, শ্রীসার্ব্বভৌম প্রভৃতি গৌর পার্ষদগণ উদ্যান ভরিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনের পুলিন ভোজনের ন্যায় ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর হরিদাস পরে প্রসাদান্ন পাইলেন। অতঃপর শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে আগমন করতঃ গাঢ় তৃষ্ণাভরে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদন নিরীক্ষন করিলেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা বা 'ধোয়া পাখালা' লীলা সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥

অথ রথযাত্রা উৎসব ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু।

আজ রথযাত্রা। ব্রহ্মমূহুর্তে শ্রীমন মহাপ্রভু গন সহ সমুদ্র স্নান করিয়া পাণ্ড বিজয় দর্শন কবিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য নিজে পারিষদগনসহ গৌরভক্তগণকে পাণ্ড বিজয় দর্শন করান। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলে শ্রীগৌর সুন্দরের সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বর যাত্রা দর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা প্রতাপ রুদ্র স্বহস্তে স্বর্ণ সংমার্জ্জণী লইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের গমনের পথ সংমার্জ্জন করিয়া চন্দন জলে পথ ধৌত করিলেন। উত্তম হইয়া রাজার তুচ্ছ হাড়ির সেবা দর্শন করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। নব সুমেরুসম উচ্চ রথ নানাবিধ শুক্ল চামর, উজ্জ্বল দর্পন নানাচিত্র পট্টবস্ত্র, ঘাগর, ঝালর ও কিঙ্কিণীতে বিভূষিত রথে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা আরোহন করিয়া উপবেশন করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ মনের আনন্দে রথ টানিতে লাগিলে রথ কখনও দ্রুত, কখনও মৃদুমন্দভাবে গমন করেন। ক্ষনে স্থির হইয়া থাকেন, টানিলেও রথ চলেন না। তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে মাল্য ও চন্দনে ভূষিত করিলেন। পরমানন্দ পুরী, ভারতী ব্রহ্মানন্দ, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, ও কীর্ত্তনীয়াগণ, স্বরূপ দামোদর, পণ্ডিত শ্রীবাস প্রভৃতি পার্ষদগণকে মালা-চন্দন পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, ঠাকুর হরিদাস ও পণ্ডিত বক্রেশ্বর এই চারি সম্প্রদায়ের ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমন মহাপ্রভু নৃত্য করেন। পরে মূলকীর্ত্তনীয়া স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে পঞ্চজন দোহারী, যথা—শ্রীনারায়ন, গোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত ও

গোবিন্দানন্দ যেখানে কীর্ত্তন করেন, তথায় আচার্য্য প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস সম্প্রদায়ে গঙ্গাদাস, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশুভানন্দ ও রাম পণ্ডিত যথায় সংকীর্ত্তন করেন, তথায় নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করেন। এইভাবে যথায় শ্রীমুকুন্দ প্রধান কীর্ত্তনীয়া হইয়া বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারী, শ্রীকান্ত বল্লভাদি ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করেন। তথায় ঠাকুর হরিদাস নৃত্যগীত করেন। যথা শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মূল কীর্ত্তনীয়া হইয়া হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব ও দুই সহোদর মাধব ও বাসুদেব সংকীর্ত্তন করেন, তথায় পণ্ডিত বক্রেশ্বর নৃত্য করেন। কুলীন গ্রামের কীর্ত্তন সমাজে শ্রীরামানন্দ, শ্রীসত্য রাজখান নৃত্য করেন। শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ নৃত্য করেন। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় অন্যত্র কীর্ত্তন করেন—তথায় শ্রীনরহরি ও রঘুনন্দন নৃত্য করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় ও পশ্চাতে এক সম্প্রদায় এই সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মৃদঙ্গ ও ছাপান্ন করতাল বাজিতে লাগিল। চতুর্দিকের হরিধ্বনি শ্রবণে আত্মহারা হইয়া সর্ব্ব ভক্তগণ অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করেন। ত্রিভুবন ব্যাপৃত হইয়া সংকীর্ত্তনের উচ্চ মঙ্গলধ্বনি উঠিয়া আকাশ, বাতাস ও নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া পরব্যোমে মিলাইয়া গেল। সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দমঙ্গল ও ছাপ্পান্ন করতালের মধ্যে শ্রীমন মহাপ্রভু হেমদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধ উত্তোলন করিয়া একসঙ্গে এবং এককালে সপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, এবং কখনও তাহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে একমূর্ত্তি কভু বা বহুমূর্ত্তি হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীরাস লীলায় শ্রীবৃন্দাবনে যেমন এক কৃষ্ণ হইয়াও বহু মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রজগোপীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, কলিযুগেও সেই কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গমাধব রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাসলীলার অনুরূপ হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে লীলাশক্তির দ্বারে এক হইয়া বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ইহা দর্শনে বিস্মিত ও বিবশ হইয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের সঙ্গে

ধারাধারি করিতে লাগিলেন। রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে সপ্ত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া নাটুয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীস্বরূপের সঙ্গে শ্রীবাস, রামাই, রঘুনন্দন, গোবিন্দ ঘোষ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব ও গোবিন্দ এই নয় জনকে দিয়া মোট দশ জন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নৃত্য করেন। আরও অনেক সম্প্রদায় চতুর্দিকে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

'নাহং বিপ্রো' এই শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু করজোড়ে শ্রীজগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিয়া সংকীর্ত্তন রসে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে পদতলের মৃত্তিকা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি দেহস্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্পন প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইয়া আছাড় খাইয়া সুবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইলেন। মহাপ্রভুর পশ্চাতে অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবেশে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রসারিত হস্তদ্বয় দ্বারা মহাপ্রভুকে সামলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। হরিদাস ঠাকুর 'হরিবল হরিবল' বলিয়া ভাবাবেগে নৃত্য করিতেছেন। নাটুয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দণ্ড নৃত্যকালে দেহ কখনও গৌর, কখনও বা অরুন বর্ণ, কভু শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় হস্ত-পদের নিশ্চলতা, কখনও ধূলাধূসরিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হয়, নেত্র ও নাসিকার জলে অঙ্গ প্লাবিত, মুখে ফেন ও লালাস্রাব হইতেছে, পরে, তিনি স্বরূপকে নিম্নলিখিত পদ গাহিতে বলিলেন—

"সেই ত পরাণ নাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥"

শ্রীস্বরূপ দামোদর পদ গাহিতে লাগিলে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেব রথোপরি ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি আজানু লম্বিত ভুজ যুগল উত্তোলন করিয়া "যঃ কৌমার হরঃ" এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন। উহার ভাবার্থ:—"যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন সেই চৈত্র মাসের রজনী, সেই বিকশিত মালতী সৌরভ যুক্ত কদম্বকাননের

মৃদুমন্দ সমীরণ, আর আমিও সেই রহিয়াছি, তথাপি সেই রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরত-লীলা বিধানার্থ আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

প্রিয়তমকে আস্বাদন করিবার উপযুক্ত স্থান হইল নির্জ্জন নিরাপদ স্রোতস্বতী নদীর কুল, আবার সেই নদী যদি কুমুদ কল্লার প্রভৃতি জলজ কুসুমাবলীতে সুশোভিতা হয়, তাহা হইলে আস্বাদনের উল্লাস আরও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই শ্রীরাধারাণী কুরুক্ষেত্রে মিলনে বলিয়াছিলেন—"মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি" —অর্থাৎ "আমার মন কালিন্দী তীরবর্ত্তী কুঞ্জ কুটীরে আমার প্রাণকোটী প্রিয়তমকে পাইবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেছে।" কোথায় সে বেতসীকুঞ্জ, কোথায় সেই সুব্যক্ত অলক্তক রঞ্জিত বিবিধ কুঞ্জাবলী, কোথায় সে ময়র-পুচ্ছ চূড়ার পরিলুণ্ঠন, কোথায় সেই বিচ্যুত কাঞ্চি-সমূহ শোভিত শয্যা, কোথায় সে যমুনা পুলিনে মণ্ডলী বন্ধন ক্রমে মহারাসের কণ্ঠ ধরাধরি সুন্দর নৃত্যের চিহ্ন সকল।

শ্রীমন মহাপ্রভু বলরাম ও সুভদ্রা সহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে কুরুক্ষেত্রে মিলনের কথা মনে পড়িলে রাধাভাবে উপরোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে মিলনে শ্রীরাধা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—
"ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সমুদ্রের ৰিন্দু নাহিক এক কন॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥" চৈঃ চঃ

এই সকল পদের অর্থ শ্রীমন মহাপ্রভু রাধাভাবে স্বরূপের অঙ্গে নিজাঙ্গ দিয়া গলা ধরিয়া আস্বাদন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বদনকমল সুন্দর নয়ন যুগল সূর্য্যের কিরনে ঝল মল করিতেছে। শ্রীজগন্নাথদেব মাল্য, অলঙ্কার, আভরনাদিতে বিভূষিত দর্শন করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে প্রেমোন্মাদঝঞাবায়ুর আবির্ভাবে সঞ্চারী স্থায়ী ভাব-পুষ্প সমূহ দেহে প্রকটিত হইয়া কণ্টকী

ফলের ন্যায় হইলেন এবং শ্রীমুখ হইতে ফেন ও লালাশ্রাব হইতে লাগিল।

অতঃপর তিনি রথের পশ্চাতে গমন করিয়া শির দ্বারা রথ ঠেলিলে রথ হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল। সর্ব্বজন বিস্মিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিলেন।

সময় বুঝিয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বেশে আগমন করতঃ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া রহিলেন। নয়ন মুদিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন, তখন নৃপতি নৈপুণ্যে মহাপ্রভুব পাদসংবাহন করিতে থাকেন। শ্রীরাসলীলার "জয়তি তেহধিকং" অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু "বোল বোল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। "তব কথামৃতম" শ্লোক রাজা পাঠ করিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভুরিদা ভুরিদা বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন; কিন্তু তখনও তিনি জানেন না যে কাহাকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে তুচ্ছ হাড়ির সেবা দর্শনে রাজার প্রতি মন প্রসন্ন ছিল। রাজা তাহাকে দৈন্যভাবে বলিলেন—"আপনি আমাকে দয়া করিয়া আপনার ভৃত্যের ভৃত্য করুন।"

"তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাহাঁ না কহিও ইহা নিষেধ-করিল॥ চৈঃ চঃ

অতঃপর তিনি ভক্তগনকে সঙ্গে লইয়া নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া দুঃখিত কাঙ্গাল গণকে ভোজন করাইতে গোবিন্দকে আদেশ করিলেন।

অতঃপর নীলাচলবাসীগণ রথ টানিতে লাগিলেন, কিন্তু রথ চলেনা। রাজা প্রতাপরুদ্রগণসহ মল্লগণকে দিয়া রথ টানিতে লাগিলেন, ব্যর্থ হইয়া মত্ত হস্তীগণকে রথে নিয়োজিত করিয়া অঙ্কুশ-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলে রথ একপদও অগ্রসর হইলনা। শ্রীমন মহাপ্রভু তখন সকল হস্তীগণকে রথ হইতে খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজভক্তগণকে রথের রশি টানিতে দিলেন, আর

তিনি স্বয়ং রথের পশ্চাতে শিরোদেশ স্থাপন করিয়া ঠেলা দিলে রথ 'হড় হড়' করিয়া চলিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে রথ গুণ্ডিচার দ্বারদেশে উপনীত হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতাপ-দর্শন করিয়া 'জয় গৌরচন্দ্র', জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া সমস্ত লোকগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ শ্রীমন মহাপ্রভুর মহিমা ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলে রাজার অঙ্গ প্রেমাবেশে ফুলিতে লাগিল। তখন সেবকগন পাণ্ড বিজয় করিলে শ্রীজগন্নাথ আপন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে মহাপ্রভু গণসহ জলকেলি করেন। পূর্ব্বের মত কীর্ত্তন ও নর্ত্তন সহকারে গনসহ মহাপ্রভু রথাগ্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথ আপন আলয়ে জগন্নাথ মন্দিরে আগমন করিলে পুনঃ শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডবিজয় হইল। রথযাত্রায় এককোটি পট্টডোরী বিনষ্ট হওয়াতে শ্রীমন মহাপ্রভু কুলীন গ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ-খান ও শ্রীরামানন্দ বসুকে পুরাতন ও ছিন্ন পট্টডোরী হস্তে দিয়া বলিলেন—"এইমত পট্টডোরী অতি দৃঢ় করিয়া নির্ম্মান করতঃ প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে প্রদান করিবে।" শ্রীসত্যরাজ খান ও বসু রামানন্দ শ্রীমন মহাপ্রভুর এই সেবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রতি বৎসর এই সেবা-আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

অথ নন্দ মহোৎসব

কৃষ্ণ-জন্ম যাত্রার পরে নন্দ মহোৎসবে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ গোপবেশ ধারণ করিয়া দধি দুগ্ধের পসরা নিজ স্কন্ধে লইয়া মহোৎসব স্থলীতে আগমন করিলেন। শ্রীকানাই খুটিয়া নন্দবেশ ও শ্রীজগন্নাথ মাহিতি ব্রজেশ্বরীর বেশ ধারন করিয়াছেন। মহাপ্রভু পিতা-মাতা জ্ঞানে উভয়কে নমস্কার করিলেন। এই মত শ্রীরাসলীলা দীপাবলী ও উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দর্শন করিয়া সকল ভক্তগণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া একখানা বস্ত্র ও মহা-

প্রসাদ শ্রীবাসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"এই বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ স্নেহময়ী মাতাকে দিয়া আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবে। তাহার সেবা ত্যাগ করিয়া আমি বাতুলের কার্য্য করিয়াছি। একদিন আমার স্নেহময়ীমাতা শাল্যন্ন নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, মোচাঘণ্ট প্রভৃতি আমি যাহা ভালবাসি তাহা গোবিন্দে নিবেদন করিয়া প্রসাদ বক্ষে করিয়া বলেন—"এই প্রসাদ নিমাই ভালবাসে"—এই বলিয়া ক্রন্দন করিলে আমি অতি সত্বর যাইয়া উহা ভোজন করি, মাতা শূন্যপাত্র দেখিয়া পুনরায় রন্ধন করিয়া গোবিন্দে নিবেদন করেন। স্নেহময়ী জননীর সেবা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজ প্রেমধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছি।"—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হইল মন॥"

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ৮৬ শ্লোকে বলিতেছেন—"সন্ন্যাসী কপটং নৌমি গৌরাঙ্গম"—অর্থাৎ শ্রীমদ ভাগবতে 'ছন্নকলৌ'—ইত্যাদি বাক্যানুরূপ সন্ন্যাসীর কপট বেশে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া শ্রীগৌরহরি নৃত্য করিতেন। 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি মহাভারতোক্ত পদ্য সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—"তিনি সন্ন্যাসী কপট।" ইহার বাস্তব অর্থ হইল—সন্ন্যাসী শব্দে পরমহংস, তাঁহাদের মস্তক 'ক' শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহাতে স্থিতপট বা শিরোভূষণ স্বরূপ যিনি তিনিই সন্ন্যাসী কপট, অর্থাৎ সর্ব্বদা তাহাদের সেব্য। শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেন—"ভক্তিহীন সর্ব্বক্রিয়া গর্ব্বয়েব ভবন্তি।" শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং—এই শ্লোকে ভক্তিহীন যোগ নিয়মাদি, অষ্টাঙ্গ যোগ, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে লাভ করিতে পারেনা। বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ না হইলেও যুক্ত বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"জ্ঞান কর্ম্মে যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেম রস॥"

মনে হয় সেই নিমিত্ত অতি গূঢ় নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী কপটের দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণের প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন দিয়া শ্রীগৌর হরি অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন। ভক্তগণ ও ভগবানের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ব্যাথিত চিত্তে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ প্রতোক প্রত্যব্দে দ্বাদশ বৎসর রথ যাত্রার পূর্ব্বে গৌর ভক্তগণ আগমন করেন ও জন্মাষ্টমীর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর একদিন পণ্ডিত সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরহরিকে বারমাস তাহার গৃহে ভিক্ষা করিতে বলিলে শ্রীগৌরহরি পঞ্চদিনের ভিক্ষায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম গৃহিনী (ষাঠির মাতা) অনেক যত্নে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি, পিঠা, সঘৃত পরমান্ন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া নিবেদন করিলে—শ্রীসার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ (ষাঠীর পতি) বলিলেন—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশবার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥" চৈঃ চঃ

এইকথা শ্রবনে শ্রীসার্ব্বভৌম এক দণ্ড হস্তে অমোঘকে মারিতে গেলেন। ষাঠীর মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আজই ষাঠি রাঁড়ি হইয়া যাউক। সেই রাত্রিতে অমোঘ পলায়ন করিলেন। পরের দিন প্রত্যুষে সে বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইল। শ্রীগোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভু-কে বলিলেন যে সেই দিন হইতে স্ত্রীসহ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম উপবাসে আছেন এবং অমোঘ বিসুচিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরনাপন্ন। কৃপাময় শ্রীমন মহাপ্রভু ইহা শ্রবণ করিয়া অমোঘের স্থানে আগমন করতঃ তাহার বুকে শ্রীহস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন—"অমোঘ! তুমি উঠ, কৃষ্ণনাম কর তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন।"

"শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল।" চৈঃ চঃ

এইভাবে মহাপ্রভু অমোঘকে কৃপা করিলেন। অমোঘ নিজ গালে

চাপড় দিয়া গাল ফুলাইয়া দিলে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য তাহার হস্ত ধারন করিলেন।

অতঃপর শ্রীমন মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া ১৪৩৬ শকাব্দে ৺বিজয়া দশমীর দিনে তিনি গৌড়দেশে স্নেহময়ী জননী ও জাহ্নবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তাহার সঙ্গে পুরী গোসাঞি, স্বরূপ দামোদর, পণ্ডিত জগদানন্দ, গোবিন্দ শ্রীমুকুন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাসঠাকুর. পণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ চলিলেন। তিনি নৌকাতে নদী পার হইয়া কটকে আসিলেন। তথা হইতে রেমুনারে আগমন করতঃ রায় রামানন্দকে বিদায় দিলেন। ভূমিতে পড়িয়া রায় রামানন্দ মুর্চ্ছিত হইলে তিনি রায় রামানন্দকে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তারপর ওড্র দেশের সীমা পার হইয়া নৌকা যোগে পানিহাটিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রাতঃকালে কুমার হট্ট আগমন করতঃ ক্রমে শ্রীনিবাস, সেন শিবানন্দ, বাসুদেব, বাচস্পতি গৃহে আগমন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় দর্শন করতঃ ফুলিয়ায় আগমন করিয়া শ্রীমাধব দাসের গৃহে সপ্তদিবস অবস্থান করিলেন।

তথায় লক্ষ লক্ষ লোকগণকে কৃপা দৃষ্টি বর্ষন করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে আগমন করিলেন। তথায় চারিদিন অবস্থান করিয়া শচীমাতাকে আনয়ণ করিয়া জননীর সেবা করত :—তিনি শচীমাতার দুঃখ ও বেদনা ঘুচাইলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত গৃহে অবস্থান করেন, তখন শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে পরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

শ্রীরঘুনাথ দাস দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া রজনী যোগে গৃহত্যাগ করিলে পিতার লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। পুনঃ পুনঃ এইভাবে পলায়ন করিলে তদীয় মাতা তাহার পিতাকে বলিলেন—"পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া"—তদুত্তরে পিতৃদেব বলিলেন – যে যাহাকে ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম স্ত্রী বর্দ্ধন করিতে পারিল না, তাহার সামান্য

রজ্জুর বন্ধনে কিভাবে রক্ষা করা যাইবে? সত্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের পাগলকে কেহ গৃহে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই তিনি শ্রীরঘুনাথকে আদেশ করিয়াছিলেন—

"গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমাণী মানদ সদা কৃষ্ণনাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥" চৈঃ চঃ

পানিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—

"দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গনে।
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ মনে॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য গৌর পার্ষদগণ শ্রীরঘুনাথকে কৃপা করিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের হস্তে রঘুনাথকে দিয়া তাহাকে সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিতে বলিলেন। সেইদিন হইতে শ্রীরঘুনাথ 'স্বরূপের রঘুনাথ' হইলেন। কৃপা প্রাপ্ত শ্রীরঘুনাথ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম যুবতী পত্নীকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ-লক্ষের অধিপতি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে—কৌপীন-কণ্ঠাধারী ভিখারীর বেশ।

আবার দেখুন, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে সমাসীন নবাব হুশেন শাহের রাজমন্ত্রীদ্বয় শ্রীরূপ—সনাতন বৃক্ষতলবাসী মাধুকরী বৃত্তিধারী ভিখারীর বেশ। পূর্ণ বিলাস বৈভবের মধ্যে সংলালিত হইয়াও 'সর্ব্বশ্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়। যথা—

"যার লাগি ঝুরি ঝুরি রূপ-সনাতন,
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
যার গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ দাস।
রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়ি কৈল রাধাকুণ্ডে বাস॥"। চৈঃ চঃ

শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহ ত্যাগের পূর্ব্বে দুরূহ বিষয় ও রাজকার্য্য পরিচালনার মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ে অসংস্পৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরির লীলাস্মরণাদিত পরমাবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা অনাহারে,

অনিদ্রায়, ছিন্নকন্থা মাত্র অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক রাগানুমার্গের মহাঋত্বিক রূপে যুক্ত বৈরাগ্য ওপ্রেমভক্তির সুমহান আদর্শ তাহাদের জীবনে প্রকটিত করিয়া সাধক জগতে এই শিক্ষা দিলেন যে যুক্ত বৈরাগ্য ও ভক্তির সাধন অতীব প্রয়োজনীয়,—অর্থাৎ ভক্তির সাধনই মুখ্য, বৈরাগ্য-বিদ্যা অনুসঙ্গে আবির্ভূত হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হইল 'সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পরিপাটী নহে'—এই কথা প্রহেলীর মত শ্রীসনাতনের মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি একেলা যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পণ্ডিত গদাধর প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন—

"তুমি যাহা রহো সেই হয় বৃন্দাবন।
তাহা যমুনা গঙ্গা তাহা সর্ব্বতীর্থগণ॥" চৈঃ চঃ

পণ্ডিত গদাধর বলিলেন—"এক্ষনে-বর্ষা সমাগত। বর্ষার এই চারি-মাস নীলাচলে অবস্থান করুন। পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।" ইহা শ্রবনে রাজা প্রতাপরুদ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অথ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীস্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা লইয়া ইং ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কটক দক্ষিণে রাখিয়া তিনি বনপথে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর আজানুলম্বিত ভুজ-যুগল উত্তোলন করিয়া

প্রেমাবেশে কৃষ্ণগুণ গান করিয়া চলিয়াছেন। পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর সকল মহাপ্রভুর শ্রীবদন দর্শন করিয়া পথ ত্যাগ করিতে লাগিল। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া ভীত হইলেন। একদিন অরণ্যপথে যাইতে একটি ব্যাঘ্রের লেজে মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ হইলে তিনি কহিলেন—

"প্রভু কহে 'কৃষ্ণকহ' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥" চৈঃ চঃ

আর একদিন তিনি নদীতে স্নান করিতে গেলে মত্ত হস্তীযূথ তথায় জলপান করিতে আসিল। তিনি জলে মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে হস্তীযূথ তাহার সম্মুখে আসিলে তিনি শ্রীহস্তে জল লইয়া 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়া হস্তীযূথকে জল নিক্ষেপ করিলেন। তখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া হস্তীযূথ প্রেমে নাচিতে লাগিল। কোন হস্তী ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়, কোনও হস্তী চীৎকার করিয়া কৃষ্ণ গুণ গায়। পথে যাইতে মহাপ্রভুর মধুর কণ্ঠের উচ্চ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মৃগকুল তাহার উভয় পার্শ্বে নাচিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব শ্রীমদ্ ভগবতের এক শ্লোক (১০।২১।১১) পাঠ করিয়া হরিন গনের মস্তক দেশে শ্রীহস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক আদর করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পাঁচ-সাত ব্যাঘ্র আসিয়া মৃগকুলের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া তাহার বৃন্দাবন স্মৃতি মনে পড়িলে শ্রীমদ্ ভাগবতের (১০।১৩।৬০) শ্লোকটি পাঠ করিলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিলে তাহার নৃত্যের তালে তালে ব্যাঘ্র ও মৃগকুল একত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য দূরে রহিয়া ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র ও মৃগ সকল একে অন্যকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরে মুখচুম্বন করিতে লাগিল। কৌতুক রঙ্গ দর্শন করিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে ময়ুর ময়ুরীগণ আনন্দে মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। ঝারিখণ্ড পথে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিলে তরু-

লতাগনের শিহরন জাগিল। স্থাবর জঙ্গমে তাহার উচ্চ-কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইলে তাহারা প্রফুল্লিত ও ঈষৎ বিগলিত হইল। পথে বন্য শাক, মূল ফল প্রভৃতি তুলিয়া শ্রীবলদেব ভট্টাচার্য্য যত্নে উহা সংরক্ষন করেন। ভ্রমনকালে পাঁচ সাতজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রন করেন। কেহ দুগ্ধ, কেহ বা দধি, ঘৃত আনিয়া শ্রীবলদেব ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রদান করেন। বন্য শাক মূল ও অন্ন রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি উহা হর্ষভরে ভোজন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবলভদ্র ভট্টকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"তোমার জন্য বনপথে নির্জ্জনে এত সুখ পাইলাম।" তদুত্তরে শ্রীবলভদ্র বলিলেন—"আমি অধম জীব আর তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়া আমার হস্তে ভিক্ষা করিলা, এই অধম কাককে তুমি গরুড় সমান করিলা বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। তথাহি শ্রীমদ্ ভাগবতে—

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘায়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমুহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে এই মত কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে আনন্দে কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। তথায় শ্রীতপন মিশ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া চরণে পতিত হইয়া রোদন কবিতে লাগিলে, মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি শ্রীগৌরহরিকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পরে শ্রীবিন্দুমাধবকে দর্শন করিলেন। শ্রীবলভদ্র শ্রীমিশ্রের গৃহে রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। তিনি শয়ন কবিলে মিশ্রপুত্র রঘু মহাপ্রভুব পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীচন্দ্রশেখর তথায় আগমন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমিশ্র গৃহে তিনি দশদিন রহিলেন। একদিন এক বিপ্র শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধবের রূপগুন বলিলেন। তাহার কাঞ্চনবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর, আজানুলম্বিত ভূজদ্বয়, কমল নয়ন, প্রভৃতি ঈশ্বরের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত এক সন্ন্যাসী নীলাচল হইতে

আসিয়াছেন, দেখিলে মনে হয় তিনি স্বয়ং নারায়ণ। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তার গায়।
নেত্র যুগে অশ্রুজল গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষনে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন,
ক্ষনেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গর্জ্জন॥"

এই কথা শ্রবণে প্রকাশানন্দ সরস্বতী হাস্য উপহাসে বিপ্রকে বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি গৌড় দেশের শ্রীচৈতন্য নামে কেশব ভারতীর এক শিষ্য হরি সংকীর্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। সেই প্রতারক এমন মোহন বিদ্যা জানে যে লোকগণ তাহাকে ঈশ্বব করিয়া মানে। শুনিলাম শ্রীসার্ব্বভৌম মহাপণ্ডিত ও তাহার সঙ্গে পাগল হইয়া আত্মসমর্পন করিয়াছেন। বেদান্ত শ্রবণ কব ঐ ঐন্দ্রজালিকেব ভাবকালি কাশীতে চলিবে না।"

শ্রীপ্রকাশানন্দের উক্তির শ্রবণে দুঃখিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবেব নিকট আগমন করতঃ বিপ্র বলিলেন—"তোমা দেখি জিহ্বা মোব বোলে কৃষ্ণ হরি।" মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

"প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী,
ব্রহ্ম, চৈতন্য, আত্মা এই কহে নিববধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান॥"
নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিনি একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥" —চৈ চঃ

ঐ ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া প্রাতে শ্রীচৈতন্যদেব মথুবায় যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া প্রাতে পথে তিনি বহু লোকজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করতঃ মথুরায় বিশ্রাম ঘাটে আগমন করিলেন। জন্মস্থান ও কেশব মূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর এক শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি গুরুজ্ঞানে বিপ্রকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণ ভয়ে মহাপ্রভুকে প্রনাম করিয়া কহিলেন যে তিনি গোবর্দ্ধনে যে গোপাল দেবকে প্রকট সেবা করিলেন, অদ্যাপিও সেই সেবা গোবর্দ্ধনে হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাকে দেখিতে আসিলেন। শ্রীযমুনার চব্বিশঘাটে স্নান করিয়া দ্বাদশবন পরিক্রমা করিয়া গাভীঘাট চড়ে আগমন করিলে গাভীগণ হুঙ্কার করিয়া প্রভুর অঙ্গ প্রেমাবেশে লেহন করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর নামসংকীর্ত্তন শ্রবন করিয়া মৃগ ও মৃগীগণ তাহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষন করিয়া আনন্দে অঙ্গ চাটিতে লাগিল। মৃগমৃগীর পুলক অঙ্গ, নয়নে প্রেমাশ্রু ধারা দর্শন করিয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। শুকশারী, ময়ুর ময়ুরী প্রভুব নৃত্যের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। শুকসারী প্রভুর হস্তে বসিয়া রাধাকৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিল। ময়ুর কণ্ঠ দর্শন করিয়া কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হইলে তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সঙ্গী ব্রাহ্মণ তখন মহাপ্রভুর বহির্বাস জলে সিক্ত করিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গ মুছিয়া বস্ত্র দ্বাবা মৃদুমন্দ বাতাস দিলেন। কর্ণে কৃষ্ণনাম দিলে তিনি হরি হরি বলিয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পথে তরুলতাদি মহাপ্রভুকে পুষ্প বর্ষন করেন, তিনিও তরুলতাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া প্রেমালিঙ্গন প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালে মহাপ্রভুর মন সর্ব্বদা যে প্রেমবিকার হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তিনি শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, কেশিঘাট, বংশীবট, নিকুঞ্জ কানন প্রভৃতি লীলাস্থানে দর্শন করিলেন। সঙ্গে শ্রীগোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ, ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ, শ্রীলোকনাথ, ভূগর্ভ গোসাঞি, শ্রীজীব গোস্বামীপাদ, শ্রীযাদব আচার্য্য, গোবিন্দ গোসাঞি, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমাধব দাস, শ্রীগোপাল দাস, নারায়ণ দাস, গোবিন্দভক্ত, বাণী কৃষ্ণদাস পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীঈশান, লঘু হরিদাস প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে গোবর্দ্ধনে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল জিউকে দর্শন

করিলেন। পথে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, পাঠান ম্লেচ্ছদিগকে কৃপা দৃষ্টিতে বৈষ্ণব করিয়া প্রয়াগে আগমন করতঃ ত্রিবেণীতে মকর স্নান করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ছোট ভাই শ্রীবল্লভকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য দেবের সহিত মিলিত হইলেন। দুই ভাই প্রভুকে দর্শন করিয়া চরণে পতিত হইলে 'উঠ-উঠ' বলিয়া দোহার শিরে চরণ রাখিয়া কৃপা করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া প্রেমোন্মাদে হুঙ্কার করিয়া শ্রীযমুনায় পতিত হইলে লোক সকল আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ লোকের সংঘট্টের জন্য তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে অবতরন করিয়া শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরন করিলেন। কালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তা লুপ্ত লইয়া গিয়াছিল। উহা পুনঃ প্রচারের জন্য শ্রীরূপকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবদর্শন শিক্ষাপ্রদান করতঃ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া বারানসী অভিমুখে চলিলেন। শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভুসঙ্গে মিলিত হইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন নবাবের এক দ্বার রক্ষক ভুইঞাকে সপ্ত মোহর প্রদান করিয়া 'দরবেশ হৈয়া আমি মক্কায় যাইব' —এই কথা বলিয়া হস্তে কড়োয়া, ছিন্ন কন্থা গায়ে দিয়া হাজিপুরে উপনীত হইলেন। হাজিপুর হইতে গমন করিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিলেন, অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু ইহা জ্ঞাত হইয়া শ্রীচন্দ্রশেখরকে বলিলেন—"দুয়ারে এক বৈষ্ণব আছে, তাহাকে লইয়া আইস।" উত্তরে চন্দ্রশেখর বলিলেন—"দুয়ারে বৈষ্ণব নাই, এক দরবেশ আছেন।" তিনি বললেন 'তুমি উহাকেই লইয়া আইস।'

শ্রীচন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় দরবেশকে লইয়া গেলে তিনি সত্বর আবেগে দরবেশ বেশী সনাতনকে আলিঙ্গন দিলে শ্রীসনাতন প্রেমাবিষ্ট হইলেন। প্রভু ও ভক্ত দুই জনে গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি পিণ্ডার উপরে বসাইয়া শ্রীহস্তে সনাতনকে অঙ্গ

সংমার্জ্জন করিলে তিনি বলিলেন—"প্রভো! আমি অস্পৃশ্য পরম পামর, আমাকে স্পর্শ করিও না।"

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন সমাপন হইলে ভুক্তাবশেষ শ্রীতপন মিশ্র শ্রীসনাতনকে পরিবেশন করিলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনকে কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তত্ত্ব, ভক্তিরস তত্ত্বাদি দুই মাস উপদেশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। শ্রীসনাতন কৌপীন পরিধান করিয়া, বহির্ব্বাস ও ছেড়া কন্থা গায়ে দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কৃপা দান :—

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চনদে স্নান করিয়া শ্রীবিন্দু মাধব দর্শন করিলেন। শ্রীমাধবের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে শ্রীচন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন মিশ্র ও শ্রীসনাতন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের হরি হরি ধ্বনি শ্রবনে—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী তথায় শিষ্যবৃন্দ সহ আগমন করিলেন। শিষ্যগণ সন্ন্যাসীর শ্রীবদন দর্শনে ও কীর্ত্তনীয়াগণের ভক্তি গীতি শ্রবণে অশ্রু পুলক ও কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার গ্রস্ত হইল দেখিয়া কাশীবাসিগণ বিস্মিত হইলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে হেরিয়া তিনি তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও শ্রীমন মহাপ্রভুর চরন বন্দনা করিয়া কহিলেন—

"তিঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় গেল॥" চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেব দৃঢ় যুক্তি তর্কে মায়াবাদ শাস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সাধন ভক্তিকে অভিধেয় তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মারাম মুনিগণ ও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, ইহা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে জ্ঞাপন করিয়া 'আত্মারাম' শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ করিলেন। অসংখ্য কাশীবাসিগণ মহাপ্রভুর মুখে একষট্টি প্রকার অর্থ শ্রবণে শ্রীচৈতন্য-

দেবকে ঈশ্বররূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। তারপর সকল কাশীবাসিগণ প্রেমে হাসিয়া কাঁদিয়া নৃত্য করিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিলেন।

"বারানসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার।
বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া নগর।।" চৈঃ চঃ

পরে এই মহাপণ্ডিত শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে ধর্ম্মগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম' প্রনোয়ন করেন।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলের পথে শ্রীসুবুদ্ধি রায়কে কৃপা করিয়া শ্রীবলভদ্রের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ গমনের পথে মৃগ ময়ূরাদি তাহার সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। শ্রীচৈতন্যদেব নরেন্দ্র সরোবরের নিকটে সকল ভক্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পুরী ও ভারতী গোসাঞি দ্বয়কে নমস্কার করিলেন। তিনি পণ্ডিত জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর, ঠাকুর হরিদাস, পণ্ডিত শঙ্কর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীস্বরূপ গোসাঞি শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বার্ত্তা গোড়ীয় ভক্তগণকে জানাইলে শচীমাতা ও নদীয়া বাসিগণ আনন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইলেন। কুলীন গ্রামবাসীগণ, খণ্ডবাসি ভক্তগন, সেন শিবানন্দের সহিত এক কুকুর নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন। তাহারা সন্ধ্যাবেলায় এক ঘাটীতে অবস্থান করিলেন। সেন শিবানন্দের কুকুর ব্যতীত আর সব ভক্তগন প্রসাদ পাইলেন। সেন শিবানন্দ কুকুরকে না দেখিয়া তথায় একদিন রহিলেন। পরদিনও কুকুরকে অন্বেষন করিয়া না পাইয়া ভক্তগন নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরের দিন ঐ কুকুরকে মহাপ্রভুর স্থানে দেখিয়া সেন শিবানন্দ কুকুরের নিকট অপরাধের ক্ষমা চাহিয়া কুকুরকে দণ্ডবৎ প্রনাম করিলেন। তিনি দেখিলেন যে শ্রীমন মহাপ্রভু নারিকেল শস্য কুকুরকে প্রদান করিতেছেন আর ঐ কুকুরটি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উহা গ্রহণ করিতেছেন। আবার কখনও মহা-

প্রভুর পদতল লেহন করিতেছেন। তিনি কুকুরটির মস্তকে শ্রীহস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক আদর করিয়া কুকুরটির বক্ষে হস্তদ্বারা ধারন করিয়া উর্দ্ধ অভিমুখে "যাও বাবা যাও, বৈকুণ্ঠে যাও" বলিয়া নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরটি শন্‌শন্‌ শব্দ করিয়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের পরব্যোমে মিলাইয়া গেল। তৎকালে ব্র্যাজিলের কয়েকজন বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ সন্নিধানে উপবেশন করিয়া তাহার নিকট বৈষ্ণব দর্শন ও সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে ছিলেন। দার্শনিকগণ চারি বৎসর এইভাবে বৈষ্ণব দর্শন শিক্ষা করেন। শ্রীসেন শিবানন্দের কুকুরের কথা ভাবিলে মনে হয় ঐ কুকুরটি কৃষ্ণাবতারের কোন কৃষ্ণভক্ত কলিযুগে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরিকর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত ব্র্যাজিলের ঐ বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ ব্র্যাজিলে গমন করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বীজ বপন করেন। আজ-প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ঐ প্রেমধর্ম্মবীজের অঙ্কুর উদগম হইয়া এক প্রেমধর্ম্মের মহান মহীরূঢ় স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার সুশীতল ছায়ায় সমস্ত ব্র্যাজিল, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা, জার্ম্মানী সহ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের বৈষ্ণবগণ হৃদয়ের যত গ্লানি, দুঃখ ও ক্লান্তি দূর করিয়া এক পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বাদি বিচার করিলে দেখা যায় যে এই ঋক বেদোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সকল ধর্ম্মেরই মূল। সুতরাং এই বিশাল বিশ্বজনীন ধর্ম্মের নীতি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের নীতি। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নহে, ইহা বিরাট বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। বাইবেল, পুরানে, কোরানে, বেদ-বেদান্তে এবং সর্ব্বস্থানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান। সুতরাং সুধী ব্যক্তিগণ উহাকে প্রানসম ভালবাসিয়া এই ঋক-বেদ ও সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হন। ১৯১২ সালে ফাল্গুনী পুর্নিমায় শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৫০০ শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং এতদুপলক্ষে পৃথিবীর ৬২টি দেশের বৈষ্ণব সম্মেলন নদীয়ার মায়াপুরে হইয়াছিল। আজ মনে পড়িতেছে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের অব্যর্থ লেখনীর কথা। যথা—

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিতেছেন :—

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মম নাম॥ চৈঃ ভাঃ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশা

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধুপান করি॥

কোন এক অবর্ণনীয় অবস্থা প্রাপ্ত মোহনাখ্য মহাভাবের কোনও এক অদ্ভুত ভ্রমময়ী বিচিত্রা অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন। ইহাতে উদঘূর্ণা চিত্র জল্পাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ভ্রমময়ী দশাতে এক দেখিতে অন্য পদার্থকে দর্শন করেন। এক শুনিতে অন্য শ্রবণ করেন। এক বলিতে অন্য কথা বলেন, এক ভাবিতে অন্য কথা ভাবেন ইত্যাদি! অন্ত্যলীলায় দ্বাদশ বৎসর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিরন্তর কৃষ্ণ-বিরহ স্ফুর্তি উদয় হইতে লাগিল। শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে দর্শন করিয়া শ্রীরাধারানীর যে সব ভাবের উদয় হইত, রাত্রিদিনে সেইসব ভাবের উদগম প্রভুরও হইতে লাগিল। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চানুসারে পুজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাহার পদধূলি মস্তকের ভূষণ করিয়া ঐ বর্ণনানুসারে লিখিতে প্রয়াসী হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোপীগণের যে দশা হইয়াছিল, মহাপ্রভুর ক্রমে ক্রমে সেইরূপ উন্মাদনা, প্রলাপ বিলাপ দশা হইতে লাগিল। এক রাত্রিতে, গম্ভীরায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে যমুনা পুলিনে কর্পূর সম শুভ্র ও স্নিগ্ধ বালুকারাশির উপরে শ্রীরাসমণ্ডলী বিরোচন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বনমালা মধুর অধরে মুরলী পীতাম্বর পরিহিত, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমভাবে যমুনা পুলিনে 'অষ্ট' সখীর

মাঝে শ্যাম নব জলধরের ক্রোড়ে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী, রসরঙ্গিনী, বিদ্যুৎ বরণী শ্রীমতী রাধিকা অচলা চপলার ন্যায় ঝলকে ঝলকে বিজুরী সঞ্চার করিয়া রাসমণ্ডলীর মাঝে কৃষ্ণসহ নৃত্য করিতেছে। এমনই সময়ে গোবিন্দ মহাপ্রভুর বিলম্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকে জাগাইলে তিনি দুঃখিত ও বিষাদিত হইলেন। তিনি দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত সমাপন করিয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব গড়ুরের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতেছে, এমন সময় এক উড়িয়া মহিলা সহস্র সহস্র লোকের ভিড়ের মাঝে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে না পারিয়া প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া গড়ুরে উঠিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ঐ স্ত্রীকে নিষেধ করিতে গেলে মহাপ্রভু বলিলেন—

"আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আহা! ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐচ্ছে আমার বা হয়।" চৈঃ চঃ

শ্রীমনমহাপ্রভু সর্ব্বত্র মূরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। পদনখে ভূমিতে লিখিতেছেন, নেত্রদ্বয়ে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ, প্রাণনাথ মূরলীবদনকে পাইয়াও হারাইলাম বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় করুণ ক্রন্দন, নৃত্য-গীত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ অদর্শনে শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ গোসাঞির কণ্ঠ ধারণ করিয়া হায় হায়! হরি হরি! বলিয়া 'প্রাপ্তধন হারাইলাম' বলিয়া বিলাপ করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন মহাপ্রভুর দশ দশা

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে শৃঙ্গার ভেদ কথনে (৬৫) শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ইষ্টলাভার্থ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুতা, অঙ্গমালিন্য, অসংবদ্ধ ভাষণ, রোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও স্পন্দনরাহিত্য—এই দশটিকেই দশ দশা কহে। এই দশ দশায় প্রভুর রাত্রিদিনে ব্যাকুল, বাহ্যজ্ঞান রহিত। শ্রীরায় রামানন্দ দশা বুঝিয়া শ্লোক পড়িলেন, শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপাদ কৃষ্ণলীলা গান করিলে প্রভু মৌন হইলেন। শ্রীরায় রামানন্দ অর্দ্ধরাত্রি জাগরণ করিয়া গম্ভীরার ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইয়া নিজগৃহে গেলেন। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ও শ্রীগোবিন্দ বহির্দ্বারে শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহাপ্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছেন। সহসা কীর্ত্তনের শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপ গোসাঞি দরজা খুলিয়া দেখিলেন—তিন দ্বার অর্গলবদ্ধ, মহাপ্রভু ঘরে নাই।

প্রভুর অদর্শনে সকলেই চিন্তাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে দেখিলেন যে সিংহদ্বারের উত্তর দিকে শ্রীচৈতন্যদেব পড়িয়া আছেন।

প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসা শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্তপদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তাল নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী পাদ উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান

করিলে হরিবোল ধ্বনি করিয়া প্রভু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চেতনা পাইলে আপনা হইতেই অস্থি সন্ধিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দেহ প্রকাশ পাইল। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীপাদ ইহা চৈতন্যস্তবক কল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধুপান করি॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যিনি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মূরলীধ্বনি শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইলেন; যাহার কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গম, প্রতি রোমে প্রস্বেদ ও রুধির ধারা প্রবাহিত হইয়া কণ্ঠ ঘর্ঘর করিতে লাগিল, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া শ্বেতাকার ধারণ করিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ ধূলাকণা প্রার্থনা করি।

অন্য একদিন প্রভু সমুদ্রে যাইতে পথে চটক পর্ব্বতকে গিরি গোবর্দ্ধন ভাবিয়া হরিদাস বর্য্যো শ্লোক পাঠ করিয়া ঐ চটক পর্ব্বতের দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাৎবেগে ছুটিলেন। এদিকে শ্রীস্বরূপ গোসাঞি, পণ্ডিত গদাধর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীরামাই, শ্রীনন্দাই, নীলাই, পণ্ডিত শঙ্কর, পুরী ও ভারতী গোসাঞি অতি সত্বর সাগরতটে চলিলেন। প্রথমে প্রভু বায়ুগতিতে চলিলেন, পরে স্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিলেন, চলিবার আর শক্তি নাই। প্রত্যেক রোমকুপের মাংস ব্রনের আকার ধারণ করিল, ঐ ব্রনের উপর আবার কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গম হইয়া প্রতি রোমে প্রস্বেদ ও রুধির ধারা ঝরিতে লাগিল। কণ্ঠ ঘর্ঘর করাতে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। নেত্রদ্বয় হইতে যেন গঙ্গা ও যমুনার ধারা সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইল। অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া শঙ্খের ন্যায় শ্বেতাকার ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় দেহে কম্পন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ সত্বর প্রভুর নিকট আগমন করিয়া করঙ্গের জলে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন করিতে লাগিলেন ও বহির্ব্বাসে বীজন করিতে লাগিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুর অবস্থা দর্শন

করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহারা শীতল জলে প্রভুর অঙ্গ সংমার্জ্জন করতঃ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম করিতে করিতে 'হরিবোল' বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন। সকল বৈষ্ণবগণ আনন্দে 'হরিবোল' 'হরিবোল মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। তিনি স্বরূপ গোসাঞিকে বলিলেন—

গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল"। চৈঃ চঃ

গোষ্ঠলীলায় গোচারণে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবর গিরি গোবর্দ্ধনের উপর আরোহন করিয়া মধুর মূরলীধ্বনি করিলেন। রাধা রাধা বলিয়া মূরলীর মধুর ধ্বনি শ্রবণে অবর্ণনীয়া সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীরাধারানী আগমন করিলে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ কেলি করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের গিরি কন্দরে প্রবেশ করিলেন। ললিতাদি সখীগণ পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিতেছেন, এমনই সময়ে কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের মধুর লীলা দর্শন করিতে পারিলাম না বলিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার দশা দর্শন করিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরী গোসাঞি ও ভারতী গোসাঞিকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রমে দোহাঁকে বন্দনা করিলে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। ইহাই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব। এই মত প্রভুর রাত্রিদিনে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে সতত অস্থির। একদিন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার কালে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া তাঁহার বিয়োগ ব্যাথায় শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ও শ্রীরায় রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় যেরূপ কৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্যের কথা ও বিরহ বেদনার কথা শ্রীরাধারানী ললিতা ও বিশাখা সখিদ্বয়কে মরম-কথা বলিতেন সেইরূপ শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ও শ্রীরায় রামানন্দের সমীপে শ্রীচৈতন্যদেব বিলাপ করিয়া বলিতেছেন:—

কাঁহা কর কাহা যাঙ কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কর সে উপায়।

ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, শ্রীগীত গোবিন্দের শ্লোক শ্রীরায় রামানন্দ পাঠ করেন এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপাদ উহার লীলা কীর্ত্তন গান করিয়া প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গোরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি॥

হরিভক্ত শ্বপচ ও হীন জনকে যিনি পরম আদর করিতেন যিনি বৈষ্ণসেবন ও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদনকে উচ্চ সাধনাঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য দেবকে কোটী প্রণাম।

পূর্ব্বের মত বর্ষান্তরে সকল গৌড় বৈষ্ণব গণেনর সহিত শ্রীকালিদাস নামে এক উদার পরম বৈষ্ণব শ্রীমনমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করেন। ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদেব জ্ঞাতি খুল্লতাত। শ্রীবৈষ্ণবের চরণরেণু, পাদ প্রক্ষলিত জল ও উচ্ছিষ্ঠ এই তিনটি বস্তু যে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানে সমর্থ তাহা ইনি প্রকৃষ্ট প্রমান করিয়া গিয়াছেন। কোন জাতীর বিচার না করিয়া তৎকালীন গৌড়দেশের সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন। একদিন বৈষ্ণব শ্রীঝরু ভুঁইমালিকে আম্রফল ভেট প্রদান করতঃ শ্রীকালিদাস তাঁহার নিকট পদরজ ও ভুক্তাবশেষ প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে শ্রীঝড়ু বৈষ্ণব ঠাকুর বলিলেন যে তিনি নীচ জাতি আর আপনি সুসজ্জন রায়, কি করিয়া তাহাকে উহা প্রদান করিবেন? তখন অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকালিদাস যথায় বৈষ্ণব ঠাকুরের পদ চিহ্ন ধূলায় অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই পদরজ লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন ও বাড়ীর নিকট কোথায়ও লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীকালিদাস প্রদত্ত আম্রফল শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন করিয়া ঐ বৈষ্ণব ঠাকুর প্রসাদ পাইলেন ও ভোজনান্তে ঐ আম্রের আঁটিগুলি খোলায় করিয়া এক উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন।

"সেই খোলা আঁটি-চোষা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌরদেশে।
কালিদাস আমি সবার নিলা অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহা কৃপা কৈলা॥ চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, তাহার পূর্ব্বে সিংহদ্বারের উত্তর দিকে পাদ প্রক্ষালন করিতেন। শ্রীকালিদাস মহাপ্রভুর পাদধৌতি জল তিন অঞ্জলী পান করিলে, তিনি বারণ করিয়া বলিলেন যে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর যেন গ্রহণ না করে। শ্রীমন মহাপ্রভু এই পাদ প্রক্ষালন জল কাহাকেও প্রদান করিতেন না, কিন্তু কালিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মহাফলরূপে।

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তভুক্ত শেষ হৈলে মহামহা প্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত পদধূলী আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত ভুক্তাবশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ চৈঃ চঃ
"কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার 'কৈলা' নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃষ্ণা সেই তাহা পায়॥" চৈঃ চঃ

ঐ বৎসর শ্রীসেন শিবানন্দ পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র পুরী দাসকে সঙ্গে আনিলেন। পুরীদাস শ্রীকৃষ্ণনাম হৃদয়ের যথোস্থানে রাখিয়া মনে মনে জপ করিতেন। শ্রীমন মহাপ্রভু কৃষ্ণ কহ বলিয়া পুনঃ পুনঃ পুরী দাসকে বলিলেও তিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন না। এই সাত বৎসরে শিশু শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি

কর্ণরসায়ণ বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ছিলেন ইহা মহাপ্রভুর কৃপাতেই সংগঠিত হইয়াছিল। এই পুরী দাসের জন্ম গ্রহণের পর শ্রীমন মহাপ্রভু তাহার শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষাইয়া ছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গৌরাঙ্গ পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া মধু পান করি॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুব কুর্ম্মাকৃতি

যিনি কাশী মিশ্রের গৃহে অর্গলবদ্ধ দ্বারত্রয় উৎঘাটন না করিয়া তিনটী অতুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক দারুণ হরি বিরহে সঙ্কুচিত দেহে কুর্ম্মবৎ কলিঙ্গ দেশীয় ধেনুমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ প্রভু মদীর হৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়া আমাকে অতুল হর্ষ প্রদান করিতেছেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার পর চলিয়া গেলে শ্রীচৈতন্য দেবের দিবারাত্রি প্রেমাবেশে উন্মাদের মত প্রলাপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। একরাত্রিতে শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ও শ্রীরায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণ-কথা আলাপনে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভু মনের ভাবানুসারে দুইজন শ্লোক পাঠ করেন ও কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করেন। মাঝে মাঝে প্রভু শ্লোক পাঠ করিয়া শ্লোকের অর্থ বিলাপ করিয়া বর্ণনা করেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া দুইজনেই গৃহে চলিয়া গেলেন, শ্রীগোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রায় সমস্ত রজনী প্রভু উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আচম্বিতে কৃষ্ণবেণুগান শ্রবণ করিয়া গম্ভীরার তিনদ্বারে কপাট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সিংহদ্বারের দক্ষিণে যথায় তৈলঙ্গা গাভীসমূহ অবস্থান করে, তথায় আগমন করিয়া প্রভু মূর্ছিত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীগোবিন্দ প্রভুকে না দেখিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী পাদকে জানাইলেন।

তিনি অনান্য ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নানাস্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে তৈলঙ্গ গাভীগণ সমীপে প্রভুকে পাইলেন। তাহারা দেখিলেন প্রভুর পেটের ভিতরে হস্ত-পদ সন্নিবেশিত হওয়ায় তিনি কুর্ম্মের আকার ধারন করিয়াছেন ; প্রভুর মুখ হইতে ফেন ও লালাস্রাব হইতেছে ; শ্রীঅঙ্গে পুলকাদি সাত্বিক বিকার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুধাবা নির্গত হইতেছে। প্রভু বাহিরে কুষাণ্ড ফলের ন্যায় জড় ও অচেতন, অন্তরে পরমানন্দে বিহ্বল। গাভীগণ প্রভুর অঙ্গ বেড়িয়া অঙ্গঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছিল, গাভীগণকে দূর করিয়া দিলেও প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা ছিলনা। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রভূকে চেতন করিতে না পারিয়া ঘরে উঠাইয়া আনিলেন। উচ্চৈঃস্বরে শ্রবণে কৃষ্ণ নাম প্রদান করিতে করিতে অনেকক্ষণ পর প্রভু চৈতন্যলাভ করিলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে আপনা হইতেই হস্তপদ বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ দেহ হইল। প্রভু স্বরূপ গোসাঞিকে বলিলেন "মধুর মূরলী শ্রবণ করিয়া আমি বৃন্দাবনে গমন করিয়া দেখিলাম গোষ্টে সঙ্কেতে 'রাধা রাধা' বলিয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন বেণু বাদন করিলে শ্রীরাধারাণী কুঞ্জগৃহে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার পশ্চাতে কৃষ্ণগৃহে ক্রীডা বা কেলি করিতে গমন করিলেন। আমিও পশ্চাতে গমন করিয়া অঙ্গের ভূষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ বিহার ও রাসবিলাস করিতেছেন, তাহাদের মধুর কণ্ঠধ্বনি ও কর্ম্মরসায়ন ভূষণ ধ্বনি শ্রবণে আমি যখন পরমোল্লাসে নিমগ্ন, তখন তোমরা সকলে কোলাহল করিয়া আমাকে বলাৎকার করিয়া হেথায় লইয়া আসিলা"।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই গৌরাঙ্গ পাদ পদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌড় ভক্তবৃন্দ॥

এইভাবে রাত্রিদিনে প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ বেদনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক শারদীয়া পুর্ণিমা রজনীতে নিজ ভক্তগণসহ প্রভু পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে শ্রীবাসলীলার শ্লোক শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। প্রভু কখনও ভাবোন্মাদে ইতঃস্তত ধাবিত হলেন কখনও মূর্ছিত দশায় ভূমিতে গড়াগড়ি যান। অতঃপর শ্রীমদভগবতের (১০-৩৩-২৩) জল কেলির একটি শ্লোক শ্রবন করিতে করিতে আইটোটাব পথে সমুদ্র তটে আগমন করিযা দেখিলেন যে উজ্জল জ্যোৎস্নায় সাগর তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া শ্রীযমুনাব ন্যায় রূপ ধারন করিয়া ঝলমল করিতেছে। প্রভু যমুনা ভ্রমে সমুদ্রের দিকে অতি দ্রুতবেগে গমন করিয়া তাহাতে ঝম্প-প্রদান করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শুষ্ক কাষ্টের খণ্ডের ন্যায় সমুদ্রে তরঙ্গ প্রভুব অঙ্গ একবার ডুবায়, কভু ভাসিতে ভাসিতে কোনার্কের দিকে চলিয়া যাইতেছে। মদমত্ত হস্তী যেমন করিণীগণের সঙ্গে জলক্রিয়া করে, প্রভু তদ্রুপ গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলক্রিয়া করিতেছেন দর্শন করিয়া সেই পরমানন্দে মগ্ন আছেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিয়া ইতঃস্তত ছোটাছুটী করিতে লাগিলেন; তাহারা জগন্নাথ দেবালয়ে, উদ্যানে, গুণ্ডিচা মন্দিরে, নরেন্দ্র সরোবরে, চটক পর্ব্বতে কোনার্কের দিকে অন্বেষণ কবিয়া প্রভুকে না দেখিয়া সকলেই বিচ্ছেদে ম্রিয়মান হইলেন। ভক্তগণ সাগর তটে দেখিলেন যে এক ধীবর কাঁধে জাল লইয়া 'হাঁসে কাঁদে, নাচে গায় ও 'হরি হরি' বলিয়া ধ্বনি করে। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এইরূপ দশার কারণ কি?"

জালিয়া কহে-"ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥"

আমি বড় মৎস ভাবিয়া সযত্নে উঠাইতে চেষ্টা করিলে উহার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র সেই ভূত বা ব্রহ্মদৈত্য আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আমি ভয়ে কম্পিত, মুখে হরিনাম, নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ব্রহ্মদৈত্য অথবা ভূত তাহা বলিতে পারিনা।

শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্তিসন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি থাকে ধড়ে॥
মরা রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন।

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীস্বরূপ গোসাঞি সব তত্ত্ব অবগত হইয়া জালিয়াকে বলিলেন যে তিনি বড় ওঝা ভূত ছাড়াইতে জানেন—এই বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া শ্রীহস্ত তাহার শিরে প্রদান করতঃ জালিয়াকে তিন চড় মারিয়া ভূত ছাড়াইলেন। ধীবরের ভয় অনেকাংশে লাঘব হইল। তখন তিনি জালিয়াকে কহিলেন যে সে যাঁহাকে জালে উঠাইয়া ছিলেন, তিনি ভূত নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে পড়িলে তুমি তাহাকে তোমার জালে উঠাইয়া ছিলে। তখন ভক্তগণের সঙ্গে ধীবর গমন করিয়া প্রভুকে দেখাইয়া দিল। ভক্তগণ দেখিলেন যে প্রভু দীর্ঘকায় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন, শ্বেতাঙ্গে বালুকা লাগিয়াছে, দেহ অতি দীর্ঘ ও শিথিল, চর্ম্ম ঢিলা ও প্রসারিত, এই অবস্থায় গৃহে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তখন ভক্তগণ আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কোপীন পরিধান করাইয়া শুষ্ক বহির্ব্বাসে শয়ন করাইয়া দেহ হইতে বালুকা অপসারিত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অবশেষে হুঙ্কার করিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু উঠিয়া বসিলেন। তখন সকল অস্থি স্ব স্ব স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেহ হইল।

শ্রীমন মহাপ্রভু সতত অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা ও অর্দ্ধবাহ্য দশা এই

তিন দশায় অবস্থান করেন। তাহার অন্তর্দ্দশায় ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান থাকে ভক্তগণ তাহাকে অর্দ্ধবাহ্য নাম দিয়া থাকেন। যখন তিনি ভক্তগণকে আভাসে প্রেমের আলাপ-প্রলাপ বলিতে থাকেন, তাহাকে অর্দ্ধবাহ্য কহে। শ্রীচৈতন্যদেব পারিষদবর্গ সমীপে বলিতে লাগিলেন —"দেখিলাম জলক্রীড়া বিশারদ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার জলে মহারঙ্গে রসরঙ্গিনী শ্রীরাধা ও মৃগনয়না ব্রজ ললনাদের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। আমি সখি সঙ্গে যমুনার তীরে থাকিয়া ঐ মধুর দৃশ্য দর্শন করিতেছি। এক দিকে জলকেলি বিশেষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, অন্যদিকে সুচতুরা সখিগণসহ রসবতী শ্রীরাধা। উভয় পক্ষে হস্তদ্বারা এমনইভাবে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাহা জল যুদ্ধের আকার ধারণ করিল; কাহারও জয় পরাজয় নাই। নবঘন শ্যামসুন্দর ও বিদ্যুতবরণী শ্রীরাধার সঙ্গে এমনই সজোরে জল বর্ষন হইল যেন মনে হইল মেঘ-বিজুরী জড়াজড়ি করিতেছে। তৃষিত ব্রজ চাতকীগণ একবার শ্যাম-জলধর পানে, আবার বিদ্যুতবরণা শ্রীরাধার পানে নিরীক্ষণ করিয়া সকল গোপীগণ এক সঙ্গে জলযুদ্ধ। হাতাহাতি যুদ্ধ, মুখোমুখি যুদ্ধ, নখানখি যুদ্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে আরম্ভ করিলেন। জড়ক্রীড়া অংশ গ্রহণ-কারিনী প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে এক শ্যামসুন্দর অংশ গ্রহণ করিয়া যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়া জলক্রীড়ায় হৃদাহৃদি পরে রদারদি, নখানখি আরম্ভ হইল। এইরূপে সহস্র গোপীর সঙ্গে সহস্র কৃষ্ণের জলক্রীড়া আরম্ভ হইল। সহস্র কৃষ্ণ সহস্র ব্রজদেবীগণকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। সহস্র কৃষ্ণ সহস্র ব্রজাঙ্গনাদের বসন হরণ করিলেন। রসময় শ্রীকৃষ্ণ রসময়ী শ্রীরাধাকে কণ্ঠলগ্ন জলে লইয়া অগাধ জলে ছাড়িয়া দিলেন, তথায় শ্রীরাধা কমলিনীর ন্যায় কৃষ্ণকণ্ঠ ধারণ করিয়া ভাসিতে লাগিলেন। নীল স্বচ্ছ যমুনার জলে রসিকেন্দ্র চূড়ামনি ব্রজাঙ্গনাদিগের ঝলমল অঙ্গ দর্শন করিয়া মনোরঞ্জন করিলেন। পদ্মপত্র মৃণাল ও পদ্মপুষ্প দ্বারা লজ্জাশীলা গোপীগণ কেহ কেহ লজ্জা নিবারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন মুক্তকেশী গোপীকে অর্দ্ধবাস করিলে, তাহারা হস্তদ্বারা কঞ্চুলি ধারণ করিয়া লজ্জা নিবারণ

করিলেন॥ শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মনোভিলাষ জ্ঞাত হইয়া গোপীগণ আকণ্ঠ জলে মুখে স্বর্ণপদ্ম ধারণ করিয়া হেমাব্জ বনে এমনভাবে যেন মনে হইল স্বর্ণমঙ্গল বনে লুকাইয়া রহিলেন। সহস্র স্বর্ণ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ হইলে সুচতুরা শ্রীরাধা হেমাব্জবনে ললিতাদি সখিগনের সঙ্গে মিলিতা হইলেন। যত স্বর্ণকমলিনী জলেভাসে তত নীলপদ্ম আসিয়া তথায় মিলিত হইয়া ঠেকাঠেকি করে, নীলাব্জ ও হেমাব্জের জলযুদ্ধ গোপীগণ যমুনা তীরে থাকিয়া দর্শন করিতেছেন। এইরূপে অচিন্ত্য নানাপ্রকার জলক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া কান্তাগণ সহ-শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে আগমণ করিলেন। গোপীগণ সুগন্ধ আমলকী তৈল মর্দ্দন করিয়া পুনরায় স্নান করতঃ সকলেই শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া রত্ন মন্দিরে আগমন করিলেন। বৃন্দাদেবী তখন গন্ধপুষ্প ও বিবিধ অলঙ্কারে বন্যবেশ রচনা করিয়া দিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের দেবীগণ ও কুঞ্জদাসীগণ আম্র, পনস, দাড়িম্ব, কদলী, দ্রাক্ষা, বাদাম, মেয়া কমলা পীলু প্রভৃতি বিবিধ ফল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বড় বড় বহু থালায় করিয়া রত্ন মন্দিরে পিণ্ডার উপরে রাখিলেন। ভক্ষ্যের পরিপাটি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বনভোজন করিলেন। পরে শ্রীরাধা সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে শয়ন করিলে সেবার সময় জানিয়া সখিগণ যথাবিধিভাবে কেহ বীজন, কেহ পাদ সম্বাহন, কেহ তাম্বুল সেবনাদি কার্য্য করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে সখিগণ শয়ন করিলেন॥ "ইহা দর্শন করিয়া যখন আমি পরমানন্দে উল্লসিত তখন তোমরা কোলাহল করিয়া হেথায় লইয়া আসিলা।" শ্রীরাধা বা রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপা ভিন্ন কেহ শৃঙ্গার রসার্ণবে নিমগ্ন হইতে পারেন না। শ্রীগৌর সুন্দর আমার ভাবনিধি, তাহার হৃদয়ে নব নব প্রেমচন্দ্রোদয়ে সর্ব্বদাই উছলিত তরঙ্গ মালার কলকল্লোল। দিব্যোন্মাদ কূর্ম্মাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি, মাদনাখ্য মহাভাব সাগরে তিনি নিরন্তর ভাসমান, ভাবে মহাভাবে সম্বর্দ্ধন হেতু তিনি সতত মহাব্যাকুল। উজ্জ্বল রসের ভক্তের

চিত্ত যে পরিমাণে গৌরপ্রেম রসাভিসিক্ত হইবে, সেই পরিমাণে তাহার হৃদয় শ্রীরাধার চরণ কমলে লগ্ন হইবে। উজ্জ্বল রসের ভক্তের প্রেমবিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণও চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের কুল না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার ভাব ও কান্তি ও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ধন্য কলিযুগে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতার হইয়া তাহা আস্বাদন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই মহাভাবের প্রলাপ-বিকার বর্ণনা করিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের সামর্থ নাই। শুধু আত্মশোধনের নিমিত্ত কিছু লিখিতেছি। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

সহস্র-বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥
কোটীযুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গনেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥
প্রেমের বিকার লিখিতে চাহে যেই জন।
চাঁদ ধরিতে যায় যেন হৈয়া বামন॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু জলের হরয়ে এককন।
কৃষ্ণপ্রেমকন তৈছে জীবের স্পর্শন॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধার মহাভাবের ধ্রুবানুস্মৃতি সাগরে মগ্ন শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব; অলৌকিক লীলা-বিলাসের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ শ্রীমৎ দাস গোস্বামীর রাগ মার্গের গুরু। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের এই মাদনাখ্য মহাভাব, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি ভাব সকল তিনি তাঁহার চৈতন্যস্তবক কল্পবৃক্ষ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যতই শ্রীমৎ দাস গোস্বামীর অপ্রকট কাল আসন্ন হইতে-ছিল, ততই তিনি স্বীয় মঞ্জরী দেহে ভাবাবিষ্টা হইয়া শ্রীরাধার দর্শন ও সাক্ষাৎ সেবনের নিমিত্ত মহাপ্রেমবতী সেবিকার ন্যায় ব্যাকুলা হইতে-ছিলেন তৎকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে সেই আগ্নেয় গিরি সদৃশ বিরহানলের তীব্রতাপ, হৃদয় বিদীর্ণকারী ক্রন্দন ও বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে। সাধক বহু ভাগ্য ফলে ও ভক্তের কৃপায় যে পরিমানে

শ্রীগৌর চরণ কমলে ভক্তিলাভ করিবেন, সেই পরিমাণে তাহার হৃদয় রাধা পাদ-পদ্ম সুধা সাগরে লীন হইবে এবং সেই পরিমাণে তাহার হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলার আনন্দ ধারায় নিমগ্ন হইবেন।

"গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ"

রাগানুগীয় ভজন-ইতিহাসে শ্রীমৎদাস গোস্বামী পাদের লীলা-স্মরণ পরিপাটী ভজন-নিয়মাবলীর কঠোরতা, রাগভক্তির কোমলতা প্রভৃতি হইতেছে অপরূপ অভিনব অঙ্ক। তদীয় রাধা নিষ্ঠা সিদ্ধ ভক্তগনের আদর্শস্বরূপ। শ্রীরাধা কৃষ্ণসুখ ও বিলাসের মহানিধি ও কৃষ্ণ মনোরমা। সুতরাং অনায়াসে কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহজ ও সরল উপায় —শ্রীরাধা ভজন ও শ্রীরাধার রহোদাস্যে জীবনমন সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করা। শ্রীরাধা পাদ-পদ্ম ভজন ও তাহার রহোদাস্যে প্রানোৎসর্গ করাই শ্রীকৃষ্ণ পদ-কমল ধরিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফাঁদ। "রাধিকা চরণ রেনু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী (ঠাকুর নরোত্তম) রাধা প্রেমে এমন এক অনির্ব্বাচনীয় মাদকতা ও উন্মাদিনী শক্তি মত্ততা আছে উহা ঐন্দ্রিজালিকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। "রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত" (চৈঃ চঃ) আহা। শ্রীপাদ রাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া কতদিন, কত রাত্রি হৃদয় স্বামিনীর দর্শন লালসায় কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন। দিবস রজনী স্বামিনী বিরহিনী দাসীর তীব্র বিরহাকুল দশার ভাবচিত্র ও গাঢ় লৌল্য সহকারে শ্রীরাধার চরণ কমল দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা সিদ্ধ ভক্তগনের ধ্যানের বিষয়। শ্রীমৎ রঘুনাথের বিরহ বিসদিত মুখচ্ছবি মনে স্মরণ করিলেও রসিক ভক্তগণ দেখিতে পাইবেন যে সেই বিরহলীনা দীনা দাসীর ক্ষীনা তনুবল্লরী ক্ষনে ক্ষণে, পলে পলে, শ্রীরাধার বিরহ বহ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত হইতেছে। তখন ভক্ত হৃদয়ে নীলম্বূতীরস্থ নীলাচলের শ্রীগৌর সুন্দরের গম্ভীরা মন্দিরের স্মৃতি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইবে। বিপ্রলম্ভ সঘন শ্রীরাধা ভাবাঢ্য শ্রীগৌর সুন্দরের মাদনাখ্য ও মোদনাখ্য মহাভাবের মূর্ত্তিখানিব মুখশশী সহসা হৃদয় উদিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ

সুন্দরের অতি কৃপা প্রাপ্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে যে ক্ষীনা রাধা বিরহিনী দীনা দাসীর করুন ক্রন্দন কুররীর কাতর বিলাপকেও নিন্দিত করিয়াছিল, যিনি অনাহারে অনিদ্রায় ছিন্নকন্থা মাত্র অঙ্গে ধারন পূর্ব্বক রাগ যজ্ঞের মহাঋত্বিক রূপে যুক্ত বৈরাগ্য প্রেম ভক্তির সুমহান আদর্শ আমাদের সমীপে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সুরসিক ভক্ত ও বৈষ্ণবগণের আদর্শ স্বরূপ। বিরহানলে মুহ্যমানা সেই সুতনু শ্রীরতি মঞ্জুরী রূপে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ঠা। তদীয় রাগ মার্গের গুরু শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ শ্রীরূপ মঞ্জুরী রূপে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ঠা হইয়া নিকুঞ্জ ভবনে নিত্য যুগল সেবার আনন্দ ধারায় অভিসিক্তা হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের রাত্রিদিনে প্রেমাবেশে প্রলাপ ও উম্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শ্রীস্বরূপ ও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধারন করিলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গীত গোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রভুর ভাবানুরূপ গীত ও শ্লোক পাঠ করিতেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী পাদ ও শ্রীরায় রামানন্দ বৃন্দাবন লীলায় যথাক্রমে শ্রীললিতা সখি ও শ্রীবিশাখা সখি ছিলেন মহাভাব সাগরে চপলিত শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীচরনোৎক্ষিপ্ত লীলাম্বর অস্থি বারিকণা শ্রীগৌর পার্ষদগন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহারা মধুরোজ্জ্বল ব্রজ-প্রেমের মাধুরী বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা কলিহত জীব শ্রীমন মহাপ্রভুর চরিত সুধা আস্বাদন করিতে পারিতেছি। শ্রীগৌর সুন্দরের 'দীর্ঘাকৃতি' ও 'কুর্ম্মাকৃতি' মাদনাখ্য মহাভাবের রীতি-নীতি সাদৃশ্য সাধন-সম্পত্তি বিহীন ক্ষুদ্র, অতীদীন বৈষবাধর্মের পক্ষে অনুভবগম্য নহে। স্বয়ং প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ ও এই মাদনাখ্য ও মোদনাখ্য মহাভাব নিজে ও ভক্ত হৃদয়ে প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অন্তর্কৃষ্ণ বর্হিগোরা রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব অবতীর্ন হইয়া তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত মধুরোজ্জ্বল ব্রজ প্রেম দান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ*

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগো শিক্ষার্থমেক পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।

বৈরাগ্য, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনাসক্তি, বিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ তত্ত্ব অনুভব ও নিজ ভক্তিযোগ অর্থাৎ উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি অপামর জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য করুণার সাগর পুরান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুদ্ধা বা উজ্জ্বল রসের ভক্তির পথ প্রদর্শন করতঃ সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্মুখে যাহাকেই পাইয়াছেন, তাহাকেই শ্রীনামের সহিত প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিখাছেন। যে মরুভূমি তুল্য শুষ্ক চিত্তে কোন সাধনেই ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইবার নহে, শ্রীচৈতন্যদেবের নাম গ্রহণ মাত্র চৈতন্যোদয় হইয়া সেই হৃদয়েও ভক্তি-কল্পলতিকার আবির্ভাব হইয়া তাহা ভাবপুষ্পে ও প্রেমফলে সুশোভিত হয়। তিনি অপরাধের বিচার না করিয়াই নামের মুখ্যফল প্রেমনামের সহিতই দান করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"বাহু তুলি নৃত্য করি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"

শ্রীগৌর-চরণাশ্রয়ী মহাভাগ্যবান মাত্রেই স্বরূপসিদ্ধভাবে অনুভব করিয়াছেন যে. শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, গুণ ও লীলা স্মরণ করিলে অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রেম উপজয় হইয়া থাকে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরণ ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া লিখিয়াছেন—

"অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্যের নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাঙ্গ বিহ্বল সে হয়॥"

এ সম্বন্ধে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি ভাবগম্ভীর কথা বলিতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আগমন করিয়া

* ইহা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ-এর পূর্ব্বে পঠনীয়।

শ্রীরূপ ও অনুপমকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর কাশীধামে আগমন করতঃ শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীগৌরগত প্রাণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গই তাহার সর্ব্বস্ব ধন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিতই আছেন। একদিন কাশীবাসী এক দিগম্বর সন্ন্যাসী মনিকর্ণিকার ঘাটে স্নানার্থে আগমন করিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দও সেই ঘাটে স্নান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম' উচ্চারণ করিতে করিতে তীরে উঠিলেন। ইহা শ্রবণে দিগাম্বর সন্ন্যাসী রাগান্বিত হইয়া বক্রদৃষ্টিতে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম স্মরণ-কীর্ত্তন আবার কি ?

তারে দেখি সন্ন্যাসী কহে তব ঘর বঙ্গে।
ভ্রমজ্ঞানে ঈশ্বরত্ব স্থাপহ গৌরাঙ্গে॥"

সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের নিন্দা করিয়া কহিলেন—"হাঁ, সত্য বটে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মপালন করে না, কেবল হরিকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। সন্ন্যাসী আরও খুজিয়া খুজিয়া আরও নিন্দার একটি বড় রকম কথা বাহির করিয়া বলিলেন—"সে আবার মহা ঐন্দ্রজালিক, শুনিয়াছি উড়িষ্যার জ্ঞানী – সার্ব্বভৌম-কে ভুলাইয়াছে, সে বেদবিরুদ্ধ কাজ করে, বেদান্ত শ্রবণ করে না। ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডালাদি ছল করিয়া হরিনাম করিলেই তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করে। এত ভ্রষ্টাচার করিলেও সকল লোক তাহার বশীভূত হয়, ইহা ইন্দ্রজাল ব্যতীত কিছু নহে। শ্রীঅদ্বৈতনন্দন পরম পণ্ডিত, যিনি শিশুকালে শ্রীপাদ কেশবভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— "মহাপ্রভুর গুরু কেহই হইতে পারেন না।" সেই অচ্যুতানন্দ ধীর স্থির প্রতিজ্ঞ, সন্ন্যাসীর বাক্য উপেক্ষা করিলেন না, বলিলেন— "ন্যাসীবর ঈশ্বর লক্ষণ দর্শন করিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে হয়। দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ এবং ষড়বিধ লক্ষণান্বিত ভগবত্তা তাঁহাতে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। মায়াবাদ সাকার, নিরাকার লইয়া দুইজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হইলে তিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি দিয়া সন্ন্যাসীর মত খণ্ডন করিলেন। সন্ন্যাসী সে প্রকার অপদার্থ বা

প্রতারক নহেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি যে সেই ভগবান তাহার প্রমাণ কি?" শ্রীঅচ্যুতানন্দ ধৈর্য্য ও অকপট বিশ্বাস সহকারে ন্যাসীকে কহিলেন—

"ন্যাসী কহে সে এই ইথে কি. প্রমাণ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে—সাক্ষী রূপ, গুণ নাম॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাক একবার।
রোমাঞ্চ হইবে দেহে অতি চমৎকার॥"

কথাটা সন্ন্যাসীর মনে বিশ্বাস হইল। অচ্যুতানন্দ—বাক্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

"শুনি ন্যাসী গৌরাঙ্গ নাম উচ্চারিল।
ভক্তবাক্যে গৌরকৃপা জ্যোৎস্না বিস্তারিত।
কৃষ্ণভক্তের সঙ্গালাপ অবিচিন্ত্য গুণে।
পুলক ধরিলা তেহ কদম্বের সম॥"

ধন্য পরীক্ষা! ধন্য পরীক্ষক! সাধু শ্রীগৌরাঙ্গ নামের মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নামের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। আহা! কি আশ্চর্য পরিবর্ত্তন।

"আশ্চর্য্য মানিয়া ন্যাসী ফুকারিয়া কয়।
শ্রীচৈতন্য অপ্রাকৃত নাহিক সংশয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম শুদ্ধ প্রেমরস ময়।
সিদ্ধ হরি নামাপেক্ষা মাধুর্য্য অতিশয়॥"
"এবে কাঁহা রহে গৌর তাহা মুঁই যাঁও।
তানে দেখি দেহ মন পরাণ জুড়াও॥"

সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত; বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। অদম্য উৎকণ্ঠা, শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিবেন। শ্রীঅচ্যুতের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি নিজের অর্দ্ধ বস্ত্রকে উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে পরাইয়া সত্বর গৌরদর্শনে চলিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী আত্মহারা হইয়া স্থির নেত্রে, পুলকাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর রূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

"ন্যাসী একদৃষ্টে চাহে গৌরাঙ্গের পানে।
গৌর অঙ্গে বিশ্বরূপ দেখে ভাগ্যক্রমে॥
অত্যন্ত অদ্ভুত দিব্য মহিমা দর্শনে।
প্রেম-গঙ্গাধারা ন্যাসীর বহে দুনয়নে॥"

সন্ন্যাসী দণ্ডবৎ হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িলেন। তিনি ন্যাসীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া এমন প্রেমোন্মাদ করিলেন যে অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

"গৌর স্পর্শমণি স্পর্শে প্রেম উপাজিল।
উর্দ্ধবাহু হৈয়া ন্যাসী নাচিতে লাগিল॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে লোকে ভয়ঙ্কর।
শ্রীচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর বলে বাব বার॥"

শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দের আনন্দস্রোত উথুলিয়া পড়িতেছে। সকল ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্ত। প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল, ভক্তগণ তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কলিযুগ সর্ব্ব দোগের আকর হইলেও করুণার অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমনের ফলে সাধনের সহজলভ্যতা ও সুমাধুরিমা হেতু কলিযুগই চতুর্যুগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। পরিপূর্ণ করুণার বারিধি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিন্ন অবিচারে এতাদৃশ করুণা বিতরণ আর কোন অবতারে দৃষ্ট হয় নাই। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেইজন।
সর্ব্বোত্তম হৈলেও তারে অসুরে গণন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তারে দৈত্য করে মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"

এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমামণ্ডলে,
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেব ন বা শুকঃ।
যন্নবক্কাপি কৃপাময়েন চ নিজেহপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিনা—
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তি-বর্ত্তনি সুখং খেলন্তি গৌর প্রিয়াঃ ॥১৮

পরম নিগূঢ় মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমের মাধুরিমার কথা কে জানিত? শ্রী-ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব প্রভৃতি মুনিগণ তাহা সুষ্ঠভাবে জানিতে পারেন নাই। সেই জগতে অন্যের বুদ্ধি যে সেই গূঢ় মার্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না তাহা ত জানা কথা। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবদ বক্তা পরমহংস কুল মুকুটমণি শ্রীল শুকদেব তাহা জানিয়াও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অন্যের কী কথা? করুণাময় স্বয়ং শ্রীগোবিন্দও যাহা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকাশ করেন নাই, সেই মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্যসাগরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অনুগত ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধা-প্রেমের ঋণী শ্রীগোরাঙ্গ মাধব প্রেমদৃষ্টিতে জগতবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে শ্রীরাধারাণীর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক উজ্জ্বল মধুর রসের ভজন দ্বারা শ্রীরাধামাধবের শ্রীরাসাদি নিভৃত নিকুঞ্জ লীলায় প্রেম-সেবা লাভই জগজ্জীবের চরম সাধ্য ও সৌভাগ্যের পরম পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধারাণীর আধিরূঢ় মহাভাব সুখসিন্ধুর পরম চমৎকারকারী আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কলিযুগের প্রেম-রস পিপাসুদিগকে ইহার সন্ধান দিতে পারিয়াছেন। সংকীর্ত্তনৈক পিতা শ্রীগৌরসুন্দর কৃত সংকীর্ত্তন রসতরঙ্গও শ্রীরাধারাণীর মোহনাখ্য মহাভাব সিন্ধুর তরঙ্গ বিশেষ। সেই তরঙ্গে আকণ্ঠমান্ নিমজ্জমান্ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণকমলে যিনি মনটি সংস্থাপন করতঃ শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-রসতরঙ্গে অবগাহন করিয়া করচরণাদি আস্ফালন করিতেছেন, তাঁহারই চরণ-সন্নিধানে কেহ উপবেশন করিলে উক্ত মহাভাবের কিছুটা কণা স্পর্শ

পাইলেও পাইতে পারেন। তাই পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ তারস্বরে গাহিয়াছেন—

যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি।
শকতি হইত কার॥ ইত্যাদি

এই আভপ্রায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বলিতেছেন :—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলি মদমথন নিত্যানন্দ রাম॥
লাচিয়া নাচায়ে বধির জড় আঁধে।
কান্দিতে অখিল ভুবন জন কান্দে॥
ইহ রসে যাক নাহিক বিশ্বাস।
মলিন মুকুরে নহে বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দ ইহ করত বিচার।
কোটী কল্পে তঁছু নাহিক নিস্তার॥"

শ্রীরাধাভাব ও কান্তি যুক্ত শ্রীমাধব শ্রীচৈতন্য মাধব রূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতারি হইয়া সাধিয়া ঘরে ঘরে যাচিয়া প্রেমামৃত বিতরণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার কৃপায় নবচেতনা লাভ করিয়া মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমে বিভোর হইলেন; কিন্তু যাহারা জড় প্রকৃতির নিবিড় আবেশে অন্ধ হইয়া প্রেমের ঠাকুরকে চিনিলেন না, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই বেদনাময় ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকিবেন।

যিনি রসরাজ-মহাভাব মিলিত নিরুপম গৌর কিশোর মূর্ত্তি, তিনিই কলির জীবোদ্ধারী মূর্ত্তি। যিনি প্রেম রসাবেশে গলিত বেশ

ললিত ভাব ধারণ করিয়াছেন, যাহাঁর স্বাভাবিক সুন্দর, স্নিগ্ধ, স্বর্ণকমল সদৃশ কলেবর হইতে প্রেমের লাবণ্য বিচ্ছুরিত হইতেছে, যাঁহার বালার্ক সম রঞ্জিত পদ্মকলির ন্যায় নয়নদ্বয় হইতে দুইটি প্রেমধারা নির্গত হইয়া পবিত্র মন্দাকিনীর ভাব ধারণ করিয়াছে, ঐ বিগলিত নয়নদ্বয়ের প্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রু কৃষ্ণ অনুরাগের বাষ্পধূমে পরিণত হইয়া পদ্মপত্রে প্রভাতকালীন শিশির বিন্দুর ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে, যিনি সুবলিত ভূজ যুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া প্রেমভরে অঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিয়া বলিতেছেন—"ওরে কলিহত তাপ ক্লিষ্ট জীব! ওরে পাপীতাপী জীব! ওরে দীন হীন অমানি জন! ওরে সর্ব্বহারা, পতিত পাষণ্ডি! তোরা আয় আমার বক্ষে আয়"—বলিয়া অপরাধের বিচার না করিয়াই বলাৎকারে প্রেমবলে সিক্ত বক্ষে আশ্রয় দান করিয়া গদগদ ভাষায় শ্রীমুখ নিঃসৃত কৃষ্ণনাম পাপীতাপী জনগণের প্রতি অবিরল বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার রসনাগ্রে কৃষ্ণনাম নিরন্তর এমনই ভাবে নৃত্য করিতেছেন যে দেখিলে মনে হয় তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সকল একযোগে এককালে কৃষ্ণ গুণগান—করিতেছেন। তাঁহার এই নিরুপম ও প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় গোলকরসের বন্যায় আপ্লুত না হয়? শ্রীরামকৃষ্ণের নিগুঢ় নিকুঞ্জ লীলার তত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রীগৌরভক্তের সঙ্গ ব্যতীত সুলভ্য নহে। ধার্ম্মিক, বিষ্ণুসেবী, তীর্থপর্য্যটনকারী ও বেদ পারগ ব্যক্তিগণ গৌরভক্তের চরণাশ্রয় ভিন্ন বৃন্দাবন তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। শাস্ত্রে কতকগুলি গুণের কথা মহাপুরুষ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে তাহা একমাত্র গৌরভক্তগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা—

তৃনাদপি সুনীচেন তরুরেব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি:॥

(১) যেমন তৃন হইতে বিনীত স্বভাব, তৃণের এক প্রান্তে পদ রাখিলে অন্য প্রান্ত কিছু উচ্চ হইয়া উঠে; কিন্তু গৌর ভক্তগণ সদা

বিনীত তাঁহাদের চিত্তে ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। ইহাকে ক্ষান্তি কহে।

(২) বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু। ফলবান বৃক্ষে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেও যেমন ঐ বৃক্ষ ছায়াদানে বিরত হয় না, পরন্তু প্রহার কারীকে ফলদান করেন, তেমনই গৌর ভক্তগণ কাহার দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হইলেও মধুর বাক্যে তাহার হৃদয় শোধন করিয়া প্রেমরূপ মহাফল দান করেন, "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" ভগবদবতার হইয়াও পরমদয়ালু মহানুভব রূপে প্রভু নিত্যানন্দের বাণী, যেমন বৃক্ষকে ছেদন কলিলেও সে কিছু বলে না, শুষ্ক হইয়া গেলেও কাহার নিকট জল চাহেনা, গৌরভক্তগণ সেইরূপ—শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতির জন্য কাহারও নিকট কিছু যাঞা না করিয়া সহনশীলতা দ্বারা জীবসমূহকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যথা—

"কখনও বনের শাক অলবনে করি পাক
মুখে দেন দুই চারিগ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস বৃক্ষ তলেতে বাস
এক দুই দিন উপবাস॥

অন্যত্র,

কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাথা নেড়া মাথা,
মুখে কৃষ্ণ গুণ গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস॥ (পদকল্পতরু)

(৩) অমানিদা মানদ—এ সংসারে অধিকাংশ মানবগণই শুধু ধনিক, কুলীন, সন্ন্যাসী ব্যক্তিগণকে সম্মান দিয়া থাকেন, কিন্তু করুণ হৃদয় গৌর ভক্তগণের দীন, হীন, কাঙ্গাল ও পতিত-পাষণ্ডীর জন্য অধিকতর স্নেহ মমতা। সর্ব্বজীব হৃদয়ে শ্রীভগবান অন্তর্যামী রূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া গৌর ভক্তগণ 'কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' মনে করিয়া সম্মান দিয়া থাকেন, এমনকি বিষ্টার কৃমিকেও দূর হইতে প্রণাম করিয়া থাকেন। "এই সে বৈষ্ণবধর্ম সবারে করয়ে প্রণতি।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী পদকে বলিয়াছিলেন :—

"হীন জাতি নহে ভজনেব অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন :—

"ঈশ্বর কখন জাতি কুলাদি নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥ চৈঃ চঃ

(৪) মাধুর্যময় সৌন্দর্য :—নিরন্তর প্রেমরসাবেশে ভাবিত থাকায় গৌর ভক্তের দর্শন মাত্রেই চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রেমরস স্পরিত হইয়া যায়।

(৫) সুধা মধুর ভাবিতা :—গৌর ভক্তগণের প্রেমসুধা ক্ষরিত বাক্য শ্রবণ মাত্রই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত চিত্তের পিপাসা দূরীভূত হইয়া প্রেমামৃতের আস্বাদনে হৃদয়ে লোলুপতা আনে।

যদি কেহ ভগবৎ স্বরূপের নিরবধি ধ্যান অথবা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে রত থাকেন, তথাপি সর্ব্বশক্তি সার হ্লাদিনী শক্তিযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তগণের যে স্বভাব সিদ্ধ সদ্‌গুণ বহি প্রকাশ পায় তাহার অশাংশ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি অভেদ দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব মূর্ত্তির ভিতরে শ্রীরাধার কাঞ্চন পঞ্চালিকায় আবৃত সবংশীবদন রসরাজ মূর্ত্তি দেখিতে পান। শ্রীরায় রামানন্দের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। গৌর ভক্তগণের কথা শ্রীভক্ত মাল গ্রন্থে বলিতেছেন :—

গৌরাঙ্গের ভক্তগণ গুণ সাগরের কন
ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে।
অন্যে শকতি কোথা পঙ্গুর পর্ব্বত যথা
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে॥

কি আশ্চর্য্য ! গৌরাঙ্গ পার্ষদে।
ত্রিজগতে সুদুর্ল্লভ প্রেমানন্দ অনুভব
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে ॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত কিবা নিষ্কলঙ্ক
নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর।
অনন্ত শুদ্ধ ভকতি মাধুর্য্য পীরিতি রীতি
স্বাভাবিক যুগলে সবার ॥

হে মন ! স্মরণ কর অপ্রাকৃত দেহধারী রায় রামানন্দকে যাঁহার মন যুবতী ও তরুণী স্পর্শেও কাষ্ঠ-পাষাণ সম নির্ব্বিকার, উজ্জ্বলমধুর রসে যাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মাধুর্য্যে সর্ব্বদা বিহার করেন, শ্রীরায় রামানন্দ কিশোরী বয়স্কা, নৃত্যগীতে সুনিপুণা দুই সুন্দরীকে নিভৃত উদ্যানে স্বীয় নাটকের নৃত্য-গীত শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেবাবুদ্ধি আরোপ করিয়া এবং নিজেও সিদ্ধ-মঞ্জরী-দেহ ভাবনা করিয়া তরুণীযুগলকে স্নানাদি, বেশভূষা ও অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া সেবা করিতেন, সেবার সময় কন্যাদ্বয়ের গুহ্য অঙ্গের স্পর্শন ও দর্শন হইলেও শ্রীরায় রামানন্দ নির্ব্বিকার ও প্রেমসেবায় নিমগ্ন। যথা—

"রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন। চৈঃ চঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য মহিমার কথা ভাষায় বর্ণনাতীত। শ্রীরায় রামানন্দ দ্বারা সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণকে শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত সাধ্য-সাধন ও প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর হরিদাসের দ্বারে নাম মাহাত্ম বর্ণন, শ্রীসনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস-প্রকাশও শ্রীস্বরূপ দ্বারা ব্রজের প্রেম রসলীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীসনাতন গোস্বামীচরণ শ্রীহরিভক্তি বিলাস, শ্রীভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনী ও দশম চরিত প্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ প্রায় বহু গ্রন্থে ব্রজবিলাস বর্ণন, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীললিত মাধব ও শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক রসগ্রন্থ শ্রীউজ্জ্বল

নীলমনি, শ্রীদানকেলি কৌমুদী, বহুস্ত বাবলী অষ্টাদশ লীলাছন্দ, পদ্যাবলী, গোবিন্দ-বিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণ, মথুরা মাহাত্ম ও নাটক বর্ণন, লঘু ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রজবিলাস বর্ণনা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী চরণ বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সার, শ্রীভাগবত সন্দর্ভ, গোপাল চম্পু, ষট্ সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব বর্ণনা করিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম মাহত্ম্য প্রকাশ করিলেন। এই নাম সংকীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম। শ্রীনামই কলিযুগে যুগধর্ম। শ্রীনামই কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্মেরই প্রাণস্বরূপ। ইহা "সকল নিগমবল্লি সৎফলং চিৎস্বরূপম।" যদি কেহ কলির কল্মষ দূর করিতে চাহেন, যদি কেষ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হৃদয় শীতল করিতে চাহেন, যদি কেহ আনন্দ-চিন্ময় রসে অবগাহন করিতে চাহেন, তবে মধুর হরি-সংকীর্ত্তন-রসে বিভোর হউন। তখন একে অন্যকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে স্পৃহা জাগিবে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করিবে, মুচি, মেথর, হীন ও অধমজনকে নিজের রক্ত, নিজের প্রাণসম প্রতীয়মান হইবে। তবে আসুন. বর্ণ-ধর্ম নির্ব্বিশেষে আসুন, যে শ্রীমন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ অধম ও হীন জনকে বিশেষ সকরুন দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন, যে পার্ষদগণ সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া যাঁহারা চতুর্বর্ণের চিত্তের মালিন্য দূরীভূত করিয়া প্রেমরসাবেশে আপ্লুত করিয়াছেন, আমরা গণসহ সেই সংকীর্ত্তনের পিতা শ্রীগৌরসুন্দরকে সাশ্রু নেত্রে প্রনিপাত করিতেছি। শ্রীনামের অশেষ, অনন্ত মাহাত্ম্য ও অপ্রাপঞ্চিক শক্তিই শ্রীমান প্রহ্লাদকে অনলে বৃহিলে, হস্তীপদতলে, ভুজঙ্গ বিবরে নিক্ষেপ প্রভৃতি পিতা হিরণ্য কশিপুর সমুদয় উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। শ্রীনামের এই শক্তির জন্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ত্রিতাপ জ্বালা থাকে না। বিষও অমৃতে পরিণত হয়। এই অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই শ্রীহরিদাস ঠাকুর কাজী কর্ত্তৃক বাইশ বাজারে অমানুষিক প্রহারে পিষ্ট হইয়াও বদনে হরিনাম ত্যাগ করেন নাই। যথা—

"খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো অমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥
অশেষ দুর্গতি হই যদি যায় প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥" চৈঃ ভাঃ

যাঁহার মুখনিঃসৃত কৃষ্ণনাম অবিরল অমৃত বর্ষণ করিতেছে সেই সেই নিয়ত নামাবিষ্ট হরিদাস ঠাকুর শ্রীগৌরহরিকে বলিতেছেন:

"নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়।" চৈঃ চঃ

পাপক্ষয়, সংসারমোচন মোক্ষাদি শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের মূল ফল নহে, উহা গৌণ ও আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। উহা নামাভাস হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মুখ্য ফল হইল প্রেমোদয়। ঠাকুর হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইলে তবে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিলেন—নামজপকারী নিজেকে পবিত্র করেন আর উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী নিজেকে এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি, হীনজন, ম্লেচ্ছাদি, স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। যথা—

"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥ চৈঃ ভাঃ

ঠাকুর হরিদাস বেনাপোলের নির্জ্জন বনে একাকী বসিয়া তুলসী সেবন ও হরিনাম করিতেন। এক নিশীথকালে রাজা রামচন্দ্র খান দ্বারা প্রেরিত হইয়া লক্ষহীরা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে ঠাকুর হরিদাসকে ভুলাইবার জন্য আগমন করিয়া বেশ্যা 'অঙ্গ উঘারিয়া' তাহাকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর হরিদাস কোন আলাপ না করিয়া বলিলেন—"আমার নামের সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার কামনা শ্রবণ করিব।" তাঁহার কথা শ্রবণে বেশ্যা আনন্দে বসিয়া কৃষ্ণনাম শুনিতে লাগিল। ধন্য নামের প্রভাব, ধন্য সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য!

বেশ্যা কোথায় হরিদাসকে ভুলাইবে, না কোথায় নিজেই ভুলিল! ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার কর্ণে মহানাম মন্ত্র দিলে লক্ষহীরা পরমা বৈষ্ণবী হইলেন।

অতঃপর এক জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে মায়াশক্তি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধা হইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। গোফায় তুলসী-বৃক্ষ সমীপে উপবেশন করিয়া ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় এক অপরূপা সুন্দরী নারী গোফায় প্রবেশ করিলে তাঁহার অঙ্গকান্তিতে চতুর্দ্দিক পীতবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অঙ্গনার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত হইল। তিনি কর্ণরসায়ন ভূষণ ধ্বনি করিতে করিতে তুলসীকে নমস্কার করিয়া পরিক্রমা করতঃ ঠাকুর হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে কহিলেন —"আপনি জগতের বন্দনীয়, কৃপা করিয়া আপনি আমাকে অঙ্গীকার করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি নানারূপ ভাবভঙ্গি করিতে লাগিলেন—যাহাতে মুনিগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তখন নির্ব্বিকার হরিদাস সদয় হইয়া অঙ্গনাকে বলিলেন—"যাবৎ আমার নামের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল আপনি দয়া করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করুন; নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইলে আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।" এই কথা বলিয়া হরিনামাবিষ্ট হরিদাস সারারাত্রি উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া সুন্দরী নারী অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই ভাবে দুই রজনী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৃতীয় রজনী-শেষে দিব্যাঙ্গনা ঠাকুর হরিদাসকে কহিলেন—"আপনি আশ্বাস দিয়া তিন রজনী আমাকে বঞ্চিতা করিলেন। দিবস-রজনীতেও আপনার কৃষ্ণ-নাম সমাপন হয় না।" উত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"আমি নামসংখ্যার নিয়ম করিয়াছি—তাহা কিভাবে ত্যাগ করিব?"

"তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥" চৈঃ চঃ

মায়াদেবী তাঁহাকে আরও বলিলেন—"আপনি মহাভাগবত, আপনার দর্শনে, আপনার মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনাম শ্রবণে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া প্রেমভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিন।" এই চৈতন্যাবতারে নামামৃত ও প্রেমামৃতের বন্যায় ধন্য কলির জীবকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।, এই সহজ-লভ্য অপ্রাথিব গোলকরসের বন্যায় যে অবগাহন করিতেছে না, তাহার কোটীকল্পেও নিস্তার নাই। মায়ার প্রেমলুব্ধতার কথা আর কি বলিব? স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন নাম-প্রেম-রসে লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতারী হইয়া তাহা আস্বাদন করিলেন। সুতরাং যাহাকে ভোজন করাইলে কোটী ব্রাহ্মণের ভোজন হয়, সেই পরম ভাগবত হরিদাসের নিকট মায়াদেবী প্রেম যাচ্ঞা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

অন্যের কা কথা আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে নাম-প্রেম আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কিবিস্ময়।
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম না জন্ময়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া নিষ্কিঞ্চন বা ভেকধারী বৈষ্ণবের ভক্তের পক্ষে বিষয়ী দর্শন বা নারী দর্শন বিষ সেবন অপেক্ষাও নিন্দিত, তাহাই আদর্শ রাখিলেন। গৃহী বৈষ্ণবের শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ বিধান রহিয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী, ত্যাগী ও ভেকধারী বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ত দূরের কথা, দর্শন ও আলাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর জন্যই শিখি মাহিতীর ভগ্নী বৃদ্ধা পরমা বৈষ্ণবী মাধুরী দেবীর নিকট হইতে সালান্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, এই অপরাধ। অপরাধের ক্ষমার নিমিত্ত গৌর-পার্ষদগণ অনুনয়-বিনয় করিলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—

প্রভু কলে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হবে মহামুনির মন॥ চৈঃ চঃ

ভক্তদ্বেষী চাপাল, গোপাল শ্রীবাস আঙ্গিনা অপবিত্র করাতে বৈষ্ণব অপরাধে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইয়া শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

অন্যের কথা আর কি বলিব ? স্বয়মবতার শ্রীগৌর হরির জননীর অদ্বৈত প্রভুর নিকট সামান্য অপরাধে, যদিও বস্তু তত্ত্ব বিচারে উহা অপরাধ নহে, তবুও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীগৌর হরি ইহাকে বৈষ্ণব অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছিদলন। বাস্তব ঘটনাটি এই যে শ্রীমন মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীপাদ বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট প্রেম-ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা করতঃ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তারপর যখন প্রাণের নিমাইও অদ্বৈত প্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তখন শচীমাতা দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—

"কে বোলে 'অদ্বৈত' দ্বৈত এ বড় গোসাঞি।"

"চন্দ্রসম একপুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিবেন করিবারে স্থির॥
অনাথিনী মোরেত কাহারো নাহি দয়া।
জগতের অদ্বৈত মোরে সে দ্বৈত মায়া॥" চৈঃ চঃ

অদ্বৈত প্রভুকে দ্বৈত বলাতে শচীমাতা পুত্রের যড় ভূজ মূর্ত্তি দর্শন হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ বলিলেন—শচীমাতা জগতের মাতা, যদি বৈষ্ণবাপরাধ থাকে, তাহা খণ্ডন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বাক্য শ্রবণে শ্রীগৌরহরি বলিলেন—

"নাঢ়ার স্থানে আছে তান অপরাধ।
নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥
হইবেক প্রেমভক্তি আমাব আজ্ঞায়॥" চৈঃ চঃ

তখন গৌর ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলেন —অদ্বৈত প্রভু শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিয়া কহিলেন—"এই শচীমাতা হইলেন জগতের মাতা, যাঁহার গর্ভে আমার প্রভুর অবতার, যিনি

বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিনী তাঁহাকে আমার পদধূলি ?” ....বলিতে বলিতে অদ্বৈত প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। সময় বুঝিয়া সত্বর করিয়া শচীমাতা নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্তগণের ইঙ্গিতে বাহিরে আগমন করতঃ অদ্বৈত প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার পর শচীমাতা ঠাকুরাণী শ্রীগৌর হরির ষড় ভুজ মূর্তি দেখিতে পাইতেন।

রসরাজ-মহাভাব মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর আমার স্বয়ং অবতারি হইয়াও আজীবন যে কঠোর যুক্ত বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন, নিখিল অবতার সমূহের মধ্যেও তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণ বিরহে ক্ষীণ কলেবরে মৃত্তিকায় শয়ন করায় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে আঘাত লাগে মনে করিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্রে একটি তুলার তপ্তপোষ তৈয়ারী করিয়া প্রদান করিলে, তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলি বালিশ ! মস্তক মুণ্ডন॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রেমলীলার সাদৃশ্য আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও জগদানন্দের মধ্যে দেখিতে পাই। শ্রীজগদানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য সুগন্ধি তৈল আনিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—

“প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার।
তাতে সুগন্ধ তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥” চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈরাগ্য সাধনের কোন প্রয়োজন ছিল না, লোক শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার এই বৈরাগ্য সাধন। “আপনি আচরি প্রভু জীবেরে শিখায়”। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর ভয়ে স্বীয় ভক্ষ্যান্নের পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়াছিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির আরাধনা তিথি।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর আরাধনা তিথি উপস্থিত। তাঁহায় শিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামী, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণ বিরহে রোদন করিলে তাঁহার বক্ষ নয়ন জলে ভাসিয়া যায়, কখনও অট্ট হাসি, কখনও পরমানন্দে দিগাম্বর হন। তিনি লোক সকলকে কৃষ্ণভক্তি বিমুখ ও তমগুণান্বিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ, ঠিক এমনই সময়েই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী শ্রীঅদ্বৈত গৃহে উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার সমস্ত বৈষ্ণব লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুকে কোলে করিয়া প্রেমাশ্রু জলে বক্ষ প্লাবিত করিলেন। পুরী গোসাঞির প্রেম বর্ণনাতীত। নবীন জলদ অথবা ময়ূর কণ্ঠ দর্শন করিলেই মূর্চ্ছিত হন, এক দণ্ডে সহস্রবার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ সুন্দর ও সকল বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীপুরী গোসাঞির তিথি উৎযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। শচীমাতা সকল বৈষ্ণবগণের গৃহিনীগণ সহ রন্ধনের ভার লইলেন। কেহ চন্দন ঘষিবার ভার, কেহ পুষ্প মালার ভার, কেহ জল আনিবার ভার, কেহ স্নান উপস্কারের দায়িত্ব, কেহবা সমাগত বৈষ্ণবগণের চরণ প্রক্ষালনের ভার লইলেন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীনাম সংকীর্তনে শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও করতাল বাজিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে সজ্জা আসিতে লাগিল। অদ্বৈত ভবন যেন বৈকুণ্ঠ ধাম হইল। পরমানন্দে শ্রীগৌর সুন্দর সম্ভারের সংজ্ঞা দেখিতে লাগিলেন। তিনি দুই চারিঘর তুণ্ডুল, পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ, পাঁচ ঘর জুড়ি ঘট ও রন্ধনের পাত্র, দুই চারিঘর মুগ ও বিউলির ডাল, পাঁচ

সাত ঘর নববস্ত্র, দশবার ঘর কলার পাতা, সহস্র সহস্র কদলীর কান্দি, বহু নারিকেল, গুয়া পান, পটোল, শাক, থোর, মোচা সহস্র সহস্র ঘরা দধিদুগ্ধ, ক্ষীর, তৈল, ঘৃত, প্রভৃতি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"এই পর্বত পরিমাণ সজ্জা মহাদেব ব্যতীত আর কারও কার্য্য নহে"। প্রকারান্তরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মহাদেবের অবতার বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অতঃপর, শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনস্থলীতে আগমন করিলে সর্ব বৈষ্ণবগণ আনন্দে বোলহরি, হরিবোল, জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাপিয়ে উঠল। সকলেই চন্দনে চর্চ্চিত, সুন্দর বক্ষে পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রেমসুখময় নিত্যানন্দ প্রভু বাল্য স্বভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পাদ বলিতেছেন :—

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥" চৈঃ চঃ

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, নিত্যানন্দ প্রভুও অন্যান্য গৌর পার্ষদগণ সংকীর্ত্তন রাসমণ্ডলীর অনুরূপ মণ্ডলী করিলে তাহার মধ্যে শ্রীশচীনন্দন আজানুলম্বিত বাহু যুগল উত্তোলন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাই কলির রাসনৃত্য। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ। সখলেই সংকীর্ত্তনানন্দে যোগ দিয়েছেন। এই ভাবে সমস্ত দিবস সকলেই সংকীর্ত্তনান্দে নাচিয়া গাহিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সর্বভক্তগণ দিব্য প্রসাদান্ন, বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন, মোচা ঘণ্ট, সঘৃত পরমান্ন, দধি দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বহুবিধ মহাপ্রসাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জয় জয় দিয়া ভোজন করিলেন। কত লোক প্রসাদন্ন ভোজন করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইভাবে দেশ বিদেশেদের লক্ষ লক্ষ লোক প্রসাদন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজানান্তে

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সুগন্ধি চন্দন, দিব্য মালা মহাপ্রভুর নিকট রাখিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিয়া অন্যান্য ভক্তগণকে মালা চন্দন পরাইয়া দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে এমনই আনন্দ ও মহা মহোৎসব হইল যেন অদ্বৈত ভবন বৈকুণ্ঠ পুরী হইয়া উঠিল। এই মহামহোৎসবের কথা শ্রবণ বা স্মরণ করিলেও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

এক বিংশতি পরিচ্ছেদ

হরিদাস নির্য্যান বর্ণন।

নমামি হরিদাসং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যৎমূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥

সেই হরিদাসকে নমস্কার করিও তৎপ্রভু চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি যাঁহার মৃতদেহ ভূপতিত হইলে তিনি নিজ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দিবসে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন, রজনীতে শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ সনে প্রেমরসাস্বাদন করেন। কৃষ্ণের বিরহব্যথা ক্রমোবর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণ চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি প্রভৃতি মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন গোবিন্দ যখন শ্রীহরিদাসকে মহাপ্রাসাদ দিতে গেলেন, তখন দেখিলেন শ্রীহরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়া মৃদু স্বরে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"আমার এখন নামসংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, আজ আমি লংঘন করিব"। মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া তিনি এক রঞ্চ মহাপ্রসাদ লইয়া নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিলেন। আর একদিন শ্রীচৈতন্যদেব আগমন করিয়া 'সুস্থ হও হরিদাস!' বলিলে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়? ঠাকুর হরিদাস কহিলেন—"সংখ্যাকীর্ত্তন না পূরয়"। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমার সিদ্ধ দেহ, বৃদ্ধ বয়স অল্প করিয়া নাম সংখ্যা জপ কর, নামের মহিমা প্রচার করিয়া মানবগণকে নিস্তার করিয়াছ"। ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"বহুদিন হইতে আমার মনে হয় তুমি লীলাসংবরণ করিবে, তোমার বিয়োগ ব্যথা আমি সহ্য করিতে পারিব না। অতএব তৎপূর্বেই আমার ইচ্ছা দয়া করিয়া পুর্ণ করো।"

'হৃদয়ে ধরিব তোমার চরণ কমল।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মতে মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে ॥" চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—"কৃষ্ণকৃপায় তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হইবে।"—এই কথা বলিয়া ঠাকুর হরিদাসকে আলিঙ্গন করতঃ সমুদ্রে স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন! পরদিন প্রাতঃকালে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া ভক্তসঙ্গে ঠাকুর হরিদাস সমীপে আগমন করিলে হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেব ও সকল বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আঙ্গিনায় মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত বক্রেশ্বর, স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসার্বভৌম প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবগণসহ ঠাকুর হরিদাসকে বেড়িয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখে ঠাকুর হরিদাসের গুণ ও মহিমা সকল বৈষ্ণবগণের সমীপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সর্বভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে নিজের সম্মুকে বসাইয়া নেত্রভৃঙ্গ দ্বয় দ্বারা তাঁহার চাঁদ বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া সমস্ত গৌর পার্ষদগণের পদরেণু মস্তকে ভূষণ করিলেন।

শ্রীহরিদাস পুনঃপুনঃ শ্রীচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সহিত প্রাণ উপক্রমণ করিলেন—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চে।

"মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যান সবার হইল স্মরণ ॥
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের দেহ কোলে লইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর সঙ্গে সকল ভক্তগণ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীস্বরূপ গোসাঞিমহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে সর্ব্ব ভক্তগণ হরিদাসকে বিমাণে চড়াইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতটে লইয়া গেলেন। অগ্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নৃত্য করিয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে পণ্ডিত বক্রেশ্বর সহ সর্ব্ব ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন। হবিদাসেব দেহ সমুদ্রজলে স্নান করাইবার পর মহাপ্রভু বলিলেন—"আজ সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" হরিদাসের পাদোদক ভক্তগণ শিরে ধারণ করিয়া পান করিলেন। সর্ব্ব গৌর পার্ষদগণ হরিদাসের অঙ্গে প্রসাদ চন্দন লেপন করিয়া ডোর-কড়ার প্রসাদ-বস্ত্রে অঙ্গে আচ্ছাদন করিলেন। সমুদ্রতটে বালুকার গর্ত্ত করিয়া তথায় হরিদাসকে শয়ন করাইলেন। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল বলিয়া নিজ শ্রীহস্তে প্রথমে হরিদাসের অঙ্গে বালুকা প্রদান করিলেন, পরে ভক্তগণ চৌদিকে পিণ্ডা বাঁধিয়া আবরণ রচনা করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতঃ হরিদাসের সমাধিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। সকল নগরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত সিংহদ্বারে পশারির সম্মুখে আঁচল পাতিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি পশারীর নিকট হইতে প্রত্যেক দ্রব্যের এক পোয়া করিয়া লইলে চারিজনের

বোঝা হইয়া গেল। শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক ও বাণী মিশ্র অনেক প্রসাদ আনিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সারি সারি বসাইয়া শ্রীহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে বলিয়া শ্রীস্বরূপ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর এই চারিজন মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সেদিন কাশী মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনিও বহু মহাপ্রসাদ তথায় লইয়া আসিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরী ও ভারতী গোসাঞির সঙ্গে ভোজনে বসিলে সর্ব্ব ভক্তগণ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সকল ভক্তগণকে মালা ও চন্দন পরাইলেন। অতঃপর, মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"যাঁহারা হরিদাসের বিজয় উৎসব দর্শন করিলেন, যাঁহারা নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন, যাঁহারা মহোৎসবে ভোজন করিলেন তাঁহাদের অচিরেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে।"

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী।
জয় জয় হরিদাস বলি করি ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥" চৈঃ চৈঃ

তখন সকল ভক্তগণকে বিদায় দিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু হর্ষবিষাদে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
বৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ-পাপদ্দের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি ॥

(১) শ্রীগৌরসুন্দর কখনও কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন, তাহার অঙ্গে বিরহ তাপে বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব প্রকাশ বিশেষে সন্নিহিত হৃদয় নিকুঞ্জে শ্রীমতীর ভাবে নিজের অন্তর ভাবিত করিয়া লইতেছেন। তখন তিনি শ্রবণ করিলেন —"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়"—'কৃষ্ণ' না বলিয়া 'কৃষ্ণবর্ণ একশিশু' বলায় বিশেষ রহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবের চিত্ত নিকুঞ্জ বাসিনী কৃষ্ণাঙ্গিনী কিশোরী শ্রীরাধা যে মুরলী বাজাইতেছেন তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ কিশোর শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন। প্রাণকোটি প্রিয়তমকে নিজ সন্নিহিতে প্রাপ্ত হইয়া ও বিরহোন্মোদনা—ইহা প্রেমবৈচিত্ত্য এখানে বাঞ্ছাত্রয় আংশিকভাবে পূর্ত্তি হইল।

(২) শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর গয়াধাম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে কালাগ্নির নাটশালা গ্রামসমীপে আগমন করিলে এক সুন্দর তমাল শ্যামল বালক স্মিতহাস্যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আখির পলকে কোথায় মিলাইয়া গেলেন—আর শ্রীগৌর সুন্দর সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতেই প্রেমবৈচিত্ত্য, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল রাধার ঋণ পরিশোধ ও আরম্ভ হইল এবং বাঞ্ছা ত্রয়ের আংশিক পূর্ণ হইল।

(৩) ইহার পর যখন নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মন্দিরে মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, উদর স্পন্দন রহিত। তাহার দশা দর্শন করিয়া পণ্ডিত

সার্ব্বোভৌম চিন্তান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ইহা অধিরূঢ় মহাভাবের সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার।" ইহা তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত ছিল। এখানেও গোপীঋণ পরিশোধ হইতে লাগিল।

(৪) গুণ্ডিচা মার্জ্জনে শ্রীনৃসিংহ মন্দিরের ভিতর ও বাহিরে শোধন করিবার পর প্রভু মত্ত সিংহের ন্যায় ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ পুলক হুঙ্কারে প্রভুর নয়নদ্বয় নাসিকা হইতে পিচকারীর জলধারার ন্যায় শ্রীঅঙ্গ প্লাবিত করিয়া, শ্রাবণের বারিধারার মত ভক্তগণের দেহ প্লাবিত করিলেন।

(৫) রথযাত্রায় শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীস্বরূপ গোসাঞিকে—"সেইতপরাণনাথ পাইলু" পদ গাহিতে বলিলেন। গীত শ্রবণে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইলে—তিনি পুনঃ পুনঃ "যঃ কৌমার হরঃ" শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এইসব পদের অর্থ মহাপ্রভু রাধাভাবে স্বরূপের অঙ্গে নিজাঙ্গপ্রদান করতঃ স্বরূপের গ্রীবা ধারন করিয়া আস্বাদন করিলেন, মনে হইল শ্রীরাধা ললিতার নিকট কৃষ্ণ মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে মাল্য ও অলঙ্কার আভরণাদিতে ভূষিত দর্শন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে প্রেমোন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ুর আবির্ভাব সঞ্চারী স্থায়ীভাবে পুষ্পসমূহ দেহে প্রস্ফুটিত হইয়া কণ্টকীফলের ন্যায় হইলেন এবং শ্রীমুখ হইতে ফেন ও লালাস্রাব হইতে লাগিল। ইহা অধিরূঢ় মহাভাবে দিব্যোন্মাদ দশা। এইভাবে ধীরে ধীরে রাধা ঋণ পরিশোধ হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব, রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন করিয়া তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যান্মাদ দশায় বলিয়াছেন—

"নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাত॥
রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ চৈ চঃ

(৬) শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ দর্শনের উৎকণ্ঠায় চিন্তা, জাগরণ, রোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশ দশায় দীর্ঘাকৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাও রাধা ঋণ পরিশোধের একটি অঙ্গ।

(৭) গোপীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তমা. যাহার সুখের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা নাই, যাহার মাদনাখ্য মহাভাবে দিব্য বা অলৌকিক মধু বিশেষের ন্যায় মাদকতা সম্পন্ন সেই রাধার ভাবে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নীলাচলে নীলাম্বুর মধ্যে দীর্ঘাকৃতি ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ও বৃন্দাবন লীলার রসাস্বাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছা যথা (১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমার তাৎপর্য্য, (২) শ্রীরাধা কর্তৃক মাদনাখ্য মহাভাবের দ্বারা আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য, (৩) শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত, অনন্ত মাধুরিমা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার কোটি-গুণ সুখানুভূতি কৃদৃশ—ইত্যাদি পরিপূর্ণ হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২০,—'ন পারয়ে হহং' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া এবং শ্রীগীতার 'যে যথা মাং প্রপদন্তে' শ্লোকে—গোপীর প্রীতির—অনুরূপ প্রীতি করিতে অসমর্থ হইয়া ধন্য কলিযুগে শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন। গোপীঋণ তথা রাধাঋণ এতই ভারী ও গরীয়ান যে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব কলির জীবের ঘরে ঘরে জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া শ্রীরাধার মহিমা ও প্রেম রসসীমা প্রকাশ করিলেন। লীলাম্বুতীরে দিব্যোন্মাদ দশা দশম দশা, দীর্ঘাকৃতি, কুর্মাকৃতি প্রভৃতি মহাভাব দ্বারা শ্রীরাধার ঋণ পরিশোধ হইল। অধিরূঢ় মহাভাবের তরঙ্গসমূহের ঘাত প্রতি-ঘাতে অচিন্ত্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের দেহ ক্ষীণ ও শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তিন বাঞ্ছা পূর্ত্তি ও রাধাঋণ পরিশোধ হইল। এখন বেশীদিন আর এই ধরাধামে প্রকট আবির্ভাব রূপে বিদ্যমান থাকিবেন না।

সম্প্রতি "শ্রীচৈতন্য চকড়া" নামে ওড়িয়া ভাষায় একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; উহা যুগান্তর পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গড়ুর স্তম্ভের নিকট

দণ্ডায়মান ছিলেন তখন ভক্তগণ ও অগণিত লোকসমূহ একটি চক্ষু-ধাধান দিব্য জ্যোতি দর্শন করিলেন, পরমুহূর্তেই আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দেখা গেল না, শুধু দেখা গেল তাহার পরিধেয় কৌপীন বস্ত্র, উহা পরিশেষে আই টোটায় অবস্থিত পণ্ডিত গদাধরের আশ্রমে সমাধিস্থ হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন পণ্ডিত গদাধর সেবিত শ্রীগোপীনাথ জিউকে দর্শন করিতে যাই তখন একটি ফলকে লেখা ছিল— "কি বলিব দুঃখের কথা বক্ষ ফেটে যায়।
মহাপ্রভু মিলিলেন গোপীনাথের গায় ॥"

আবির্ভাব—১৪০৭ শকাব্দে ২৩শে ফাল্গুন (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। তিরোভাব—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন (৩১শে আষাঢ়) তাঁহার জীবনকাল মাত্র ৪৭ বৎসর ৪ মাস।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন দাস-কবিরাজ গোস্বামীর চরণ শিরে ধরি।
নিতাই-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হৈয়া মধু পান করি ॥

শিশু নিমাই, সেই গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইয়া মহাপ্রভুরূপে আজ বিশ্বময় আরাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার প্রেমধর্ম সমুদ্রের জোয়ারের মত প্রাচ্য, পাশ্চাত্যে অগণিত ভক্ত হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির বাণ ডাকিয়া তাহাকে প্রেমের ঠাকুর ও প্রাণের ঠাকুরে পরিণত করিয়াছে। ইহা হিংসা, সংঘর্ষ, ঘনায়মান ধ্বংসের ধূমায়িত করাল গ্রাসে পতিত বিভ্রান্ত বিশ্বের এক শুভ ইঙ্গিত। কলিতে প্রেমধর্ম ব্যতীত আর কোন গতি নাই। বিনয়, সহিষ্ণুতা, দীনহীনে দয়া আমানীকে সম্মান ও মনকে ভগবতমুখী করাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের আদর্শ। আজ বিশ্বে মানব সমাজকে রক্ষার জন্য এই প্রেমধর্মের বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার হাতে বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালীর মন নূতন রূপ পাইয়াছে তিনিই চৈতন্যদেব,

যাহার দ্বারা বাঙালীর সমাজজীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছে তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব। ভাবরসে, প্রেমরসে, অধ্যাত্মরসে যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মানুষের মনকে আপ্লুত করিয়া দেবভাবাপন্ন হইতেও উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছেন তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবান দাস লিখিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহার ভক্তবৃন্দকে বলিতেছেন ঃ

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম।"

আজ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই বাক্যের সত্যতা ও শুভ সূচনা দিক-দিগন্তে পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রীমন মহাপ্রভুর নাম ও তৎ প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন, তদীয় প্রভাব আজ সুদূর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে শব্দতরঙ্গবৎ প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাজিল, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, আমেরিকা, কানাডা, ক্যালিফোনিয়া, ভেনেজুইলা, জার্মানী রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আজ শ্রীভগবানভাবে পুজিত। সুবিখ্যাত ইংরাজ অধ্যাপক R. H. Nixon মহোদয় বৈষ্ণবধর্মের তথা প্রেম-ধর্ম্মের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বৈরাগী" নাম গ্রহণ করিয়া হিমালয়েব সংলগ্ন স্থানে "উত্তর বৃন্দাবন" নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের সাধনা ও অনুশীলন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে সুবিখ্যাত উলিয়ম ষ্টেড মহোদয় বলিয়াছেন—"এমন উদার ও স্নেহসিক্ত ধর্মজগতে এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। আমার ইচ্ছা ইউরোপের প্রতি গীর্জ্জায় গীর্জায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ও প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হউক।"

প্রখ্যাত ইতালীয় অধ্যাপক G. Jucci মহোদয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইতালীয় ভাষায় উহা 'শ্রীচৈতন্য' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎ সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা Julian Jucci শ্রীরাধা তত্ত্বানুশীলন ও প্রচার করিয়াছেন। ওদিকে রুশীয় অধ্যাপক "Wintenitz" মহোদয়

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে বহু স্থানে প্রচার করিয়া যাইতেছেন। সুইজারল্যাণ্ডের এক অধ্যাত্ম চর্চা প্রতিষ্ঠানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচারিত হয় এবং ঐ গ্রন্থ প্রত্যহ তথায় পাঠ হইলে সকলের দৃষ্টি মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, জার্মানীতে বহু পূর্ব্বেই Ostursbarg কর্তৃক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি জার্মানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং ১৯২৫ সালে তাহার পিতা Mltovon Glascnapp শ্রীচৈতন্যদেব বিরচিত পাঁচটি শ্লোক জার্মান কবিতায় অনুবাদ করিয়া প্রচাব করিয়াছেন।

১৩২২ সালের 'গম্ভীরা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন রায় মহাশয় "শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও মার্টিন লুথার সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে নব ধর্মমত দেশে প্রচার করিলে দেশবাশী দ্বারা তিনি দেশ হইতে বিতাবিত হন, নিরুপায় হইয়া তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ও শ্রীমন মহাপ্রভুব সহিত মার্টিন লুথারেব সাক্ষাৎ হয় নীলাচলে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তি, উদারতা ও ত্যাগের মহান আদর্শে ও স্নেহাশীষে পূত হইয়া লুথার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পোপেব উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন—"পোপ যদি ধনবলে ও জনবলে বলীয়ান হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জোর পূর্ব্বক অনাদর করিতে চান, তবে, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" তাহাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে হইবে এবং তাহার পার্শ্বচরদিগকে হিন্দুস্থানের ত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার পার্শ্বচরগণের ন্যায় প্রেমধর্ম্ম শিক্ষার আদর্শ স্থানীয় হইতে হইবে।" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের আদর্শেই মার্টিন লুথারের চেষ্টায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকৃষ্ট রূপে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া জগতে বরণীয় হইয়া প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। (মাটিন লুথার জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্যদেবের দুই বৎসর পূর্ব্বে)। তারপর ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কোন ধর্ম নাই। সকল ধর্ম ও সর্বসম্প্রদায়ের লোকই এখানে সমভাবে সমাদর প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দেশে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম গ্রহণের পক্ষে বিশেষ-

অনুকূল। ব্রেজিলের প্রসিদ্ধ একটি ধর্ম সমিতি আছে, ব্রেজিলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এই সমিতির সভ্য। শ্রীভগবানের অন্তঃ প্রেরণায় দার্জ্জিলিংয়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি এবং পাণিহাটী গ্রন্থ মন্দিরের অন্যতম বান্ধব শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় ও ঐ প্রসিদ্ধ ধর্মসমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি ঐ সমিতিব পত্রিকাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুব প্রেমধর্ম সম্বন্ধে প্রচার বহুল করিয়া ছিলেন, এবং এইভাবে ইন্দুবাবু ও পাণিহাটী গ্রন্থ মন্দিরের নাম ব্রেজিলে বহুস্থানে প্রচারিত হইল। ব্রেজিলের ভূতপূর্ব ভারতীয় কনসল জেনারেল মহামান্য Vicente Aochied মহোদয় ১৯৩০ সালে পাণিহাটী বৈষ্ণব প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম সম্বন্ধে যে সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। প্রকাশ্য সভায় শ্রীগৌবাঙ্গের মহিমা, প্রেমধর্ম ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি ভাবাবেগে আত্মহারা ও নয়নজলে প্লাবিত হইয়াছিলেন। তাহার এই বক্তৃতাটি ব্রেজিলের "O Pensrmento" পত্রিকায় প্রচারিত হওয়ায় ভারত ও ভারতের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌবাঙ্গের দিকে ব্রেজিলবাসীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। ব্রাজিলের একজন পরম গৌরভক্ত স্বনামধন্যা মহিলা Visleta Odeth প্রতি-দিনই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা আলোচনা ও ধ্যান করেন। তাহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ দেশে 'Cirento'-র শাখারূপে তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য নামে এক বৈষ্ণবসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীইন্দুবাবুর নির্দ্দেশে পাণিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির হইতে ব্রেজিলে ঐ তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য আশ্রমে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সুবৃহৎ চিত্র, সিদ্ধ চরণদাস বাবাজি মহাশয়ের ও শ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি পাণিহাটী বটবৃক্ষের চিত্র, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছে।

সমগ্র জগতে আজিকার এই যে শ্রীচৈতন্য প্রীতি ইহা আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা শ্রীভগবানের শাশ্বতী বিশ্বলীলার পরিস্ফুরন ও অভিব্যক্তি মাত্র।

অথ শ্রীল সার্ব্বভৌম-বিরচিতং শ্রী:গৌরাঙ্গ অষ্টকমঃ।
উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং বিলসিত নিরবধিভাব বিদেহম ॥
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়া লেশং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।
গদগদ অন্তরো ভাবো বিকাবং দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্॥
ভবভয় ভঞ্জন কারণ করুণং ত্বং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম।
অরুণাম্বরোধরো চারু কপোলং ইন্দু-বিনিন্দিত নখচয়ঃ রুচিরং॥
জল্পিত-নিজগুণো নাম বিনোদং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম।
বিগলিত নয়ন-কমল-জলধবং ভূষণ নবরস ভাব বিকারম্॥
গতি অতি মন্থরো নিত্যবিলাসং ত্বং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম্।
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি রুচিরং মঞ্জীর রঞ্জিত-পদযুগো মধুরং॥
চন্দ্র বিনিন্দিত-শীতল-বদনং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।
ধৃত কম্প-পুলকঃ সদঙ্গ-বেশং দিব্য কলেবরঃ মণ্ডিত-মুণ্ডম্।
দুর্জ্জন কলুষং-খণ্ডন-দণ্ডং ত্বং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম্॥
ভূষণঃ ভূরজো অলকা-বলিতং কম্পিতৌবিম্বাধরঃ-বর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিতো উজ্জ্বলো তিলকং ত্বং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম্॥
নিন্দিতঃ অরুণ-কমলদল-লোচনং আজানুলম্বিতো শ্রীভুজ যুগলম।
কলেবরঃ কৈশোরঃ-নর্ত্তক-বেশাং ত্বং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ম॥

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	শ্রীবিশাখান্বিতানংশ্চ	শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ
৬	১	কর্ত্তারশীশং	কর্ত্তারিমীশং
৯	২	প্রকামধুনা	প্রকটমধুনা
৯	৪	প্রেমেই	প্রেমই
১০	১৮	সির্য্যাস	নির্য্যাস
১১	১৮	পুড়াইল	জুড়াইল
১২	৪	এতগুলি	এতবলি
১২	১০	যোবে	থোবে
১২	১৩	দেযাইলা	দেখাইলা
১৩	১১	স্বামাবক্ত্রে	স্বামবক্ত্রে
১৪	১৭	স্বরনে	স্মরণে
১৫	১৭	বাঞাটি, বাঞাব, বাঞাই	বাঙ্গাটি, বাঙ্গার, বাঙ্গাই
১৬	৬, ১৫, ১৭	রেখে, শ্যামস, প্রময়	রেমে. শ্যামরস, প্রণয়
১৭	১৮, ২৩	পরিদৃষ্টি, কণ্টকি	পরিদৃষ্ট, কণ্টকিত
১৮	২, ৪	দিব্যোস্মাদ. কর্মবিত	দিব্যোন্মাদ, কর্বু‌রিত
২২	১৮	কৃষ	কৃষ্ণ
২৩	১৮, ১৯	সুরাভিত, শ্লাখাও	সুবাসিত, শ্লাঘাও
২৪	৫	আলিন্দিত	আলিন্দিত
২৬	৮	প্রকৃত	প্রাকৃত
২৭	১৪	অতিবর্বর	অতিবর্ব্বর
২৮	১, ৬	বুখের, বীরললিত	যূথের, ধীরললিত
২৯	১৭	সুদেবী পর বঙ্গদেবী	সুদেবীর পর’ রঙ্গদেবী
৩২	১, ১২	নিরূপধি, কবাহু	. নিরূপাধি, কবহু

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	২০	কৃষ্কসুখে	কৃষ্ণসুখে
৩৭	৯, ১১, ২৮	বলো, মম্বন্ধে, এতএব	বলে, সম্বন্ধে, অতএব
৩৮	১১	ব'কিম	বঙ্কিম
৪০	৫	অধিদর্গদ্ধ	অবিদগ্ধ
৪৬	২২, ২৬	ব্রহ্মাশুকে, মধুক্ষারা	ব্রহ্মাণ্ডকে, মধুক্ষরা
৪৭	২৪	নিদ্বাম	নিষ্কাম
৪৮	১১	উচিত	উদিত
৪৯	৫	ভোগাস্পাদা	ভোগাস্পদা
৫২	২৬	অমি	আমি
৫৬	৬, ৯	শ্রীকৃষ্ণস্বপই, মাদনাঘ্য	শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই, মাদনাখ্য
৫৬	২৬	বিলাসমহস্ত	বিলাসমহত্ত্ব
৫৭	২১, ২৭	পোপাল, পেশনে	গোপাল, পেষণে
৬০	৮	আত্মখুকে	আত্মসুখে
৬২	১	এতএব	অতএব
৬৩	১৭	নিত্যসিদ্দ	নিত্যসিদ্ধ
৬৪	১২	পার না	পারেন না
৬৫	২৬	মাদলাখ্য	মাদনাখ্য
৬৬	৯, ২৭, ২৮	ভুলিতে, বাঞ্চা	তুলিতে, বাঞ্ছা
৬৭	১৪	ভবাশ্চ	ভবতশ্চ
৬৯	২, ১৬	আর্বপথ, উদঘূর্ণা	আর্য্যপথ, উদ্‌ঘূর্ণা
৭১	১৭	মুদ্রিত	মুদিত
৭৪	১	কনীয়	কমনীয়
৭৭	১৫, ১৬	ভবাম্বুঠৌ, পঞ্চজস্থিত	ভবাম্বুধৌ, পঙ্কজস্থিত
৭৭	২৭	অর্জিত	অজিত
৭৯	১০	ততুপরি	তদুপরি
৮০	৯	অর্ঘ	অষ্ট

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	৩, ২৬	কে, প্রীতি	যে, প্রীত
৮২	১৭	মদীরতা	মদীয়তা
৮৩	২	তাহারই	তাহারা
৮৫	১৭, ২৫	বড়, অস্তি	ধড়, অস্থি
৮৭	৬, ২৫	তাম্বুলাদি, অলম্বন	তাম্বুলাদি, অবলম্বন
৮৮	১১	পছারবিন্দেই	পদারবিন্দেই
৮৯	২১	পরিভূর্ণ	পরিপূর্ণ
৯০	৪	বধির	ভাবের
৯০	৮	প্রকঠাবহারে, অপকর্ষি,	প্রকটাবভাবে, অপ্রকট
৯০	৯	বিলাসমূণ্ডিকে	বিলাসমূর্ত্তিতে
৯০	১১	জয়ের, মুদ্রা	ভাবের, মুখ্যা
৯০	১৮	উদ্ধার, অমুদিত	উভয়কে, অমুষ্ঠিত
৯০	২৩	সঞ্জুনক্ষি	খঞ্জনাক্ষি
৯১	১৪	স্বযংবেত্ত, প্রাথির	স্বয়ংবেদ্য, প্রাপ্তির
৯১	১৫	সম্ভবনায়, হস্ত্যজ্য	অসম্ভবনায়, দুস্ত্যাজ্য
৯২	২, ২	ষষ্ঠ, অমুভাববী	ষষ্ঠ অমুভাবই
৯২	৭	বিবহাবস্তায়, মধুরিমা	বিরহাবস্থায়, মাধুরিমা
৯৪	১২	শ্রীরাসরূপে	শ্রীবাসরূপে.
৯৬	১৭	অন্তত, বলগোরাঙ্গের	অনন্ত, বালগোরাঙ্গের
৯৬	১৯	চদ্র, আয়ালুলম্বিত চন্দ্র	আজানুলম্বিত
৯৬	২২, ২৩	বাস্বুলী, ঈষৎহাস্যে	বান্ধুলী, ঈষৎহাস্তে
৯৮	১৭	যায়	খায়
১০৪	১১, ২৮	কমল, ভবানীভুক্ত	কমলা, ভবানীভর্ত্তা
১০৬	১১	জনতা	জনতাকে
১০৭	৮, ৯	শ্রীভুর, ঝলিতে	শ্রীপ্রভুর, ঝালিতে
১০৯	৪, ১০	জানিতেছেন, প্রেমাকৃত	জপিতেছেন, প্রেমাদৃত
১১০	৫, ১০, ২৩	প্রেমবৈচিত্রের, সুবনিত, শার্দ্ধ	প্রেমবৈচিত্ত্যের সুবর্ণিত, শার্ঙ্গ

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৫	১	দর্শনের	দর্পণের
১১৬	১২, ২১	মণ্ডল, লাগহার	মণ্ডন লাগ্ হুরে
১২৩	১৮	ভূজদ্বয়ের	ভূজদ্বয়ে
১২৫	৯	শ্রীঅখণ্ডের	শ্রীঅনন্তের
১২৭	৮	পলে	গেলে
১২৮	২৮	আদর্শ	অষ্টাদশ
১২৯	১৪	মহাপ্রেম	মহাপ্রেমরস
১৩১	৪, ১৮	সুফলিত, নির্দ্ধারিন	সুবলিত, নির্দ্ধারিল
১৩৪	৭	কহিল	করিলে
১৩৬	৪, ১৪, ২৭	সপ্ততলে, মহাপ্রভুকে বিচারে	সপ্ততাল, মহাপ্রভু, বিকারে
১৩৮	৬, ১৩, ২৮	ঐক্যে, বলিলে, মহাপ্রভুকে	ঐছে, বলিলেন, মহাপ্রভুর
১৪০	৫, ১১	উড়িস্থা, হৈয়	উড়িষ্যা, হৈয়া
১৪৩	১৮	মঙ্গল	মাদল
১৪৪	১	ধারাধাবি	ঠারাঠারি
১৪৭	২৬	ত্রিসত্যরাজ	শ্রীসত্যরাজ
১৪৮	২২, ২৩	গর্ব্বস্ত্রেব, উদ্দবকে, সাংখাং	গর্ব্বয়েব, উদ্ধবকে, সাংখ্যং
১৫০	৪	গক্তগণকে,	ভক্তগণকে
১৫১	১৭	কণ্ঠাধারী	কন্থাধারী
১৬০	১৫	মহীরূঢ়	মহীরুহ
১৬২	১৫	ঐচ্ছে	ঐছে
১৬৬	২৬	উত্তাল	উত্তান
১৬৬	৯	গণেনর	গণের
১৬৭	৩, ৪, ২০	বে:সে, আমি, কৈলা,	বৈসে, আসি, ফেলা,
১৬৭	২৩	কৃষ্ণা	তৃষ্ণা

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৯	১৬	গোষ্টে	গোষ্ঠে
১৭০	১৭	গোগীগণের	গোপীগণের
১৭১	৭	অস্তি ছটি	অস্থি, ছুটি
১৭৩	৩, ১২	স্বর্ণমঙ্গল, বৃন্দ্রাদেবী	স্বর্ণকমল, বৃন্দাদেবী
১৭৩	১৫	কুজ্জদাসীগণ	কুঞ্জদাসীগণ
১৭৪	৫	অবতাব	অবতারি
১৭৬	৬, ৯	সুরুসিক, প্রবিষ্ঠ্যা	সুরসিক, প্রবিষ্টা
১৭৬	১৬, ২১	লীলাম্বর অস্থি, সাদৃশ্য	নীলাম্বুতটস্থ, মাদৃশ
১৭৬	২১	অতীদিন, বৈষ্ণবা ধর্ম্মের	অতিদীন, বৈষ্ণবধর্ম্মের
১৮০	১৭	দোগের	দোষের
১৮১	৮, ২৭	ত্রী, উশবেয়ন	শ্রী, উপবেশন
১৮৩	১৮	রামকৃষ্ণের	রাধাকৃষ্ণের
১৮৫	৬, ১৩	ভগবান, স্বুরিত	ভগবান, পূরিত